কুরআনের চিরন্তন মু'জিযা

ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

কুরআনের চিরন্তন মু'জিযা

ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

হিজরী সনের শতক উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত

আমাদের কথা

কুরআন শরীফের অনন্য মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমানের 'কুরআনের চিরন্তন মুজিযা' শীর্ষক মূল্যবান গ্রন্থখানি ইসলামিক ফাউণ্ডেশন থেকে ১৯৮০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হওয়ার অল্পদিন পরেই এ গ্রন্থের সব কপি নিঃশেষিত হওয়ার ফলে এর নতুন সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। একটু বিলম্বে হলেও এক্ষণে এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে শোকরিয়া আদায় করছি। আশা করি প্রথম সংস্করণের মতো এ সংস্করণও সকলের সুদৃষ্টি লাভে ধন্য হবে।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ॥ ২৪·৯৮৪·

আবদুল গফুর
প্রকাশনা পরিচালক

এই লেখকের অন্যান্য বই

- ইমাম বুখারী (রহঃ)
- ইমাম মুসলিম (রহঃ)
- ইমাম নাসাঈ (রহঃ)
- আল্লামা যামাখশারী (রহঃ)
- ইসলামের আদি যুগের একটি পরিবার
- ইসলামী সাহিত্য চর্চায় তসলিমউদ্দীন আহমদ
- মুসলমানদের সাহিত্য সাধনা
- কবি কা'ব ও তাঁর অমর কাব্য বানাত সু'আদ
- ইমাম ইবনু কাসীর (রহঃ)
- মিসরের ছোট গল্প
- কুরআন কণিকা (সম্পাদিত)
- মাজামীনে মুজীব (১ম খণ্ড) উর্দু
- Islamic Attitude Towards Non-Muslims-এর বংগানুবাদ
- তাফসীর ইবনে কাসীর
- বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা (যন্ত্রস্থ)

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসংগে

মহান আল্লাহ্ পাকের অপার অনুগ্রহে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পূর্বেকার সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ার পর আজ 'কুরআনের চিরন্তন মু'জিযা'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আজ এ অনুভূতিই যেন বারবার আমার মনের কোণে জাগিয়ে তুলছে একটা অব্যক্ত খুশীর দোলা ও স্পন্দন। সুধীজন ও সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার তরফ থেকে নিরন্তর চাহিদা সত্ত্বেও কেন যে এত বিলম্ব ঘটলো তার কৈফিয়ত পেশ না করে শুধু এটুকুই প্রত্যাশা করবো যে, আগেকার মতো এটিকেও তাঁরা যেন সাদরে গ্রহণ করেন। তাঁদের নেক নযর ও শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হলেই আমার সকল শ্রম ও সাধনাকে সার্থক মনে করবো।

এই সংস্করণ সম্পর্কে দুটো কথা লিখতে বসে আজ বিগত দিনের কতো কথাই না একটির পর একটি করে ভেসে উঠছে আমার মানসপটে। আজো মনে পড়ে যখন এ বইয়ের পাণ্ডুলিপি সমাপ্ত করে ঢাকা গিয়েছিলাম তখন সবচাইতে বেশী প্রেরণা যুগিয়েছিলেন আর আমাকে বারবার আশা ভরসা দিয়ে উদ্দীপিত করে তুলেছিলেন ডঃ হাসান জামান সাহেব। আজ তিনি এই জড় জগতের সাথে সকল সম্পর্ক চুকিয়ে পাড়ি জমিয়েছেন আখিরাতের সেই অবিনশ্বর লোকে। 'বালাদুন আমীন' বা নিরাপত্তাপূর্ণ নগরে চির নিদ্রিত রয়েছেন। আল্লাহ্ পাক তাঁর রূহের মাগফিরাত করুন। এই ধরনের আরো বহু সুধী সজ্জন আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন, যাঁদেরকে 'মরহুম' বলতেও আজ মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে।

এখন যাকগে সে সব কথা। মনের কোণে একান্তই ইচ্ছে ছিল 'কুরআনের চিরন্তন মু'জিযা' গ্রন্থে এবারে কিছুটা তথ্য সংযোজন ও পরিবর্ধন করতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা' আর সম্ভবপর হয়ে উঠল না। তাই অন্তরকোণে সে

আশা পোষণ করে অনাগত ভবিষ্যতের পানেই তাকিয়ে রইলাম। আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যতের তওফীকই আমাদের একমাত্র সম্বল। ওয়ামা মালিকা আলাল্লাহি বিআযীয।

পূর্বেকার ন্যায় এ সংস্করণটিও প্রকাশিত হলো বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক জনাব এম. এ. সোবহান, সচিব ফ্লাইট লেঃ (অবঃ) ফিরোজ এ. আখতার, প্রকাশনা পরিচালক অধ্যাপক আবদুল গফুর, পরিচালক, সমন্বয়, আবদুল কুদ্দুস প্রমুখ চিন্তাশীল বিদগ্ধ ব্যক্তির সৌজন্যে। লেখক ও সাহিত্যিকদের এই আশা ও নিরাশার মাঝে এঁরা তবুও যে আশার আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে নিরন্তর প্রেরণা যুগিয়ে গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন—এটা কম নয়। এ প্রসঙ্গে আমি আরো কয়েকজনের অকুণ্ঠ সাহায্য, আনুকূল্য ও সহৃদয়তার কথা বারবার স্মরণ করছি। এঁরা হচ্ছেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জনাব হাফেজ মঈনুল ইসলাম, মোঃ আবদুর রায্যাক, শেখ ফজলুর রহমান, মোঃ রুহুল আমীন এবং সংশ্লিষ্ট আরো অনেকে।

রাজশাহী থেকে প্রুফ দেখাও আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই এ ব্যাপারে আমাকে সক্রিয় সাহায্য সহযোগিতা করেছেন মোহাম্মদ মোকসেদ, জনাব তাহের সিদ্দীকী, মোঃ আবদুল বারেক প্রমুখ।

সুষ্ঠু মুদ্রণের দায়িত্ব নিয়ে যথেষ্ট কর্তব্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন জনাব মোস্তফা শহীদুল হক। আজিকার শুভলগ্নে এঁদের সবাইকে আমি আন্তরিক মুবারকবাদ জানিয়ে আপাতত ছেদ্ টানছি। আল্লাহুম্মা ওয়াফিফকনা ওয়া যিক্না।

বিনোদপুর, কাজলা, রাজশাহী
৯ই জিলহজ্জ, ইয়াওমে আরাফাত,
১৪০৪ হিঃ ৬-৯-৮৪ ইং

ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক ও সভাপতি
আরবী-ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মুখবন্ধ

বিশ্ব সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ্ তা'আলার এক বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। বিচ্ছিন্ন বা উদ্দেশ্যহীনভাবে কেবল খেলার ছলে এসব সৃষ্ট হয়নি। সুতরাং স্রষ্টার বিশেষ তাগিদেই, বিশেষ প্রক্রিয়ায়, বিশ্বের কল্যাণের জন্যই, সামগ্রিকভাবে জীব-জগতের হিতের জন্যই তাঁর নির্দেশ বা জীবন-বিধান অবতীর্ণ হয়েছে, ওহীর মাধ্যমে, রিসালার মাধ্যমে আর এ জীবনে অমোঘবিধানই 'আল-কুরআন'। এ জীবন বিধানই সামগ্রিক কল্যাণ ও শান্তির অনুসরণীয় মানব কর্ম নির্ধারক ও নিয়ন্ত্রক। এর মাধ্যমেই মানুষ স্রষ্টার সৃষ্টির প্রকৃত অভি-প্রায় অনুধাবন করে এবং তা কার্যে পরিণত করে এ জীবন ও পরজীবন—দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনের পথ সুগম করার সুযোগ পায়। কিন্তু এ সত্যের সন্ধান মানুষ পেয়েও অনুসরণে উপেক্ষা ও অনীহা দেখিয়েছে, ব্যর্থ হয়েছে তা বুঝতে এবং তা কর্মে প্রয়োগ করতে। আর তারই ফলে চার-দিকে, 'আজ হিংসায় উন্মত্ত পৃথিব নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব'। বিশ্বময় অশান্তি দূরীভূত হওয়ার একমাত্র উপায় এ বিধানের হুবহু অনুসরণ। কিন্তু আমরা আজ একথা যতই জোর দিয়ে বলছি, ততই তার আদর্শ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। এ-ই হয়ে দাঁড়িয়েছে ফ্যাশন, নিয়ম।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি কথা অবশ্য স্মরণ রাখতে হবে। সাধারণত নবী-রসূল ও মহাপুরুষদের চরিত্রের অসা-ধারণ গুণাবলী লক্ষ্য করে তাদের সাধারণের উর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি অতিমানবত্ব আরোপের বিরুদ্ধে আল-কুরআন বারবার দৃপ্ত ভাষায় সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছে। বলা হয়েছে ঃ তিনি সাধারণ মানুষের মতই একজন মরণশীল মানুষ, কেবল নিপীড়িত পথভ্রষ্ট মানুষের মুক্তির বাণী, মিথ্যা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র সতর্ক

বাণী প্রচারের জন্য এবং সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই দুনিয়ায় এসেছেন। আর এ রসূল হযরত মুহাম্মদ (সঃ) চল্লিশ বছর বয়সে ৬১০ ঈসায়ী সালে নবুওত পান। সে সময় থেকে আরম্ভ করে ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তেইশ বছর ধরে মক্কা মুয়াযযমায় ও মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থানকালে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপলক্ষে নানা ঘটনা পরম্পরায় ফিরিশতা হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর মারফতে তাঁর উপর যে সব ওহী বা প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছে সে সবের সমাবেশই আল-কুরআন। ঘটনার বৈচিত্র্য ও সময়ের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও এর বর্ণিত বিষয়ে কোন অসামঞ্জস্য ও অসংহতি পরিলক্ষিত হয় না বরং বিষয় ও ঘটনা সমাবেশ পরম্পরায় সামঞ্জস্যপূর্ণ, সম্পর্কযুক্ত ও প্রাসঙ্গিক। আল-কুরআন যে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর শ্রেষ্ঠ মু'জিযা, এ যে একমাত্র শ্রেষ্ঠ অবিকৃত ধর্মগ্রন্থ এবং এ যে মানুষের রচিত নয়, আল্লাহ্‌রই প্রেরিত তার বহু প্রমাণ রয়েছে। আল-কুরআনের অবিসংবাদিতা আল-কুরআনের অভ্যন্তরেই বিদ্যমান। এর অসত্যতা সম্বন্ধে হযরত (সঃ)-এর জীবদ্দশায়ই বহু 'জাল নবী' বিদ্বান, পণ্ডিত ও সাহাবা যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একে ঐশীবাণী বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এর ঐশীবাণী হওয়ার অনুকূলে অন্য কোন প্রকার প্রমাণের সাহায্য না নিয়ে একমাত্র কুরআনের মাধ্যমে কুরআনের বিচার করলেই একথা প্রমাণিত যে, তা আল্লাহ্‌র কালাম না হয়ে অন্য কারো কালাম হতে পারে না। এর ছন্দ পুরাপুরি গদ্য নয়। অথচ সাহিত্যের গদ্য রীতির অনুপম সরল গভীরতার সঙ্গে বলিষ্ঠ গাম্ভীর্য এবং তার মাধ্যমে অভিব্যক্ত ভাব-সম্পদের প্রকাশ দ্যোতনা নজীরবিহীন। এর আংশিক পুরোপুরি পদ্যও নয়। অথচ পদ্যের সাবলীল ভাব মাধুর্যের মোহময় পরিবেশ সর্বজনে হৃদয়-ভেদ্য করে তোলার সুর মূর্ছনা ও আবেগ সৃষ্টির অন্তর প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। অন্যান্য কারণ বাদ দিলেও এ একটি মাত্র কারণে, যাবতীয় ধর্ম গ্রন্থসহ যত ধর্ম গ্রন্থ বর্তমান, তার মধ্যে একমাত্র আল-কুরআনই বেশী সংখ্যক মানুষের কণ্ঠস্থ হয়ে হৃদয়ে স্থান পেয়েছে। এর বাক-বিন্যাস এবং রচনাশৈলী এতই অপূর্ব এবং হৃদয়গ্রাহী যে, দুনিয়ার সব মানুষ এবং জিন যদি একযোগে সমবেতভাবে

চেষ্টা করে তবুও আল-কুরআনের একটি বাক্য রচনা করতে সমর্থ হবে না। তাদের সমবেত চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। স্বয়ং আল্লাহ্ পাক চ্যালেঞ্জ দিয়ে একথা বলেছেন।

আল-কুরআনের প্রতিটি আয়াত নিজের অনুপম শক্তি ও সৌন্দর্যে প্রমাণিত হয় যে, এ একমাত্র আল্লাহ্‌রই বাণী, আর কারো বাণী হতে পারে না। এর শব্দ গঠন ও রচনা কৌশল গতানুগতিক কবিতা বা কাব্যের ধরাবাঁধা সংজ্ঞার উর্ধ্বে অথচ এর সাবলীল গতিপ্রবাহ মানুষের হৃদয় মন স্পর্শ করে, অভিভূত করে। এর ভাষা ও ভাবের সঙ্গে তুলনীয় ভাব ও ভাষার সাযুজ্য সাধন পৃথিবীর কোন ভাষায়, কোন পার্থিব মন-মস্তিষ্ক ও কুশলতার ক্ষমতার অতীত। হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর যে সব বাণী হাদীস হিসেবে বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে সংকলিত ও সুরক্ষিত রয়েছে, অনুপম রচনাভঙ্গি ও প্রাঞ্জল শব্দ-সম্ভারে সে সব তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য আরববাসীর ভাষা ও রচনাভঙ্গি থেকে বহুগুণ উন্নত, বিচিত্র ও রসসমৃদ্ধ। অথচ তাঁরই পবিত্র মুখ-নিঃসৃত কুরআন-বাণী তাঁর হাদীস-বাণী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং মানবীয় ভাবভঙ্গি ও রচনাশৈলীর উর্ধ্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্তরে অবস্থিত অপৌরুষেয় শাশ্বত মহাবাণী। আর তা নিছক বাক্‌জালে মায়া কুহেলী বা বাগাড়ম্বরের চাতুর্যও নয়। এর প্রতিটি আয়াত স্বয়ং সম্পূর্ণ।

পবিত্র কুরআনই প্রমাণ করে যে, এ কোন মানুষের রচনা নয় এবং কোন মানুষের পক্ষে এরূপ একখানি গ্রন্থ রচনা সম্ভবও নয়। এর ভাষার বৈশিষ্ট্য, ছন্দের লালিত্য এবং ভাবের উৎকর্ষ-দৃষ্টে মনে হয় এ রচনা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আল-কুরআন যখন অবতীর্ণ হতে থাকে তখন বিধর্মীরা এ সন্দেহ উত্থাপন করেছিল যে, এ ঐশী বাণী নয়, এ মুহাম্মদ (সঃ)-এর নিজের রচনা। এ দাবী যে ভিত্তিহীন সে কথা আল্লাহ্ নিজেই ঘোষণা করেছেন: "ওয়া ইনকুনতুম ফী রাইবিম মিম্মা নায্‌যালনা আ'লা আব'দিনা ফাত্‌হু বিসূরাতিম্ মিম মিসলিহী, ওয়াদ'উ শুহাদাআহকুম মিনদুনিল্লাহি ইনকুনতুম স্বাদিকীন"—আমার বান্দার উপর যা অবতীর্ণ করেছি, তাতে যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে, তবে এর মতো একটি মাত্র সূরা বা অধ্যায় তোমরা

আন দেখি। আর তোমরা সত্যবাদী হলে, আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের যে সব সমর্থকরা রয়েছে তাদের ডাক। এ সূরার মতো আর একটি সূরা আনার ব্যাপারে আল্লাহ্ ছাড়া আর যে কারো সাহায্য গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ সেরূপ একটি সূরা রচনা করতে সমর্থ হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না। এতেও প্রমাণ হয় যে, কুরআন আল্লাহ্র বাণী ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। এটি কুরআনের একটি নিজস্ব মু'জিযা, এরূপ আরো বহু ই'জায ও প্রমাণ রয়েছে।

আল-কুরআনের মু'জিযা বা 'ইজাযুল কুরআন' সম্পর্কে আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। কিন্তু আমাদের জানামতে বাংলায় এ ধরনের পুস্তক একটিও বের হয়নি। ইসলাম নিয়ে, কুরআন নিয়ে এসব পাঠ ও অনুশীলনী এখন 'আউট অব ফ্যাশান' হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘটনাচক্রে এবং তা নিজের গরজেই বেশী, যখন কোন খৃস্টান বা য়াহূদী 'ইসলামিস্ট' এ সম্বন্ধে লিখেন এবং আমরা যেই তাঁর কাছ থেকে ইসলাম সম্বন্ধে একটু আধটু প্রশংসা শুনতে পাই অমনি এই বলে লাফিয়ে উঠি যে, এ মোক্ষম ধর্ম, এর চাইতে সেরা আর কিছু নেই। এরপর তা জীবনে প্রয়োগ করা তো দূরের কথা; কারণ সে তো লজ্জার কথা, নিজের মুখে ঝাল খাওয়ার এমন কি চেখে দেখারও দরকার মনে করি না। অন্যের মুখে ঝাল খেয়ে দেখলে বিশ্বাস পাকা হয় কেননা, আমাদের 'গুরুরা' যা বলেছেন তা তো মিথ্যা হতে পারে না। বিশেষত কে যায় অত কষ্ট করে দেড় হাজার বছর আগের পুরোনো 'বস্তা পচা' আদর্শ ও ঐতিহ্যের কথা এবং তার মধ্যে যে জীবন ব্যবস্থা রয়েছে তার কথা ঘেঁটে বের করতে; আর তার আবার জীবনে প্রয়োগ করার কথা ;সে তো চিন্তাই করা যায় না। এসব পণ্ডশ্রম রেখে আধুনিক 'ইজম'গুলোর হোতাদের দ্বারস্থ হলে নাম-কাম-মোক্ষ-অর্থ-এ চতুর্বর্গ ফল-শ্রুতির সমন্বয়ও সাধিত হয়, আখিরাত-টাখিরাতের ব্যাপারও চেপে যাওয়া যায়।

এরূপ যখন আমাদের পণ্ডিতদের মনোবৃত্তি, ঠিক সে সময় অধ্যাপক মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান বহু পরিশ্রম করে আরবী, ফারসী, উর্দু ও ইংরেজী

ভাষা থেকে উদ্ধার করে বাংলায় প্রকাশের 'ঔদ্ধত্য' প্রকাশ করেছেন, এ কেবল আশার কথা নয়, এতে তাঁর আকিদা ও স্বজাতি-প্রীতিও প্রতিফলিত হয়েছে। অধ্যাপক সাহেব নিজে একজন সুপণ্ডিত ও ইসলামবিদ। তিনি আল-কুরআন নিয়ে, বিশেষ করে বাংলায় লিখিত কুরআন শরীফ সম্পর্কে দীর্ঘ দিন গবেষণা করেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর অভিসন্দর্ভ তাঁকে অবিলম্বে ডক্টরেট ডিগ্রীতেও সম্মানিত করবে, আশা করি। তিনি তাঁর বক্ষ্যমান গ্রন্থের উপস্থাপনায় নিজেই বলেছেনঃ 'ইজাযুল কুরআন' বা কুরআনের অলৌকিকতাকে কেন্দ্র করে এ যাবত আরবী ভাষায় যে সমস্ত মনীষী যতগুলো পুস্তক প্রণয়ন করেছেন, তাঁদের প্রায় সবারই পরিচয় ও সুবিস্তৃত আলোচনার দীর্ঘ সূচী তিনি পর্যায়ক্রমে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাছাড়া, ই'জায শাস্ত্রকে কেন্দ্র করে তাদের মতবাদ সম্পর্কেও বিস্তৃত আলোচনা, পর্যালোচনা ও যথাসাধ্য বিচার বিশ্লেষণ করতে কসুর করেন নি।

অধ্যাপক মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান সাহেবের বইখানির সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরার মতো বিদ্যা আমার নেই। তবে কেবল এতটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসূল আর কুরআন ও সুন্নাহ্ অনুসরণের অমোঘ বিধান ও উৎস আল-কুরআন পাঠের অবশ্য পাঠ্য ভূমিকা হিসেবে 'ইজাযুল কুরআন' বা চিরন্তন মু'জিযা' বাংলা ভাষার পাঠককে দৃঢ় বিশ্বাসের দিকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যাবে, একথা জোর করেই বলা যায়। কুরআনের 'চিরন্তন মু'জিযা' গ্রন্থখানির নামেই এর পরিচিতি বিধৃত। তাঁর লেখায় সত্যানুসন্ধিৎসু অন্তঃকরণের ও অমায়িক আত্মবিনয়ের যে পরিচয় রয়েছে, কোথাও তা আত্মশ্লাঘা অহং-বোধে পর্যবসিত হয়নি। আমাদের বাংলা সাহিত্যের ধর্মীয় শাখায় তথা কুরআন সম্পর্কীয় পঠন পাঠনে সহায়ক এ গ্রন্থখানি নিঃসন্দেহে একটি অতি প্রয়োজনীয় সংযোজন বলেই স্বীকৃতি পাবে, এ বিশ্বাস আমাদের রয়েছে।

অধ্যাপক মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান সাহেবের 'কুরআনের চিরন্তন মু'জিযা' গ্রন্থের বেশীর ভাগ লেখা প্রবন্ধাকারে বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। বহু দিন পরে হলেও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, জাতির এ দুর্দিনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়,

এ প্রবন্ধগুলো বই আকারে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে পরম আনন্দিত হয়েছি এবং এ সুযোগে গ্রন্থকারকে জানাই খোশ আমদেদ।

৩.১০.৭৯

ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ

৩১/জি, ঈসা খাঁ রোড
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা—২

প্রফেসর, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

লেখকের আরজ

এ কথা হয়তো আমাদের কারুর অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের মূল উৎস হচ্ছে কুরআন মজীদ। তার পরেই আসে হাদীস শরীফ, সীরাত, ইসলামের ইতিহাস, ফিকাহ শাস্ত্র, আকায়িদ ইত্যাদি। দুঃখের বিষয় এগুলো আরবী ভাষার নিগড়ে আবদ্ধ থাকায় বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে আজও রয়ে গেছে বহুল পরিমাণে অনধিগম্য।

এদিক থেকে ফার্সী, উর্দু, ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষা যতোটা প্রগতিশীল ও সমৃদ্ধ, তার তুলনায় আমাদের বাংলা ভাষা পশ্চাদপদ। এর প্রধান কারণ বাংলা ভাষার এই শাখাকে এদেশে নানা কারণে অনতিক্রম্য বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে।

ধর্ম মানুষের পরতে পরতে সুমধুর বীণার ঝংকার তোলে অপূর্ব রাগে। কিন্তু এই ধর্মকে ভালো করে জানতে হলে মাতৃভাষার মতো আর কোন বাহন এর অন্তর্নিহিত মূল মর্মকে স্পর্শ করতে পারে না।

মাতৃভাষা আমাদের আরবী নয় বটে কিন্তু তবুও প্রতিটি মুসলিমের জন্য তার প্রাণের উৎসারিত গোপন বাণীর বাহনই হচ্ছে আরবী। অধিকাংশ বাঙ্গালী মুসলমান নামাযের মধ্যে আজও বিশ্বপ্রভুর প্রতি তাঁদের অন্তরের অন্তঃস্থিত কোণ থেকে উৎসারিত এবং যুগ যুগ ধরে সঞ্চারিত কতো বাসনা কামনা আর প্রাণের কতো গোপন কথাই না নিবেদন করে থাকেন আকুল কণ্ঠে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে তাঁদের স্বাস্থ্য, অর্থ, আরাম আয়েশ—সব কিছুই পশ্চাতে ফেলে তাঁরা অকুণ্ঠচিত্তে, অস্থির অবিরাম গতিতে ছুটে চলেন মহিমার পুণ্য ক্ষেত্র, কল্যাণ ও বরকতের মর্মকেন্দ্র মক্কা-মদীনার পানে। হৃদয় কোণ থেকে উত্থিত কতো দিনের কতো গোপন বাসনার কথাই না তাঁরা নিশিদিন উচ্চারণ করে থাকেন

বিশ্বপিতা মহান প্রভুর দরবারে। কিন্তু কী যে নিবেদন করেন, তা তাঁরা নিজেই বোঝেন না বা অনুধাবনের চেষ্টাও কোনদিন করেন না। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্তের নামাযে তাঁরা নির্ভেজাল একত্ববাদ বা খালেস তওহীদের কথা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, অথচ কার্যত তাঁরা কবরে গিয়ে সিজদা করেন আর মাযারে দরগায় ধন্না দিয়ে ফুল-চন্দন চড়াতে এবং জোড়া খাসি ও জোড়া মোরগের মানত মানতে আদৌ দ্বিধাবোধ করেন না। এ সবের একমাত্র কারণ বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে বাংলা সাহিত্যের এই ধর্মীয় শাখার অনু-প্রেরণা ও উপকরণ—দুয়েরই রয়েছে একান্ত অভাব-অপ্রতুলতা। এই অভাব ও দৈন্যের কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে কতকটা তার নিরসন কল্পে আমার এই অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। এই অসাধিতপূর্ব ও অসমাপ্ত একটা কর্তব্যের সমাধা ও বিদগ্ধ সুধী পাঠক গোষ্ঠীর দুর্বার প্রচ্ছন্ন চাহিদা পূরণ ও অভাব-মোচনের অভিপ্রায়ই যেন আজ আমাকে এই দুঃসাহসিক কাজে হস্ত-ক্ষেপ করতে প্রেরণা যুগিয়েছে। তাই নিজের স্বল্প বিদ্যাবুদ্ধি এবং অন্যান্য অযোগ্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল হওয়া সত্ত্বেও হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত আবেগকে সংবরণ করতে না পেরে এই দুর্গম বন্ধুর পথে পা বাড়িয়েছি। বিচার-বিশ্লেষণ করার সূক্ষ্ম মানদণ্ড ও কষ্টিপাথর যাঁদের হাতে ন্যস্ত রয়েছে সেই বিদগ্ধ চিন্তাশীল পাঠকরাই এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মূল্যায়ন করবেন বলে আশা পোষণ করি।

ইসলামের মূল উৎস হিসেবে এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের মুসল-মান এবং বিশেষ করে তাঁদের যোগ্যতাসম্পন্ন নাগরিকদের পক্ষে কুরআন প্রচার ও প্রসারের গুরু-দায়িত্বটা অনস্বীকার্য ও অপরিসীম। খুশীর কথা যে, আজ আমাদের বাংলাদেশীয় ভাইয়েরা এই গুরু-দায়িত্ব সম্পর্কে তবুও যেন কতকটা সজাগ, সচেতন ও ওয়াকিবহাল। বাংলা সাহিত্যের এই ধর্মীয় শাখাটিকে সমৃদ্ধ করার ব্যাপারে আজ যোগ্য নাগরিকদের মাঝে কিছুটা আলোড়ন ও প্রবণতা দেখা দিয়েছে। কুরআনের ই'জায বা অলৌকিকতা এবং এর চিরন্তন মু'জিযাও যে এই ধর্মীয় শাখার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ ও গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র এবং এই শাস্ত্র সম্পর্কে আরবী, উর্দু প্রভৃতি ভাষায় প্রচুর পরিমাণে বই

পুস্তকের রয়েছে অপূর্ব সমাবেশ—এতে শক্-সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু বেল পাকলে কাকের কি লাভ ?

তাই একটা অপ্রিয় অথচ স্বতঃসিদ্ধ সত্যের প্রতি ইঙ্গিত দিতে গিয়ে দুঃখের সাথে জানাতে হচ্ছে যে, 'ই'জাযুল কুরআন' বা কুরআনের অলৌকিকতার মতো একটা অতি ব্যাপক ও দিগন্ত বিস্তৃত বিষয়বস্তুর প্রতি আজ পর্যন্ত আমাদের বাংলা ভাষায় চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়েছে। ইতিপূর্বে এ নিয়ে হয়তো আমার ও অন্যান্যদের লেখনীর মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধাবলী প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এ সম্পর্কে বাংলায় কোন বিশেষ বই পুস্তক লিপিবদ্ধ ও প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

সুতরাং অবহেলিত, উপেক্ষিত অথচ গুরুত্বপূর্ণ এই দিকটার প্রতি বাংলাদেশের সুধী সমাজের শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করার মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়েই আজ আমি লেখনী ধারণ করেছি। অবশ্য ইতিপূর্বে প্রাথমিক পর্যায়ে আমার এ সম্পর্কিত লেখাগুলো ধারাবাহিকভাবে প্রায় দু'আড়াই বছর ধরে মরহুম মওলানা আকরম খাঁ সম্পাদিত অধুনালুপ্ত মাসিক মোহাম্মদীর পৃষ্ঠায় প্রকাশ পেয়েছিল। তখন আমি এতটুকু আশা করতে পারিনি যে, পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠা ছাড়িয়ে একদিন এই লেখাগুলো পুস্তকাকারে আত্মপ্রকাশ করে বহির্জগতের আলো বাতাসের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে। প্রকাশনার ব্যাপারে উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছেন আমার সহকর্মী খ্যাতনামা লেখক অধ্যাপক মুহম্মদ আবু তালিব এবং ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ। এই শেষোক্ত মনীষী শুধু উৎসাহ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং বইয়ের সূচনায় এক মূল্যবান মুখবন্ধ লিখে দিয়ে আমার প্রতি তাঁর স্নেহ ও প্রীতি প্রদর্শন করেছেন। আমার শুভাকাঙ্ক্ষী ও শুভানুধ্যায়ী ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক জনাব আ. জ. ম. শামসুল আলম সাহেব মুদ্রণ ও প্রকাশনার যাবতীয় ব্যয় ও দায়িত্বভার গ্রহণ করে পূর্ণ সহায়তার অপরিশোধ্য ঋণজালে আমাকে আবদ্ধ করেছেন। এ'দের কাছ থেকে আশা-ভরসা, উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা না পেলে আমার এ অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা হয়তো আজ সার্থকতার

বাস্তব রূপ লাভে সমর্থ হতো না; বরং পত্র-পত্রিকার অন্তরালেই সীমিত থেকে গুমরে গুমরে মরতো আর এভাবে প্রকাশনার কাজটি আরও বিঘ্নিত এবং বিলম্বিত হতো। এ প্রসঙ্গে আরও কয়েকজনের কাছে আমি অজস্র অকুণ্ঠ শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতার অক্টোপাশে আবদ্ধ। এ'রা হচ্ছেন দৈনিক আজাদের সহ-সম্পাদক আমার সোদরপ্রতিম জনাব মাওলানা মনুজ্ঞাহির আহমদ রহমানী ও সাপ্তাহিক 'আরাফাত' সম্পাদক জনাব মুহাম্মদ আবদুর রহমান সাহেব। এ'দের সবার প্রতি অকুণ্ঠ শুকরিয়া জ্ঞাপন করার মতো উপযুক্ত ভাষা আমার কাছে নেই। তাই ঘটা করে আলাদা আলাদাভাবে সবার নামোল্লেখ করে আজ আমি তাঁদের মর্যাদাকে খাটো করতে এবং অযথা ঋণের বোঝা বাড়াতে চাইনে। চাই শুধু অলক্ষ্য থেকে নীরব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে এবং তাঁদের যোগ্য প্রতিদানের জন্যে আল্লাহ্ পাকের বারগাহে দোয়া করতে।

'কুরআনের চিরন্তন মু'জিযা'র ভূমিকা লিখতে বসে আজ বিগত দিনের নানান কথাই একটির পর একটি করে আমার মানসপটে ভেসে উঠছে। আজ থেকে প্রায় তেরো চৌদ্দ বছর আগে 'কুরআনের ই'জায' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রথম সংখ্যাটি হাতে নিয়ে মাসিক 'মোহাম্মদী'তে প্রকাশের জন্যে যখন তাঁর দফতরে গিয়ে হাযির হয়েছিলাম, তখন মওলানা আকরম খাঁ বেঁচেই ছিলেন। সে দিনের গোধূলী বেলায় মাসিক 'মোহাম্মদী কার্যালয়ের বহি-রাঙ্গণে একটা ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে সম্ভবত তিনি অপরাহ্নের মিঠে রোদ পোয়াচ্ছিলেন। এমনি সময়ে আমার কাছ থেকে আমার লেখার প্রথম সংখ্যাটি হাতে নিয়ে আগ্রহের সঙ্গে তিনি তা পড়তে লাগলেন। শেষে বললেন, "এ তো খুশীর কথা যে, কলম হাতে নিয়েই তুমি একটা সম্পূর্ণ নতুন এবং স্বতন্ত্র দিকের প্রতি আলোকপাত করতে প্রয়াস পেয়েছো। এটা আমার 'মোহাম্মদীতে ছাপানো হবে।" বলা বাহুল্য, মরহুম মওলানার মুখনিঃসৃত এই আশাব্যঞ্জক কথা শুনে সেদিন আমার এই হতাশাগ্রস্ত প্রাণে এনে দিয়ে-ছিল এক অব্যক্ত খুশীর দোলা। আজ সেই অশীতিপর জ্ঞানতাপস আর ইহজগতে নেই। এই নশ্বর দুনিয়ার সাথে সকল সম্পর্ক চুকিয়ে সেই

অবিনশ্বরলোকের যাত্রাপথে পাড়ি দিয়ে আজ তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন। তাঁর পরলোকগত রূহের মাগফিরাত কামনান্তে আল্লাহ্‌র দরবারেই প্রার্থনা জানাই ঃ

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ... من
فتنة القبر وعذاب النار —

উর্দু ভাষায় ইতিপূর্বে আমার লেখা বই-পুস্তক ও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে বটে; কিন্তু বাংলায় এটিই ছিল আমার প্রথম গ্রন্থ। আজ থেকে প্রায় ১৪ বছর আগে চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ ডিগ্রী কলেজে উর্দুর অধ্যাপক থাকাকালীন আমি এর পাণ্ডুলিপিটি তৈরী করেছিলাম। তাই প্রথম লেখা হিসেবে নিজের অজ্ঞাতসারে এতে বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভ্রম-প্রমাদ থাকা একান্তই স্বাভাবিক। তাছাড়া রাজশাহী শহরটি শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ হওয়া সত্ত্বেও সেখানে এবং চাঁপাই নওয়াবগঞ্জে প্রয়োজনীয় মূল গ্রন্থাবলী পাওয়া একেবারেই দুরূহ। তাই এমন স্থানে বসে একটা তথ্যবহুল বই লেখা যে কতো দুষ্কর তা ভুক্ত-ভোগীদের সামনে ব্যক্ত করা আমি নিষ্প্রয়োজন মনে করি। অনেক সময় প্রয়োজনীয় উপকরণ-উপাদান এবং মাল-মসলার জন্যে ঢাকা এমন কি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্তও আমাকে ছুটোছুটি করতে হয়েছে। কিন্তু তবুও কি সব সময় সর্বত্র আমার ঈপ্সিত উপকরণ পেয়েছি? সুতরাং যা পেয়েছি পাণ্ডুলিপির অন্তর্ভুক্ত করেছি, আর যা পাইনি পরবর্তী সংস্করণের জন্যে রেখে দিয়েছি।

'ইজাযুল কুরআন' বা কুরআনের চিরন্তন মু'জিযাকে কেন্দ্র করে এ পর্যন্ত আরবী ভাষায় যে সব মনীষী যতোগুলো বই-পুস্তক ও গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, আমি সাধ্যানুসারে তাঁদের প্রায় সকলেরই পরিচিতি ও বিস্তারিত আলোচনায় সূচী পর্যায়ক্রমে লিপিবদ্ধ করতে প্রয়াস পেয়েছি। এছাড়া এই ইজাযুল শাস্ত্রকে কেন্দ্র করে তাঁদের মতবাদ সম্পর্কেও বহুপক্ষ আলোচনা-পর্যালোচনা এবং যথাসাধ্য বিচার বিশ্লেষণ করতে আমি আদৌ কসুর করিনি। এতে কতোটুকু কামিয়াব হয়েছি বা না হয়েছি সে মন্তব্যের ভার রইলো সুধী পাঠকবর্গের

উপর। কেননা নিজের জ্ঞান-বিবেক ও বিদ্যা-বুদ্ধির সীমিত পরিধি সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ সচেতন ও ওয়াকিফহাল।

'ইজায' শব্দটির তাৎপর্য এই যে, পবিত্র কুরআনের অনুরূপ সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে দুনিয়ার প্রায় সকল যুগে সকল স্থানে যে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে সেই চিরন্তন চ্যালেঞ্জকে মাথা পেতে গ্রহণ করে এর মুকাবিলা করতে আজ পর্যন্ত সবাই সর্বতোভাবে অপারগ হয়েছে এবং চিরদিনই তা' থাকবে। পক্ষান্তরে এই পবিত্র কুরআনের অলৌকিক প্রভাব দ্বারা আঁ হযরত (সঃ)-এর সোনালী যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত প্রতি যুগে প্রতি স্তরে প্রতি শতাব্দীতে প্রত্যেকের অন্তর আলোকোজ্জ্বল হয়েছে। আর এই বিষয়বস্তু নিয়ে অগণিত গ্রন্থও লিপিবদ্ধ এবং প্রকাশিত হয়েছে। এদিক থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বলিত বইটি বাংলার জ্ঞানতাপসদের জ্ঞান পিপাসাকে একটুখানি নিবৃত্ত করতে পারলেই আমি শ্রম সার্থক মনে করবো।

যে সব মৌলিক গ্রন্থ থেকে আমি সাহায্য নিয়েছি ও তথ্য আহরণ করেছি সেগুলোর সাধ্যমতো আমি বরাত দিতে চেষ্টা করেছি। এঁদের সবার কাছেই আমি কৃতজ্ঞতার জালে জড়িত। বইয়ের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় হয়তো কিছু কিছু বরাতের উল্লেখ বাদ পড়তেও পারে। ভবিষ্যতকালের জনসমাজ অনাগত দিনের নাগরিক এবং তরুণ লেখক ও ভাবী গবেষকদের জন্য এ সম্পর্কে আরও নবনব তত্ত্ব ও তথ্যবহুল গ্রন্থ প্রণয়নের প্রতি প্রেরণা যোগানো এবং পথ নির্দেশনাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। কারণ প্রাথমিক পর্যায়ের বই কোন দিনই পূর্ণাংগ হয় না। আর একটি কথা, সাময়িক পত্রে ধারাবাহিক প্রকাশনার ফলে বিষয়বস্তুর উল্লেখে কোন কোন স্থানে পুনরুক্তিও ঘটতে পারে। তাই এক্ষেত্রেও আমি সবার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

চিরন্তন মু'জিযা বা ইজায শাস্ত্রাভিজ্ঞ মনীষীবৃন্দ এবং তাঁদের প্রাসংগিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থমালার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে সে অনুসঙ্গে আমি তাঁদের অন্যান্য বিষয়বস্তু সম্পর্কিত পুস্তকাবলীর কথাও উল্লেখ করে দিয়েছি। অনেকের কাছেই হয়তো এটা অবান্তর অপ্রাসংগিক ঠেকবে। কারণ বইয়ের শিরোনামার সাথে এর বিশেষ কোন সুসংগতি নেই। কিন্তু এমনটি করার পেছনে আমার

মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আরবী সাহিত্যের সুসমৃদ্ধি এবং এ ভাষার রচিত অগণিত গ্রন্থমালার ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী পরিধি সম্পর্কে পাঠকবর্গকে কিছুটা অবহিতকরণ। অবশ্য সব মনীষীদের নাম ও তাঁদের গ্রন্থমালার সুদীর্ঘ সূচী দেওয়া এই ক্ষুদ্র বইয়ে সম্ভবপর হয়নি। অনাগত দিনে ইন্‌শাআল্লাহ সেগুলোর বিবরণ দেয়ার আমার ইচ্ছে রইল।

'কুরআনের চিরন্তন মু'জিযা'র পরিসমাপ্তি কিন্তু এখানেই নয়। আগামী দিনে হয়তো আমি আর সময় সুযোগ করে উঠতে পারবো না—এই ভয়ে এটিকে প্রথম খণ্ড হিসেবে উল্লেখ করার সৎ সাহস আমার হয়নি। নতুবা আরও বহু মনীষীর মতামত ও তাঁদের গ্রন্থাবলীর বিশদ আলোচনা বাকী রয়ে গেছে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এ সবের বিস্তারিত আলোচনাসহ এর পরবর্তী খণ্ড হাতে নিয়ে হয়তো আবার উপনীত হতে পারি সুধী পাঠকবর্গের খিদমতে। বিষবস্তুটি যে সুদূরপ্রসারী তা এখান থেকেই অনুমান করা যায়। ভাবীকালে তাই শুভানুধ্যায়ী সুযোগ্য পাঠক-পাঠিকার কাছ থেকে এই আরব্ধ কাজের আশু পরিসমাপ্তির ব্যাপারে আমি ঐকান্তিক দোয়া প্রত্যাশী।

আগেই বলেছি লেখাগুলোতে হাত দিয়েছিলাম আজ থেকে প্রায় এক যুগেরও বেশ কিছুদিন আগে। তারপর বর্ষ পরিক্রম তথা কালের আবর্তন বিবর্তন এবং প্রেস থেকে প্রেসান্তরে অর্পণের কারণে এই পাণ্ডুলিপিটি একবার ঢাকার বাজারে উধাও হয়ে গিয়েছিল। সর্বপ্রথম আমাকে এর প্রাপ্তব্য স্থান সম্পর্কে খোঁজ দেয় আমার পরম স্নেহভাজন মুহাম্মদ ইউসুফ সিদ্দীক। আজ সে শুধু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অংগণই নয়, বরং বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখা পেরিয়ে মক্কা শরীফের বাদশাহ্‌ আবদুল আযিয বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। আজিকার এ শুভলগ্নে তার কথা অতি স্বাভাবিক ভাবেই বারবার স্মরণ করছি।

সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার কাছে আমার এই প্রাথমিক প্রচেষ্টার ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে আমাকে অবহিত করার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি। আর আমি যে সেগুলো পরম সাদরে কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহণ করে আগামী সংস্করণে তার সংশোধন ও সংযোজন করার চেষ্টা করবো তারও প্রতিশ্রুতি

দিচ্ছি। এ ছাড়া আরও নতুন তথ্য, সত্য ও সুপরামর্শ দিয়ে বইয়ের ভবিষ্যৎ উন্নতিকল্পে কেউ সাহায্য করলেও আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। সর্বশেষে তাঁদের খিদমতে এর গুণাগুণের বিচার ভার অর্পণ করে আজকের মতো আপাততঃ এখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি।

মির্যাপুর, বিনোদপুর
পোঃ কাজলা, রাজশাহী

মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

সূচিপত্র

চিরন্তন মু'জিযা—১

জালনবী

আল-আসওয়াদুল আনসী—৪
ইবনু সাইয়াদ—৫
মুসায়লামা—৭
সহীহ্ বুখারীর শারাহ ফাতহুল বারী—৮
সাজাহ বিনতু সুআইদ—১২
তুলায়হা ইবনু খুওয়ায়লিদ—১৭
ভণ্ড নবী উদ্ভবের মূল কারণ—২০
আল-মুখতার ইবনু 'উবাইদ—২২
মুকান্না খুরাসানী—২৭
উসতাদ সীস—৩২
ফাতিমা—৩২
মাহমুদ ইবনু ফরেজ নিশাপুরী—৩৪
বাহবুজ ইবনু আবদুল ওহ্হাব—৩৪
ইয়াহইয়া ইবনু যিকরাওইহ কারমাতী—৩৫
হুসাইন কারমাতী—৩৫
ঈসা ইবনু হিমরাওইহ কারমাতী—৩৬
আবু তাহির কারমাতী—৩৬
আবু সাবীহ তারীফ—৩৭
সালেহ ইবনু তারীফ—৩৭
আবু মনসুর ঈসা—৩৭
বানান বিন সামআন তামিমী—৩৭

দামিয়া—৩৮
ইউসিয়া—৩৮
ওবায়দুল্লা আল আলা'ভী—৩৯
বাবক খুররামী—৪০
মুহাম্মদ বিন তুমারত আলাভী মাগরাবী—৪৫
মির্যা আলী বাব এবং বাহাউল্লা—৪৬
মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী—৫০
গ্রীক দর্শনের কুফর—৬৬
আল-বাকিল্লানী—৭৪
ইবনু জারীর ও হাসান আল-কুম্মী—৭৫
দ্বিতীয় শতক হিজরী—৭৮
হিজরী তৃতীয় শতক—৮০
মু'তাযিলাদের সারফা মতবাদ—৮৭
সাহিত্যিক মু'তাযিলাদের অভিমত—৮৮
যে সমস্ত মুতাকাল্লিম কুরআনের রচনাশৈলীকে
মু'জিযা হিসেবে গ্রহণ করেছেন—৯২
হিজরী ৪র্থ এবং খৃস্টীয় ১০ম শতক—৯৩
মুতাকাল্লিম আবুল হাসান আশ'আরী—৯৬
আবু হাইয়ান তাওহিদী—১০২
মুতাকাল্লিম বানদার আল-ফারেসী—১০৩
মুফাস্‌সির আত-তাবারী—১০৪
আল্ কুম্মী মুফাস্‌সির—১০৬
আল-ওয়াসেতী—১০৮
আর-রুম্মানী, সাহিত্যিক ও মুতাকাল্লিম—১০৯
আর রুম্মানী সম্বন্ধে ইয়াহিয়া আল্-ইয়ামানী—১১০
আল-খাত্তাবী—১১১
আল-'আসকারী—১১৪
আল-জাহিয আল-জুরজানী—১১৫

ইবন্ আবিল ইসাবা—১১৭
কাব্স বিন-অশামকির—১২১
ইবন্ সীনা—১২১
ইমাম ইবন্ তাইমিয়া—১২২
হাফেজ ইবন্ল কাইয়েম—১২৮
আব্ল 'আ'লা আল-মা'আররী—১৩৩
শারীফ আল-ম্রতাযা—১৩৭
হিবাতুল্লাহ আশ-শিরাজী—১৩৯
কাজী আব্ বাকর আল-বাকিল্লানী—১৪০
ইবন্ স্রাকাহ্—১৫০
ইবন্ হায্ম আল-আন্দাল্সী—১৫১
আল-খাকাজী—১৫৬
শায়খ আল-জ্রজানী—১৫৯
হিজরী ছয় শতকে ই'জায শাস্ত্র—১৬৭
আল-গাযযালী—১৬৮
কাযী আইয়ায—১৭৪
অলীদ বিন ম্গীরা—১৭৮
যামাদ আযদী—১৭৯
আয-যামাখশারী—১৮৬
ইবন্ আতীয়া আল-গারনাতী—১৯২
কুরআনের ই'জায ও তার ইতিবৃত্ত—১৯৫
ইসলাম ও ম্সলিম জাহান—১৯৭
ইবন্ র্শদ—১৯৮
হিজরী সাত শতক—খ্রীস্টাব্দ তের শতক—২০১
ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী—২০২
আস-সাক্কাকী—২০৯
ইবন্ল আরাবী—২১২

[ছাব্বিশ]

আল-আমীরী—২১৮
হাযিম আল-কারতাজান্নি—২১৯
আয্-যামালকানী—২২০
আল-কাযাওনী—২২১
ইয়াহইয়া বিন্ হামযা আল-আলাভী—২২২
আল-ইস্পাহানী—২৩০
আস-শাতিবী—২৩৯
যারকাশী-২৪৬
ইবনু খালদূন—২৪৮
শায়খ আল-মারাকেশী—২৫৪
কাসেম বিন্ কোতলুবাগা—২৫৬
আস-সুয়ূতী—২৫৭
তের শতক হিজরী-উনিশ শতক ঈসায়ী—২৭৫
মাহমুদ আলূসী—২৭৫
আবদুর রহমান আল-কাওয়াকেবী—২৮৬
মুস্তফা সাদিক আর-রাফেয়ী—২৮৮
শায়খ তান্তাভী—২৮৮
মুফতী শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু—৩০২
সাইয়েদ রশীদ রিযা—৩১৮

কুরআনের চিরন্তন মু'জিযা

চিরন্তন মু'জিযা

কুরআনের ই'জায সম্পর্কীয় ব্যাপারটাকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করার জন্য একটা বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। 'ই'জায' শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে 'আ'জয্' ধাতু থেকে, যার অর্থ হল কোন কিছু করতে অক্ষম বা অপারগ হওয়া। যেহেতু অনন্য অতুল্য কুরআন মজীদের উপর নবুওতে মুহাম্মদীর সুউচ্চ হর্ম্য প্রতিষ্ঠিত এবং এর ভাবধারা ও রচনারীতিকে আয়ত্তাধীনে আনা এই নিখিল বিশ্বের মানব শক্তির বহির্ভূত, তাই এই অতুলনীয় স্টাইলকেই বলা হয়ে থাকে 'ই'জাযুল কুরআন'। ই'জাযের এই পরিভাষার উদ্ভব কবে ও কোন্ শুভ মুহূর্তে ঘটেছিল, মুসলিম মনীষীরা আজও তার সঠিক সংবাদ দিতে অপারগ। তবে একথা সত্য যে, এটা মনুষ্য আবিষ্কৃত নয়।

হিজরীর প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে 'ই'জায' বা 'মু'জিযা' শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার আমরা দেখতে পাই না, যদিও নবুওতে মুহাম্মদীর সার্বভৌম সত্যতাকে প্রতিপন্ন করার জন্য এর উপযুক্ত প্রমাণপঞ্জী পেশ করা শুরু হয়েছিল আ' হযরতের (সঃ) জীবদ্দশায় এবং তাঁর ইনতিকালের পর তা আরও উৎকর্ষ লাভ করেছিল শত্রুপক্ষের বিরোধিতার দরুন।

হিজরী তৃতীয় শতকের প্রথম ভাগে আলী বিন যায়ন আত্তাবারী 'আল-উসূলুব-ওয়াল-বালাগাহ' নামক একটি অনবদ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন, কিন্তু এর কোথাও তিনি 'ই'জায' বা 'মু'জিযা' শব্দটি প্রয়োগ করেন নি। বরং তার পরিবর্তে তিনি ব্যবহার করেছেন 'আয়াত' 'বুরহান' 'সুলতান' প্রভৃতি প্রতিশব্দ। সম্ভবত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (মৃত্যু ২৪১ হিঃ—৮৫৫ খৃঃ) সর্বপ্রথমে নবী ও রসূলগণের জন্য 'মু'জিযা', অলী-দরবেশগণের জন্য 'কারামত' নামক শব্দদ্বয়কে ব্যবহার করেন। ইবনু ইয়াযিদ আল ওয়াসেতী (মৃত্যু ৩০৬ হিঃ—৯১৪ খৃঃ) 'ই'জায' শব্দটিকে প্রয়োগ করতে গিয়ে

তা'র 'ই'জাযুল কুরআন' নামক প্রথম সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এর অব্যবহিত পরই 'ই'জায' ও 'মু'জিযা' শব্দের ব্যবহার এই বিশিষ্ট অর্থে অতি ব্যাপক হয়ে ওঠে, আর এর পূর্বেকার বিকল্প প্রতিশব্দগুলোর প্রয়োগ ক্রমশ লোপ পেতে থাকে। যেহেতু পুনঃ পুনঃ চ্যালেঞ্জ দেয়া সত্ত্বেও পবিত্র কুরআনের অনুরূপ সাহিত্যরীতি সৃষ্টি করতে নিখিল ধরণীর জিন ও ইনসান অপারগ হয়েছে এবং আরবী ভাষায় একেই বলা হয়েছে "ফাহুম ইয়া'জিযুনা আনহু"। তাই ইবন্ জারীর আত্-তাবারী (মৃত্যু ৩১০ হিঃ) উক্ত ভাবকে প্রকাশ করতে গিয়ে এই বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহার করেছেন 'ই'জায' শব্দকে। কুরআনের বাকরীতি ও রচনাশৈলীই শুধু অননুকরণীয়—এ নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠলো, তখন তার আলোচনা শাস্ত্রের সীমাবদ্ধ গণ্ডী অতিক্রম করে গেলো। বস্তুত এই বাকরীতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য সাহিত্য-বিচারকগণ যে বিপুল সমালোচনা-সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, তারই নাম হচ্ছে 'ই'জাযুল কুরআন' বা কুরআনের আলংকারিক অসাধারণত্বের বিচার।

মুসলিম দার্শনিকরা এই 'মু'জিযা' শব্দের বিভিন্নরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন। তন্মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট সংজ্ঞা হচ্ছে এই যে, মু'জিযা (Miracle) চ্যালেঞ্জের সাথে সম্পর্কিত এমন একটা অনন্যসাধারণ ঘটনা, যার মুকাবিলায় কোনদিন কেউ দাঁড়াতে পারে না। মুহাম্মদ বিন আহমদ আল-কুরতুবী (মৃত্যু ৬৭১ হিঃ) তাঁর 'আল-জামে' লি আহকামিল কুরআন' নামীয় সুপ্রসিদ্ধ তাফসীরে মু'জিযার পাঁচটি সংজ্ঞা দিয়েছেন ঃ

১. মু'জিযা এমন কার্য বা ঘটনা, যা শুধুমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যাত কর্তৃকই সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর।

২. যা প্রকৃতির চিরন্তন নীতির বহির্ভূত।

৩. যে ভবিষ্যদ্বাণী সুধীবৃন্দের কাছে বোধগম্য।

৪. ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবেই সে কার্য বা ঘটনা সংঘটিত হবে অক্ষরে অক্ষরে।

৫. যে অনন্যসাধারণ ঘটনা বা অলৌকিক কীর্তি মানুষের নাগালের সম্পূর্ণ বাইরে।

এই তো গেলো আল্লামা কুরতুবীর কথা। আল্লামা মাহমুদ আলূসী, আবু বাকার বাকিল্লানী, ইমাম ফাখরুদ্দীন রাযী, আবু হাইয়ান তাওহিদী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী, ইবনু শিহাব খাফ্ফাজী, আবুল আব্বাস আল মুবাররাদ, নলডেক জার্মানী—এ'রা সবাই নিজ নিজ গ্রন্থসমূহে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ও মূল্যবান আলোচনা করে গেছেন। এছাড়া কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পুনঃ পুনঃ চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করাও হয়েছে কাফিরদের প্রতি।

নবী মুস্তফা (সঃ) তাঁর বিশ্ব-নবুওত এবং কুরআনের এই লা-জওয়াব চ্যালেঞ্জ নিয়ে সুদীর্ঘ ২৩ বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ভণ্ড নবী, জাল নবী বা ছায়া নবীরা কুরআনের এই জীবন্ত চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করার ধৃষ্টতা দেখিয়ে এর অনুরূপ কোন কিছু সৃষ্টি করতে প্রয়াস পেলে ইতিহাসে তার উল্লেখ অবশ্যই থাকত, কিন্তু ইতিহাস তাতে সম্পূর্ণ নীরব।

সে যুগটা আবার আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষের দিক দিয়ে চরম উন্নতির এমন এক পরম পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছিল যে, আরববাসীদের জন্য এ ধরনের চ্যালেঞ্জের জবাব দান যদি সম্ভবপর হতো, তবে তারা নিশ্চয় তা করতো।

ইসলামের ইতিহাস তথা ই'জায সম্পর্কীয় গ্রন্থমালার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, এই চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করার অপচেষ্টা তারা করেছিল বটে, কিন্তু তারা এ ব্যাপারে সফলকাম হতে পারে নি। তাদের মনগড়া নকল 'কুরআন' ছিল এতদূর অপকৃষ্ট ও নিম্নমানের যে, আসল কুরআনের সাথে তার কোনদিক দিয়েই কোনরূপ তুলনা হ'তে পারে না। তারা রসূলে আরাবীর সাথে প্রবল প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে তাঁর জীবদ্দশায় ও তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পর শুধু যে জাল 'কুরআন' সৃজন করেই ক্ষান্ত হয়েছিল তা নয়, বরং ইসলামের প্রতিকূলে ব্যাপক ইনকিলাব নিয়ে এসে একটা নতুন ধর্ম প্রবর্তনের স্বপ্নও তারা দেখেছিল।

এখন এই জাল নবীদের পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনাবলীর জন্য তাদের একটা ধারাবাহিক অথচ বিস্তৃত বিবরণের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ আসল কুরআন ও জাল কুরআন দুটোকে পাশাপাশি রেখে তুলনামূলকভাবে নিরপেক্ষ বিচার বিশ্লেষণ দ্বারাই আমরা বিলক্ষণ জানতে পারবো যে, এতদুভয়ের মধ্যে কতো আকাশ-পাতাল তফাৎ রয়েছে মূলগতভাবে।

জাল নবী

সম্প্রতি সাপ্তাহিক 'আরাফাতে' জাল নবী মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এবং তাকে যিনি পর্যুদস্ত করেছিলেন সেই মহামনীষী মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী সম্পর্কে সুচিন্তিত ও তথ্যবহুল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন বন্ধু প্রবর মাওলানা আবদুস সামাদ সাহেব এম. এম.। এছাড়া আরও পত্র-পত্রিকায় এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

বস্তুত, এই জাল নবীর উদ্ভব আজকের কোন নতুন ব্যাপার নয় বরং এই ভণ্ড নবীদের মিথ্যা দাবীর জের চলে আসছে স্বয়ং রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সোনালী যুগ থেকেই। নবী মুস্তফার জীবদ্দশায় এই জাল নবীরা নবুওতের দাবী-দাওয়া করার সঙ্গে সঙ্গে মেকী সুরা রচনার চেষ্টাও দেখিয়েছে। কিন্তু সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে আঁ-হযরতের শ্রেষ্ঠতম স্থায়ী মু'জিযা পবিত্র কুরআনের চিরন্তন চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করে তারা যে সব সুরা অথবা বাক্য রচনা করার ধৃষ্টতা দেখায় তা সুধীজনেরা হাস্যাস্পদ বলে সেকালেই উড়িয়ে দিয়েছেন। কারণ যেদিক নিয়েই ধরা যাক না কেন, উভয়ের মাঝে ছিল আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

নিম্নে জাল নবীদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হল :

১· আল্-আস্ওয়াদুল 'আন্সী

সে রসুলুল্লাহ (সঃ) জীবিত থাকাকালে আরবের ইয়ামান প্রদেশের প্রধান নগর 'সানআ' শহরের অধিবাসী ছিল। তার নাম ছিল আব্হালাক —আহসান 'আনী। মতান্তরে 'আব্হালাহ ; তার নাম 'আব্লাহও বলা হয়। সে যুল্খিমার বা 'অবগুণ্ঠনওয়ালা' নামেও পরিচিত হত। তার পিতার নাম ছিল কা'ব। ধনবল ও জনবল তার কম ছিল না। নিজের উপর ওহী

নাযিল হওয়ার দাবী করে সে জনমনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। আর এভাবে দুর্জের শক্তি ও প্রভূত প্রতিপত্তি অর্জন করে। ঐ সময়ে ইয়ামানের রাজধানী সান্আতে নবী (সঃ)-এর পক্ষ থেকে বাযান নামে একজন শাসনকর্তা ছিলেন। বাযানের মৃত্যু হলে আসওয়াদ আন্সী সানআ' আক্রমণ করে তা অধিকার করে বসে এবং বাযানের বিধবা স্ত্রী মারযুবানাকে বিয়ে করে। এই খবর মদীনায় পৌঁছলে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ফীরূয নামক একজন সাহাবীকে সান্আ' পাঠান। আসওয়াদের নব পরিণীতা স্ত্রী মারযুবানার সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করে ফীরূয আসওয়াদকে হত্যা করতে সক্ষম হন। [ফাতহুল বারী, অষ্টম খণ্ড; পৃষ্ঠা ৬৭।] মিরযবানাহ্ নাম্নী স্ত্রীর চাচাতো ভাই ফীরূয দায়লামী গভীর নিশিতে আসওয়াদের কক্ষে কৌশলে প্রবেশ করে তাকে হত্যা করেন। (তারীখে তাবারী ৩—২১৮; ফাতহুল বারী ৮ম খণ্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা।)

ভণ্ড আসওয়াদ তার অনুগামীদেরকে ভেল্কিবাজী ও যাদুবিদ্যার মাধ্যমে অলৌকিক কার্যকলাপ দেখাতো। তার সঙ্গে সব সময় অবস্থান করতো দু'টো শয়তান জিন। এদের একটির নাম ছিল 'সাহীক' আর অপরটির নাম ছিল 'সাকীক'। এরা সব সময় লোকদের অবস্থা সম্পর্কে তাকে ওয়াকিফহাল রাখতো। [আসওয়াদ 'আন্সী সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন ইবনুল আসীর: বিদায়া ওয়ান্ নিহায়া ৬—৩০৪ পৃষ্ঠা; সহীহ্ বুখারী ৫১১ পৃষ্ঠায়; এবং ৬২৮ পৃষ্ঠায় আল-আসওয়াদুল 'আন্সী সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীস রয়েছে। ঐ হাদীসগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ফাতহুল বারীতে যা বলা হয়েছে তাই এখানে উদ্ধৃত করা হল।]

২. ইবনু স ইয়াদ

ইবনু সাইয়াদ মদীনার একজন য়াহূদী সন্তান। কেউ কেউ তাকে ইবনু সায়েদ নামেও অভিহিত করেছে। তাকে তার মা 'সাফ' বলেও ডেকেছে বলে সহীহ্ মুসলিমে উল্লেখ পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) একদিন ইবনু সাইয়াদকে বলেন: "তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আমি আল্লাহর রসূল" এর জওয়াবে ইবনু সাইয়াদ বললো: আমি আপনাকে আরবের উম্মীদের

নবী বলে স্বীকার করি। পরক্ষণেই সে বলে যে, "আপনি কি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমি আল্লাহ্‌র রসূল ?" রসূলুল্লাহ (সঃ) তা' অস্বীকার করে বলেন : আমি আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর রসূলের প্রতি ও তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান এনেছি।

অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কি দেখো ?" সে জওয়াবে বলে "আমি উপরে আরশ্ দেখি।" রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তার ঐ জওয়াব সম্পর্কে মন্তব্য করেন; "তুমি যা দেখো তা' হচ্ছে সমুদ্রের উপর স্থাপিত ইবলিসের সিংহাসন।"

ইবনু সাইয়াদ গায়েবের জ্ঞান রাখে বলে দাবী করতো। তাই রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাকে বলেন, "দেখো, আমি আমার মনের মধ্যে তোমার পরীক্ষার জন্য একটি কথা গোপন রাখলাম। বল তো ঐ কথাটি কি ?" সে বললো : 'দুখ'। তাতে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন : লাঞ্ছিত হও, কাহিন বা গণকদের ভাগ্যে যা ঘটে থাকে তোমার ভাগ্যেও তাই ঘটবে। তুমি তোমার ঐ পরিণাম এড়াতে পারবে না। বলা বাহুল্য, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এই কথাটি মনে গোপন রেখেছিলেন, 'সেই দিনের অপেক্ষায় থাক যে দিন আকাশ প্রকাশ্য ধূম্র (দুখান) আনয়ন করবে', (সূরা আদ্-দুখান ঃ ১০)।

ইবনু সাইয়াদ তার শয়তানের সাহায্যে 'দুখান' স্থলে কেবলমাত্র 'দুখ' বলতে পেরেছিল—দুখান বলতে পারে নি। কেউ কেউ বলে থাকেন যে, মদীনাতে মুসলিম অবস্থায় ইবনু সাইয়াদের মৃত্যু হয়। কিন্তু ইমাম আবু দাউদ (ওফাত ঃ ২৭৫ হিজরী) তাঁর সুনান গ্রন্থে হযরত জাবির প্রমুখ রিওয়ায়ত করেন যে, হিজরী ৬ সনে ইবনু সাইয়াদ হাররার যুদ্ধে উধাও হয়ে যায়; মদীনায় তার মৃত্যু হয় নি।

ইবনু সাইয়াদ সম্পর্কে হযরত উমর (রাঃ) কসম করে বলতেন যে, সে-ই মাসীহ দাজ্জাল; অর্থাৎ সে-ই পরবর্তী যুগে মাসীহ দাজ্জাল নামে আত্মপ্রকাশ করবে। কিন্তু সে যে যথার্থই দাজ্জাল একথা ইয়াকীন করে বলা মুশকিল। কারণ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে কোন কিছু জানানো হয়নি। তাছাড়া মাসীহ দাজ্জাল সম্পর্কে

স্পষ্টভাবে বলা হয় যে, সে মক্কা ও মদীনার মাটিতে কোন দিনই পা দিতে পারবে না। অথচ ইবনু সাইয়াদ মদীনায় পয়দা হয়ে সেই মাটিতে প্রতিপালিত হয় এবং মুসলিম অবস্থায় মক্কা গিয়ে হজ্জক্রিয়া সমাপন করে। বস্তুত ইবনু সাইয়াদ সেই প্রতিশ্রুত মাসীহ দাজ্জাল নয়। তবে একথা সত্য যে, সে দাজ্জালদের মধ্যে একজন দাজ্জাল ছিল এবং নিজে দাজ্জাল নামে অভিহিত হতে কুণ্ঠিত ছিল না।

প্রশ্ন ওঠে, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যমানায় সে যখন নবুওতের দাবী করে এবং হযরত উমর (রাঃ) তাকে হত্যা করার জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট অনুমতিও চান তখন তিনি তাকে হত্যার আদেশ দেন নি কেন? এর জওয়াব এই যে, সে সময়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) য়াহুদীদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। কাজেই তাঁকে সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ক্ষান্ত থাকতে হয়েছিল।

৩. মুসায়লামা

ইতিহাসে সে 'মুসায়লামা আল-কায্যাব' বা 'অত্যন্ত মিথ্যাবাদী মুসায়লামা' নামে সুপরিচিত। মুসায়লামা ও তার গোত্রের বহু লোক মুসলিম হয়ে মদীনায় এসেছিল।

সহীহ বুখারীর চার স্থানে মুসায়লামার উল্লেখ পাওয়া যায়। ১। 'আলামাতুন নবুওত' অধ্যায়ের শেষের দিকে ৫১১ পৃষ্ঠায়; ২। অফদু বানী হানীফা অধ্যায়ে ৬২৮ পৃষ্ঠায়; ৩। 'কিস্সাতুল আসওয়াদিল 'আনসী' অধ্যায়ে ৬২৮--২৯ পৃষ্ঠায় এবং ৪। 'ইন্নামা আমরুনা লিশাইয়িন' অধ্যায়ে ১১১১ পৃষ্ঠায়। সহীহ বুখারীর উল্লিখিত হাদীসগুলোতে যে বিবরণ দেয়া হয়েছে তা এই—

রসূলুল্লাহ (সঃ) জীবিত থাকাকালে মুসায়লামা আল-কায্যাব ইসলাম ধর্ম কবুল করে তার গোত্রের বহু লোকসহ মদীনাতে একবার

এই সব বিবরণের জন্য দেখুন সহীহ মুসলিম, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৯৭—৯৮ পৃষ্ঠার হাদীসগুলো এবং সে সম্পর্কে ইমাম নাওয়াবীর।

আসে এবং হারিস-তনয়ার (বিনতুল হারিসের) বাড়ীতে অবস্থান করে। এই হারিসের এক কন্যাকে মুসায়লামা বিবাহ করেছিল। পরবর্তীকালে য়ামামার যুদ্ধে মুসায়লামা নিহত হলে তার ঐ স্ত্রীর বিয়ে হয় হারিসের এক ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল্লাহ ইবনু 'আমিরের সাথে।

মুসায়লামার মদীনা আগমনের সংবাদ পেয়ে নবী করীম (সঃ) তার নিকট যান। ঐ সময় নবী (সঃ)-এর হাতে খেজুর গাছের শাখার একটি ছড়ি ছিল এবং তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন আনসারের বিশিষ্ট বক্তা সাবিত ইবনু কাইস ইবনু শাম্মাস। এই সাবিতকে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর 'খাতীব' বলা হত।

অনন্তর রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাথে কথাবার্তা প্রসঙ্গে মুসায়লামা বলে, "আমি এই শর্তে আপনার অনুসরণ করতে রাযী আছি যে, "আপনার পরে মুসলিমদের উপর সর্বময় ক্ষমতা ও প্রভুত্ব আমার হবে।" তাতে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, "তুমি যদি আমার নিকট এই খেজুর শাখার টুকরাটি চাও তাও আমি তোমাকে দেব না। তুমি যদি আমার বিরোধিতা কর তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে নিশ্চয় ধ্বংস করবেন এবং তোমার জন্য আল্লাহ্র যে শাস্তি নির্ধারিত হয়ে রয়েছে তা তুমি কিছুতেই এড়াতে পারবে না।" তারপর তিনি আরও বলেন, "এই সাবিত থাকলো। সে তোমার সকল প্রশ্নের যথাযোগ্য জওয়াব দেবে।" এই বলে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সেখান থেকে প্রস্থান করেন।

সহীহ্ বুখারীর শারাহ ফাতহুল বারী

উল্লিখিত চারটি হাদীসের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হাদীস দুটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ফাতহুল বারী অষ্টম খণ্ডের ৬৪ ও ৬৬ পৃষ্ঠায় ভাষ্যকার নিম্ন-বর্ণিত তথ্যগুলো পরিবেশন করেন :

(ক) মুসায়লামার কুলপঞ্জী : মুসায়লামা ইবনু সুমামাহ ইবনু কাবীর ইবনু হাবীব ইবনুল হারিস—বনু হানীফা বংশোদ্ভূত ও বনু হানীফা গোত্রের সরদার ও নেতা—মক্কা ও ইয়ামানের মাঝে অবস্থিত আল-ইয়ামামা

অঞ্চলের অধিবাসী। তাহার উপনাম ছিল আবু সুমামাহ। নিজ গোত্রের লোকদের উপর মুসায়লামার এত অধিক প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল যে, তারা তাকে 'আল-ইয়ামামার রাহমান' উপাধিতে বিভূষিত করে।

(খ) হারিস ইবনু কুরাইযের যে কন্যার সঙ্গে মুসায়লামার বিয়ে হয় তার নাম ছিল 'কাইয়িসাহ'। আর মুসায়লামা মদীনা এসে হারিসের যে কন্যার বাড়ীতে অবস্থান করে, তার নাম ছিল 'রামলাহ'। মুসায়লামা যখন মদীনা এসেছিল তখন তার স্ত্রী কাইয়িসাহ মুসায়লামার দেশের বাড়ীতে ছিল।

(গ) মুসায়লামা হিজরী দশম বর্ষে নুবুওতের দাবী করেছিল।

মদীনা থেকে দেশে ফিরে গিয়ে মুসায়লামা নিজেকে নবী বলে ঘোষণা করে এবং কুরআনের অনুকরণে বাক্য রচনা শুরু করে দেয়।

যা-ই হোক নুবুওতের মিথ্যা দাবী করে কেউ যদি কুরআনের ন্যায় মু'জিযা দেখাতে পারতো তাহলে তো হক নবী ও ভূয়া নবীর মধ্যে পার্থক্য করাই মুশকিল হয়ে দাঁড়াতো। তাই মুসায়লামা যখন পবিত্র কুরআনের অনুকরণে বাক্য রচনা করে জনসমাজে প্রকাশ করল, তখন আসল থেকে নকল মূর্ত হয়ে দেখা দিল। সুধী সমাজ তো দূরের কথা, অশিক্ষিত জনসাধারণও এতদুভয়ের মাঝে রচনাগত মৌলিক পার্থক্য অনায়াসে অনুধাবন করতে সক্ষম হল। সুতরাং এই জাল নবীরা তাদের রচনা দ্বারা আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকলেও সুধী সমাজের কাছে তাদের এই অপচেষ্টা কাকের ময়ূর নাচের মতই প্রতীয়মান হয়েছিল।

নিম্নের কতিপয় উদ্ধৃতি থেকেই তার রচনার কদর্যতা ও নিম্নমানের ভাবধারার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে।

১. সূরা কাউসারের মুকাবিলায় মুসায়লামা রচনা করল :

انا اعطيناك الجماهر - فصل لربك وجاهر - ان شانئك

هو الابلق -

নিশ্চয়ই আমি তোমাকে আকআক পাখী দান করেছি। অতএব আপন প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায পড় ও চিৎকার ধ্বনি কর। নিশ্চয়ই তোমার শত্রু কৃষ্ণকায়।

২. সূরাতুল বুরুজের প্রথম আয়াত :

والسماء ذات البروج -

'রাশি শ্রেণীযুক্ত আসমানের কসম' এর সাথে জুড়ে দিল—

والنساء ذات الفروج -

আর যোনিবিশিষ্ট রমণীদের কসম ইত্যাদি।

ভণ্ড মুসায়লামার অনুগামীরা তাকে মিথ্যা বলেই জানতো। এতদসত্ত্বেও নিছক একটা দলগত ব্যাপারে নিয়ে তারা তার আনুগত্য স্বীকার করেছিল। তাদের একমাত্র জেদ ছিল যে, নিজস্ব পার্টি যেন বলবৎ থাকে। তারা স্পষ্ট-ভাবে বলতো :

كذاب ربيعة احب الينا من صادق مضر -

মুযার বংশের সত্যবাদী নবীর [অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর] চেয়ে রাবীআ বংশের মিথ্যাবাদী নবী (মুসায়লামা) আমাদের নিকট অধিকতর প্রিয়।

এই তো গেল তার অনুসারীদের কথা। মুসায়লামার নিজেরও আস্থা ছিল না তার নবুওতের প্রতি। তাই নিজস্ব মুয়াযযিনের কণ্ঠে একদিন সন্দেহাত্মক বাক্যে আযানের সুরধ্বনি শুনে সে বলে উঠলো—

افصح يا حجير فما فى الهجمجة من خير -

হে হুজাইর, এ ধরনের গোলমেলে কথায় কোন কাজ নেই, তাই আযানে তুমি স্পষ্টভাবেই বলে ফেলো যে, আমি আল্লাহর রসূল।

কতকগুলো বাক্য রচনা করে সেগুলোকে সে আল্লাহর বাণী বলে প্রচার করতে শুরু করে। মুসায়লামা ছিল অত্যন্ত সুবক্তা এবং সেই সঙ্গে

ধুরন্ধর ও সুচতুর। তার রচিত মেকী বাণীগুলোর নমুনা পরে দেওয়া হচ্ছে।

যা-ই হোক, হিজরী দশম বর্ষে নবুওতের দাবি জানিয়ে মুসায়লামা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট পত্র দেয়। ঐ পত্রে লেখা ছিল :

من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله - سلام عليك
اما بعد - فانى قد اشركت فى الامر وانا لنا نصف الارض
ولقريش نصف الارض ولكن قريشا قوم يعتدون -

আল্লাহর রসূল মুসায়লামার পক্ষ থেকে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র প্রতি আপনার প্রতি অবতীর্ণ হোক শান্তি। অতঃপর জানাই যে, আমি নবুওতের ব্যাপারে আপনার শরীক। আমি আরও জানাই যে, আমাদের জন্য অর্ধেক পৃথিবী আর কুরায়শদের জন্য বাকী অর্ধেক। কিন্তু এই কুরায়শেরা এমন একটি কাওম যারা সীমা লঙ্ঘন করে।

(২য় খণ্ড, সীরাতে ইবনু হিশাম)

রসূলুল্লাহ্ (সঃ) উক্ত পত্রের জওয়াবে লিখেন :

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه
وسلم الى مسيلمة الكذاب السلام على من اتبع الهدى
اما بعد فان الارض لله يورثها من عباده من يشاء والعاقبة
للمتقين -

অসীম দয়াবান মহান দাতা আল্লাহ্‌র নামে—আল্লাহ্‌র রসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে মুসায়লামা মিথ্যুকের প্রতি। যে কেউ ন্যায়ের অনুসরণ করে তার প্রতি হোক অনাবিল শান্তি। অতঃপর জানাই যে, নিশ্চয় এই পৃথিবী আল্লাহ্‌র অধিকারে রয়েছে। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান, এর উত্তরাধিকারী করেন। আর পরকালের মঙ্গল সৎকর্মশীলদের জন্যই।

(সীরাতে ইবনে হিশাম : ২য় খণ্ড)

কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐ পত্র পেয়েও তার চৈতন্যোদয় হল না। নবুওতের নেশা তাকে পেয়ে বসল। তাই সে পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি করে ওহী নামে চালাতে লাগল।

আল্লামা ইবনুল আসীর বলেনঃ নাহারুর রিজ্জাল নামক এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে বেশ কিছু দিন অবস্থান করে কুরআন তিলাওয়াত ও ইসলামের সনাতন শিক্ষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি হাসিল করেছিল। মুসায়লামাকে জব্দ করার জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে য়ামামা পাঠালেন। কিন্তু সে ছিল মুসায়লামার চেয়েও বড় ধূর্ত। তাই মুসায়লামার ক্রমবর্ধমান শক্তি ও মর্যাদা এবং তার ভক্ত ও অনুসারীদের বিপুল সংখ্যা দেখে সে তার দলে ভিড়ে গেল। এইভাবে সে মুসায়লামার শক্তি বর্ধনেই সহায়তা করল।

দ্বাদশ হিজরীতে হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদের নেতৃত্বে ইয়ামামার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে এই ভন্ড নবী নিহত হয়। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দার হাবশী ক্রীতদাস ওয়াহশী ছোট হাত বর্শা নিক্ষেপ করে ভুয়া নবীর বক্ষদেশ ভেদ করে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলে। আর সঙ্গে সঙ্গে একজন আনসারী তার মাথায় তরবারীর আঘাত করে তার নুবুওতের সাধ জনমের মত মিটিয়ে দেন। (সহীহ্ বুখারী : পৃষ্ঠা ৫৮৩)

আল্লাহ্ তা'আলার কী অপার মহিমা! যে ওয়াহশীর হাতে মহাবীর হামযা (রাঃ) শাহাদত বরণ করেছিলেন, সেই ওয়াহশীই মুসলমান হয়ে ইসলামের পরম বৈরী মুসায়লামার ঘাতক সেজে আত্মকৃত অপরাধের কাফ্ফারা আদায় করল।

এমনিভাবে অতি জঘন্যরূপে মুসায়লামার জীবন অবসান ঘটল, কিন্তু সে যে কুপ্রথার বিষ বিস্তার করে গেলো তার জের এখন পর্যন্তও মিটল না এবং প্রায় সবখানে জাল নুবুওতের একটা ব্যাপক হিড়িক পড়ে গেল।

৪. সাজাহ বিনতু সুআইদ

এই রমণী ইরাক সীমান্তের অধিবাসী তামীম গোত্র-উদ্ভূত ছিল। সে ছিল অত্যন্ত ধূর্ত ও বিলাসপ্রিয়। এই গোত্রটির সন্নিহিত অঞ্চলে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী বনু তাগলিব গোত্র বাস করত। রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর ওফাতের পরে আরবে যে বিদ্রোহ দেখা দেয় তার সুযোগ গ্রহণ করে এই রমণী নুবুওতের দাবী

করে বসে এবং অল্পকালের মধ্যে সে বনু তামিম, বনু তাগলিব, হুযাইল প্রভৃতি গোত্রের লোকদেরকে নিজের বশীভূত করে ফেলে। মদীনা দখল করে মদীনাকে তার প্রচারকেন্দ্র করার মানসে সে মদীনা আক্রমণে বের হয়। পথিমধ্যে বহু সাহাবী তার গতিরোধ করে। অগ্রগতি অসম্ভব দেখে সে গভীর স্বরে ওহীর ভান করে বলল:

عليكم باليمامة ودفوا دفيف الحمامة فانها غزوة صرامة لا يلحقكم بعدها ملامة ـ

য়ামামাহ অভিমুখে অগ্রসর হও, পায়রার ন্যায় দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়, কারণ ওটাই হবে চূড়ান্ত সংগ্রাম যার পরে আর কোন অনুশোচনার কারণ থাকবে না।

নবীর উপর ওহী নাযিল হয়ে গেছে। এখন আর যায় কোথায়? তাই তার অনুসারীরা য়ামামার পথ ধরলো। এদিকে মুসায়লামা কাযযাব সাজাহ য়ামামা আক্রমণ করতে আসছে জানতে পেরে প্রমাদ গণলো। বনু হানীফার সমস্ত লোক তার পিছনে থাকা সত্ত্বেও সাজাহের অগণিত সৈন্যের সঙ্গে সে মুকাবিলা করতে সাহস করলো না। আর সে ছিল অতি মাত্রায় চালাক। তাই সে কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করলো এবং একটা সন্ধি-সমঝোতার বার্তাসহ সাজাহের কাছে দূত পাঠালো। দূতের সঙ্গে সে মহামূল্যবান উপঢৌকনও পাঠালো এবং একান্ত নম্রভাবে একথাও বলে পাঠালো: রসূলুল্লাহ্‌র জীবদ্দশায় আমি তাঁর জন্য অর্ধেক রাজত্ব ছেড়ে দিয়েছিলাম। আর বাকি অর্ধেক আমার নিজের জন্য রেখেছিলাম। এখন তাঁর ওফাতের পর আমিই সমস্ত আরব রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি। তাই এখন তোমাকে বাকী অর্ধেকটা দিতে চাই। কারণ তোমার নুবুওত আমি মনে প্রাণে স্বীকার করি। অতএব নিভৃতে তুমি আমার শিবিরে এসে দেখা কর। আমরা উভয়ে মিলে পয়গাম্বরী ও রাজত্ব ভাগ করে নেবো। আর মদীনা আক্রমণ সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব।

সাজাহ এ প্রস্তাবে সম্মতি জানালো। এদিকে মুসায়লামা সাজাহের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য একটি বিশেষ তাঁবু খাটালো এবং তাতে যত পারলো

বিলাস-ব্যসনের বিভিন্ন সামগ্রী আতর, গোলাপ ও নির্যাস সংগ্রহ করে সমগ্র পরিবেশকে সুদৃশ্য, সুশোভিত ও সুরভিত করে তুললো। মনে হলো যেন আবেগ ভরা দুটি প্রাণের মধুর মিলনের আয়োজন করা হয়েছে। পরিবেশ এমন ছিল যে, তাতে মানুষের কামোন্মাদনা জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক।

তারপর তারা যখন উভয়ে মিলিত হলো তখন মুসায়লামা সাজাহের কাছ থেকে জানতে চাইলো যে, তার প্রতি কোন্ ধরনের ওহী নাযিল হয়ে থাকে। সাজাহ জওয়াব দিল : আপনিই আগে বলুন। মুসায়লামা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে ভেবে যৌন আবেদনমূলক বাণী তাকে শোনাল। সে বললো, আমার নিকট এই ধরনের ওহী আসে, যথা :

الم تر الى ربك كيف فعل بالحبلى اخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى —

তুমি কি দেখ নাই যে, তোমার পালনকর্তা গর্ভধারিণী নারীর সাথে কি আচরণ করলেন? তিনি নারীর জরায়ু ও অন্ত্র থেকে এমন একটি জীবন্ত প্রাণ বের করলেন যা দ্রুতবেগে চলাফিরা করতে থাকে।

ভন্ড নবীর মুখ থেকে এই কৃত্রিম ওয়াহীর কথা শুনে সাজাহের কাম প্রবৃত্তিতে আগুন লাগল। আবেগ ভরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বলে উঠল : আর কি কি ওহী আসে বলুন তো? মুসায়লামা বলে চললো :

ان الله خلق للنساء افراجا وجعل الرجال لهن ازواجا فيولج فيهن ايلاجا ثم تخرجها اذا تشاء اخراجا —

নিশ্চয়ই আল্লাহ নারীদের জন্য যোনী পয়দা করলেন এবং পুরুষদেরকে তাদের জীবন-সঙ্গী করলেন। অনন্তর পুরুষরা নারীদের মধ্যে পূর্ণরূপে প্রবেশ করায় এবং নারীরা যখন চায় বের করে নেয়।

কামাতুরা সাজাহ অত্যন্ত আত্মহারা ও অভিভূত হয়ে পড়লো। সুচতুর মুসায়লামা সুযোগ বুঝে প্রস্তাব দিল উভয়ের নবুওতকে একত্রিত ও

শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে উভয়ে দাম্পত্য সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার জন্য। সাজাহ সানন্দে এ প্রস্তাব গ্রহণ করে তাকে স্বামীত্বে বরণ করলো। এর পর তিন দিন তিন রাত তারা একত্রে অতিবাহিত করলো। তাদের এই বিয়ের মোহর হল তাদের উভয়ের অনুগামী বা উম্মতের জন্য এশা ও ফজরের নামায মাফ। (ফুতুহুল বুলদান; বালাযুরী, মিসর ছাপা: ১০৮ পৃষ্ঠা)

চতুর্থ দিনে মুসায়লামার কাছ থেকে অর্ধেক রাজত্বের প্রতিশ্রুতি নিয়ে সাজাহ নিজ তাবুতে ফিরে এলো এবং খুশী মনে শুভ পরিণয়ের বার্তাও প্রচার করলো। কিন্তু তার ভক্ত, অনুগামী ও প্রতিনিধিদের অনেকেই এটাকে খুশির পয়গাম বলে গ্রহণ করতে পারে নি। তাই তাদের প্রধান নেতা ও তায়িদ একান্ত অনুযোগের সুরে আবৃত্তি করলো:

امست نبيتنا انثى نطوف بها
واصبحت انبياء الناس ذكرانا -

এর চাইতে আর চরম নির্বুদ্ধিতা কি হতে পারে যে, সকল লোকের নবী হচ্ছেন পুরুষ আর আমরা একজন অবলা নারীকে নবুওতের বেদীতে অধিষ্ঠিত করে তার পেছনে পেছনে অযথা ঘুরে মরছি।

فلعنة الله على الاقوام كلهم
تبلى شجاح ومن بذاك اغرانا -

আল্লাহ্‌র এবং সমস্ত কওমের লা'নত হোক সেই সাজাহ্‌র প্রতি, কেননা সে মিথ্যা ও শঠতার দ্বারা আমাদের ভিতর প্রচারিত করেছে।

تبنى مسيلمة الكذاب لا سقيت
اصدائه ماء المزن اينما كانا -

মিথ্যুক মুসায়লামাও নুবুওতের দাবী করেছে। বর্ষার ধারা কোন দিনই যেন তার পিপাসা দূর না করে, সে যেখানে থাক না কেন।

অবশেষে সাজাহের ভক্ত শিষ্যরা সভাই একদিন সম্বিৎ ফিরে পেলো। এতদিন ধরে যে ভুল তাঁরা করে আসছে তা তারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলো। তাই তারা শেষ পর্যন্ত এই আলেয়ার পেছন থেকে সরে দাঁড়ালো। তদুপরি মুসায়লামার পতনে সাজাহ একেবারে অসহায় হয়ে পড়লো।

নিজের দুরবস্থার কথা চিন্তা করে সাজাহ তার মাতুলালয় বনু তাগলিবে গিয়ে আশ্রয় নিল এবং কিছু দিন পর সুবুদ্ধির উদ্রেক হলে আবার ইসলামে দীক্ষা লাভ করে অনাবিল সুখ শান্তির নীড় খুঁজে পেল। তারপর সে বহুদিন বেঁচে থাকে। হযরত মু'আবিয়ার খিলাফতকালে তাঁর ইন্তেকাল হয়।

স্থিরচিত্তে চিন্তা করলে আমাদের আশ্চর্য হতে হয় যে, এই ভুয়া নবীরা তাদের মনগড়া যে সমস্ত ওহী বা আয়াতের ভাওতা দেখিয়ে জনতাকে বশীভূত করতো, সেগুলো এত অকথ্য, অশ্লীল এবং নিরর্থক হওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণ কি করে সে দিকে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হতো? এর পেছনে কি কোন অদৃশ্য শক্তি নিহিত ছিল? চিন্তা করলে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আরবীয় জনসাধারণকে ইসলামের বিরুদ্ধে উস্কানী দেবার জন্য রোমীয় ও ইরানীদের অবিরাম প্ররোচনাই হচ্ছে এর অন্যতম অদৃশ্য কারণ।

ইমাম বুখারী হযরত আবু হুরায়রা প্রমুখ বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সঃ) একদিন জীবিতাবস্থায় স্বপ্নে দেখলেন, তাঁকে পৃথিবীর ধনভান্ডার দান করা হয়েছে এবং তাঁর দু'হাতে দুটো সোনার কাঁকন বা বলয়। এ দেখে তিনি মহাচিন্তায় পড়লেন, কারণ সোনারূপা তো তাঁর কাম্যনীয় বস্তু ছিল না। তাই স্বপ্নের মধ্যেই তাঁকে ফুঁক দিতে বলা হল। অনন্তর তিনি ফুৎকার দিয়ে বলয় জোড়াকে ভেঙ্গে ফেললেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই স্বপ্নের তাৎপর্য প্রসংগে বলেন: বলয় দুটো হচ্ছে সান'আ' ও ইয়ামামার দুই ভন্ড নবী—আসওয়াদ 'আনসী এবং মুসায়লামা কায্যাব (সহীহ্ বুখারী)। স্বপ্নের ইংগিত এই ছিল যে, দু'জনই অচিরে নিহত হবে। নবী-রসূলদের স্বপ্ন ওহীর মতোই বাস্তব সত্য এবং দিব্যালোকের

স্যার সুস্পষ্ট। পরবর্তীকালে এই ভন্ড নবীদ্বয়ের নিধনপ্রাপ্তি ছিল রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সেই স্বপ্নেরই বাস্তব রূপ।

মুস্তাফা সাদিক আর্‌রাফেয়ী তাঁর 'ই'জাযুল কুরআন' নামক অমর গ্রন্থে এই মুসায়লামা কায্‌যাব এবং অন্যান্য জাল নবীদের তৈরী করা মেকী আয়াতগুলোর উদ্ধৃতি দিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, এগুলোর মাঝে ঐশী প্রেরণার লেশমাত্রও ছোঁয়াচ নেই। তাছাড়া পবিত্র কুরআন তার সাহিত্যিক মর্যাদা ও উৎকর্ষ দ্বারা সেই মেকী আয়াতগুলোকে এমনভাবে প্রতিহত ও পর্যুদস্ত করেছে যে, তখন থেকে আজ পর্যন্ত সেগুলো একদিনের তরেও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে নি। সুতরাং রসূলে আকরাম (সঃ)-এর সাথে এই সাহিত্যিক প্রতিযোগিতায় ভীষণভাবে পরাজিত হয়ে এর দারুণ গ্লানিকে নিবারণ ও একটুখানি প্রশমিত করণার্থেই তারা তরবারীর আশ্রয় নিয়েছিল। শুধু তাই নয়, তাঁকে এই ধরাপৃষ্ঠ থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তারা অত্যন্ত হীন ও গোপন ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে রেখেছিল।

উভয় পক্ষের এই শাব্দিক প্রতিযোগিতার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় আল্‌-জাহিয কৃত পুস্তকে।[১]

৫. তুলাইহা ইব্‌নু খুওয়ায়লিদ

আর একজন ভন্ড নবী, যিনি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর যুগে নুবুওতের দাবী নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে মুসলিম জগতে বিভ্রাট বাঁধাবার প্রয়াস পান এবং পরে ইসলামের জন্যই অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দেন। তিনি হচ্ছেন মদীনার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত বনু আ'সাদ গোত্রের প্রধান নেতা তুলাইহা ইব্‌নু খুওয়ায়লিদ। তিনি তাঁর ভক্তবৃন্দের জন্য কুরআন মজীদের

১. দেখুন দালাইলুল ইজায, আবদুল কাহির জুরজানী: পৃষ্ঠা, ২১৮, আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী কৃত 'আল ইত্‌কান': ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২০০।

আয়াতগুলোর অনুকরণে কতিপয় শ্লোক রচনা করে সেগুলো আল্লাহর কাছ থেকে অবতীর্ণ ওহী বলে প্রচার করেন। এই মেকী আয়াতগুলোর বিন্যাস ও ছন্দের প্রতি একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও সুস্থির মস্তিষ্ক নিয়ে পর্যবেক্ষণ করলেই অতি সহজে তার মিথ্যা প্রতারণা ধরা পড়তো। কিন্তু তার ভক্ত শিষ্যরা ছিল এতদূর অন্ধবিশ্বাসী যে, তারা সত্য-মিথ্যা যাচাই করার কথা ভুলেও মনে আনত না। বনু আসাদ ছাড়া গাত্‌ফান ও ত্বাই গোত্রের বহু লোকও তুলাইহার ভক্ত হয়ে পড়ে।

তুলাইহার অভ্যুত্থান হয়েছিল রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর জীবদ্দশায়। তার শাস্তি বিধানের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সঃ) যারার নামক বীরকে সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। তাঁর আগমনবার্তা শুনে তুলাইহা 'সামীরা' অভিমুখে যাত্রা করতে মনস্থ করেন। ইত্যবসরে জনৈক মুসলিম তুলাইহার ছাউনীতে ঢুকে তলওয়ারের আঘাত করেন। ঘটনাচক্রে তলওয়ার তাঁর গর্দানে না পড়ে ক্যাম্পের খুঁটির উপর গিয়ে পড়ে। এই আকস্মিক বেঁচে যাওয়ার ব্যাপারকে ভক্তরা জাল নবীর অলৌকিক ঘটনা হিসেবে ধরে নিল আর ভাবলো তলওয়ারের চোটও আমাদের নবীর উপর কোন আছর করতে পারে না।

রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর তুলাইহার সাহস ও শক্তি আরও বেড়ে যায়। বানু আসাদ, বনু গাতফান ও বনু ত্বাই পূর্বেই এই ভুয়া নবীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। এখন 'আবাস ও যুবয়ান গোত্রও তাদের সাথে মিলিত হল। অনন্তর সকলে মিলে যাকাত মওকুফের জন্য আবু বকরের নিকট প্রতিনিধি পাঠালো।

একবার তুলাইহা তাঁর শিষ্য-সামন্তসহ জনপ্রাণীহীন কোন মরুভূমি অতিক্রম করে কোথাও যাচ্ছিল। পথিমধ্যে পিপাসায় অনুগামীদের কণ্ঠতালু পর্যন্ত শুকিয়ে এল। অথচ নিকটে পানির কোন নাম-নিশানাও নেই। তুলাইহা এই পথের বহু পুরানো পথিক। তাই আশেপাশের জলাশয় ও মরূদ্যান সম্পর্কে তার ভালোভাবে জানা-শোনা ছিল। তাই কণ্ঠস্বরকে ঈষৎ গম্ভীর করে সে নির্দেশ দিল ঃ অদূরে অমুক জায়গায় তোমাদের জন্য

মিঠা পানি অপেক্ষা করছে। সেখান থেকে তোমরা ইচ্ছামত প্রাণভরে পানি পান কর আর সঙ্গেও কিছু নিয়ে এসো।

শিষ্যেরা জীবনের আশা একরূপ ছেড়েই দিয়েছিল। এক্ষণে পানি ও জীবন ফিরে পেয়ে তুলাইহার প্রতি বিশ্বাস আরও দৃঢ়ভাবে শিকর গেড়ে বসলো। এতে করে তার প্রভাব আরো বর্ধিত হয়ে গেল। কিন্তু তাহলে কি হবে? মিথ্যার বিনাশ যে অবশ্যম্ভাবী।

অবশেষে প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ) হিজরী ১১ সনে খালিদ বিন ওয়ালীদকে তুলাইহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। 'আদী ইবনু হাতিম খালিদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন এবং প্রাণপণ চেষ্টা করে 'আদী তাঁর স্বগোত্রীয় বনু ত্বাইকে তুলাইহা হতে বিচ্ছিন্ন করেন। অনন্তর বাযাখাহ্ নামক স্থানে খালিদ ও তুলাইহার মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধকালেও সে ভণ্ডামী হতে নিরস্ত হয়নি। বরং তখনও সে গায়েবী খবর লাভের ভান করে এক নিভৃত নিরাপদ তাঁবুতে কৃত্রিম ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসে থাকে। তুলাইহার প্রধান সেনাপতি উয়াইনাহ উৎকণ্ঠিত হয়ে তাকে বারবার জিজ্ঞেস করতে থাকে, ফিরিশ্তা জিব্রীলের কাছ থেকে কোন নতুন খবর এলো কি? তুলাইহা কয়েকবার মাথা নেড়ে না-সূচক জওয়াব দেওয়ার পরে বললো: হ্যাঁ, এবার আমার কাছে এই মর্মে ওহী এসেছে যে, "তোমাদের যেমন যাঁতাকল আছে, মুসলিমদেরও ঠিক তেমনি রয়েছে পেষণযন্ত্র। আরও এমন ব্যাপার রয়েছে যা তোমরা ভুলতে পারবে না।"

এই ওহী শুনে উয়াইনার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তাই সে বজ্রের মত গর্জে উঠে বললো: ওহে বাণী ফাযারাহ! নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, তুলাইহা আসলে কোন নবী নয়। সে পুরাপুরি মিথ্যুক ও ধাপ্পাবাজ। এখন তোমরা রণে ভঙ্গ দিয়ে যেভাবে পার প্রাণ বাঁচাও।"

এদিকে তুলাইহা তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সিরিয়া অভিমুখে পলায়ন করলো। বনু ত্বাই গোত্রের লোকেরা এর আগেই তুলাইহাকে পরিত্যাগ করেছিল। এখন তুলাইহার স্বগোত্রীয় বনু আসাদ' এবং প্রতিবেশী বনু গাতফান গোত্রদ্বয়ের লোকেরাও তাকে পরিত্যাগ করে বসলো এবং তারা

সকলেই পুনঃ ইসলামের ছায়াতলে ফিরে এলো। কিছুকাল পরে তুলা-ইহাও ইসলামে দাখিল হলো। পরে হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে তুলাইহা কাদিসিয়ার রক্তক্ষয়ী রণপ্রান্তরে অপূর্ব বীরত্ব ও যুদ্ধ কৌশল প্রদর্শন করেছিলেন।

ভণ্ড নবী উদ্ভবের মূল কারণ

প্রাক-ইসলামী জাহেলী যুগে গণৎকার, যাদুকর প্রভৃতি যারা ভবিষ্যতের জ্ঞানের দাবী করতো, তারা ছন্দবদ্ধ বাক্য রচনা করে জনসাধারণকে বিস্ময় বিমুগ্ধ করতো। এই কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সঃ) যখন কুরআনের বাণী প্রচার করতে আরম্ভ করেন তখন আরবের লোকেরা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কেও গণৎকার যাদুকর ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত করতো। কিন্তু কুরআনের অনুরূপ উচ্চাঙ্গের বাণী রচনা করে কুরআনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে অপারগ হয়ে শেষ পর্যন্ত তারা কুরআন মজীদকে আল্লাহ্‌র অমিয় বাণী এবং উহাকে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর এক অমর মু'জিযা' বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয় কিন্তু জাহেলী যুগের অহমিকা, অহংকার ও গর্বে অন্ধ হয়ে কতিপয় স্বার্থান্বেষী আরব দলপতি ইসলামের যুগান্তকারী বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে প্রশান্ত চিত্তে মেনে নিতে পারেনি। অথচ তাদের নিকট নবুওত ব্যাপারটা বিশেষ সম্মানজনক ও লাভজনক ব্যাপার বলে প্রতিভাত হয়। তাই তাদের অনেকে নিজ স্বার্থসিদ্ধির মতলবে আরব জনসাধারণের কাছে নানা রঙীন ওয়াদার ফানুস উড়িয়ে তাদের নিজ ভক্ত দলে আনার চেষ্টা করে এবং কুরআনের অনুকরণে অর্থহীন বাগাড়ম্বর বাণী রচনা করে লোককে বিভ্রান্ত করতে থাকে। এটাই হচ্ছে ভণ্ড নবী উদ্ভবের মূল কারণ। এই জাল নবীদের ফিতনা ও তাদের মায়াজালে যারা আবদ্ধ হয়নি তাদের প্রতি লোমহর্ষক উৎপীড়ন এতদূর ব্যাপক হয়ে পড়েছিল যে, সেই নিপীড়িত জনতার অসহায় অবস্থার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে আবদুল কায়স গোত্রের উদীয়মান কবি আবদুল্লাহ বিন হযফ আবৃত্তি করেছেন ঃ

الا ابلغ ابا بكر رسولا - وفتيان والمدينة اجمعينا

فهل لكم الى قوم كرام - قعودا فى جواثا محصرين -

হে শ্রোতা, খলীফা আবূবকর (রাঃ)-এর কাছে আমাদের পয়গাম পেঁছে দাও, আর মদীনায় তাইয়্যিবার যুবকবৃন্দকেও জানিয়ে দাও যে, যারা সেই সুদূর 'জাওয়াসা' নামক স্থানে অবরুদ্ধ হয়ে একান্ত অবহেলিত ও অসহায় হালতে অবস্থান করছে, তাদের ন্যায় সম্ভ্রান্ত কওমকে সহায়তা করার জন্য তোমাদের কি এতটুকুও বাসনা বা আগ্রহ হয় না ? [১]

সুখের বিষয় যে, হযরত আবূ বকর (রাঃ) হিমাদ্রির মত অচল অনড় থেকে এই ভণ্ড নবীদেরকে এমন উচিত শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, তাদের নবুওতের স্বপ্ন-সাধ চিরতরে মিটে গেল। এভাবেই হযরত আবূ বকর (রাঃ) আরব উপদ্বীপে ইসলামের অখণ্ডতা বজায় রাখতে এবং তার লুপ্ত অস্তিত্ব ও আধিপত্যকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে পূর্ণমাত্রায় সক্ষম হয়েছিলেন। আরব সন্তানরা তাই ইসলামের সঞ্জীবনী পিযূষ ধারায় স্নাত, শুদ্ধ ও পরিপ্লুত হয়ে তাঁর নতুন আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে আবার দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভণ্ড নবীদের উদ্ভব সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) যে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন এখানে তা বর্ণনা করা হচ্ছে।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, "কিয়ামত ঘটবে না যে পর্যন্ত দুটি বিরাট দল পরস্পর যুদ্ধ না করবে—তাদের মধ্যে বহু নর-হত্যা না হবে, অথচ উভয় দলের দাবী একই হবে এবং যে পর্যন্ত প্রায় ত্রিশজন ঘোর মিথ্যুক, চরম প্রতারকের উদ্ভব না হবে, যাদের প্রত্যেকেই দাবী করবে যে নিশ্চয় সে আল্লাহ্র রসূল।" (সহীহ্ বুখারী ঃ পৃষ্ঠা ১০৫৪)

সাওবান (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, "আর আমার উম্মতের মধ্যে শীঘ্রই ত্রিশজন ঘোর মিথ্যাবাদী হবে—তাদের প্রত্যেকেই দাবী করবে যে, নিশ্চয় সে নবী। অথচ আমিই নবীদের মধ্যে শেষজন, আমার পরে কোন নবী নাই।" (তিরমিযী ঃ ফিতান অধ্যায়সমূহ)

উল্লিখিত হাদীস দুটির একটিতে নির্দিষ্ট করে 'ত্রিশজন' এবং অপরটিতে 'প্রায় ত্রিশজন' বলা হয়েছে। সহীহ্ বুখারীর ভাষ্যকার ইবনু হাজার

---

১. ইমাম নবভী সহীহ মুসলিমের ভাষ্যে উক্ত কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন ঃ দেখুন। ১ম খণ্ড

আসকালানী বলেন, এই ধরনের কোন কোন হাদীসে 'ত্রিশ' অপেক্ষা বেশী সংখ্যারও উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলোতে এ কথা বলা হয় যে, তাহাদের প্রত্যেকে নবুওতের দাবী করবে। কাজেই তিনি সংখ্যাভিত্তিক বিরোধের মীমাংসা এভাবে করেন যে, যে সব রিওয়ায়েতে 'ত্রিশ'-এর চেয়ে বেশী সংখ্যার উল্লেখ আছে, তার তাৎপর্য এই হবে যে, 'তাদের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যুক ভণ্ড নবী'; আর বাকীগুলো নবুওতের দাবী করবে না বটে; কিন্তু তারা হবে ঘোর মিথ্যুক, চরম প্রতারক। এই ঘোর মিথ্যুক প্রতারকেরা নিজেদেরকে নবী বলে দাবী না করলেও সরলপ্রাণ মুসলিমদেরকে নানাভাবে ছলে-বলে কলে-কৌশলে বিভ্রান্ত করে পুণ্য ও ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করতে থাকবে। যেমন ফিরকাহ বাতিনীয়াহ, ফিরকাহ হুলুলীয়াহ ইত্যাদি।

(ফাতহুল বারী : ১৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৪)।

পাঁচজন ভণ্ড নবীর বিবরণ ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে। এখন বাকীদের বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।

৬. আল্ মুখতার ইবনু আবু 'উবাইদ ইবনু মাসউদ আস-সাকাফী

রসূলুল্লাহ্ (সঃ) চরম মিথ্যুকদের সম্পর্কে আর একটা ভবিষ্যদ্বাণী এই মর্মে করেন :

আসমা বিনতু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা বলেন, 'নিশ্চয় রসূ-লুল্লাহ্ (সঃ) আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, নিশ্চয় সাকীফ গোত্রে একজন মিথ্যুক ও একজন নরঘাতক রয়েছে। (সহীহ্ মুসলিম : ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৩১২)

ইবনু 'উমর (রাঃ) বলেন, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, "সাকীফ গোত্রে একজন ঘোর মিথ্যুক ও একজন নরঘাতক রয়েছে।"

(তিরমিযী : ফিতান অধ্যায়সমূহ)

উল্লিখিত হাদীস দুটিতে যে 'ঘোর মিথ্যুকের' উল্লেখ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে আলিমদের অভিমত এই যে, ঐ 'ঘোর মিথ্যুক' হচ্ছে আল মুখ্তার ইবনু আবু 'উবাইদ আস-সাকাফী।

ইসলামের ইতিহাসে আল মুখ্‌তার এক 'আজব চীজ'। তার না ছিল কোন ধর্ম, না ছিল কোন নীতি-নৈতিকতার বালাই। তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, যেভাবেই হোক প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মান-সম্মান লাভ করা। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কখনো সে নিজকে 'খারিজী' বলে প্রচার করতো, কখনো আবদুল্লাহ্‌ ইবনু যুবায়র (রাঃ)-এর চরম ও পরম ভক্ত সেজে নিজকে যুবায়রী আখ্যা দিত, আবার কখনো সে নিজকে চরম শিয়া বলে দাবী করতো।

মুখ্‌তারের পিতা আবু 'উবাইদ রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর জীবিত থাকা-কালেই ইসলাম গ্রহণ করেন, কিন্তু রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর সাক্ষাৎ লাভ তাঁর হয়নি। অতঃপর হিজরী ১৩ সনে হযরত উমর (রাঃ) তাঁকে পারস্য অভিযানে প্রেরণ করেন এবং ঐ যুদ্ধেই আবু উবাইদ শহীদ হন। আবু উবাইদ তাঁর এক পুত্র মুখতার ও এক কন্যা সাফীয়াকে রেখে যান। সাফীয়ার বিয়ে হয় হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমরের সাথে। সাফীয়া বেশ সুশীলা ও ধার্মিকা মহিলা ছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাই মুখতার ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। হযরত উমর সাফীয়াকে ভালবাসতেন, সম্মানও করতেন।

মুখতার প্রথম প্রথম হযরত আলী ও তাঁর বংশধরের প্রতি গভীর বিদ্বেষ পোষণ করতো। হযরত আলী (রাঃ)-এর শাহাদতের পরে হযরত হাসান (রাঃ) ঘটনাচক্রে আল্‌ মাদায়িন পৌঁছেন। ঐ সময় মাদায়িনের শাসনকর্তা ছিলেন মুখতারের চাচা, আর মুখতার তখন ঐ চাচার বাড়ীতে অবস্থান করছিল। মুখতার তার চাচাকে বলল, "চাচাজান, আপনি যদি হাসানকে গ্রেফতার করে মু'আবিয়ার নিকট পাঠিয়ে দেন তা হলে আপনি মু'আবিয়ার নিকটে বরাবর উচ্চ স্থান ও মর্যাদা ভোগ করতে পারবেন। এ কথা শুনে তার চাচা বললেন, "ভাতিজা, কি জঘন্য তোমার এই কথা!" ক্রমে এ কথা প্রকাশ হয়ে পড়লে শিয়া সম্প্রদায় মুখতারকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখতে থাকে।

তারপর হিজরী ৬০ সনে হযরত হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-এর চাচাতো ভাই মুসলিম ইবনু আকীল যখন হযরত হুসাইন (রাঃ) কর্তৃক কুফায়

প্রেরিত হন তখন মুখতার কূফার একজন বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিল এবং মুসলিমকে সে নিজ বাড়িতে আশ্রয় দেয়। মুখতার সেই সঙ্গে ঘোষণা করে, "আমি মুসলিমকে নিশ্চয়ই সাহায্য করবো।" এই কথা যখন কূফার তৎকালীন গভর্নর ইবনু যিয়াদ শুনতে পায় তখন সে মুখতারকে কারাগারে নিক্ষেপ করে, তাকে একশ' ঘা বেত মারে এবং তার মুখে আঘাত করে তার এক চোখ নষ্ট করে ফেলে। তারপর ভগ্নিপতি ইবনু উমরের সুপারিশক্রমে মুখতার কারামুক্ত হয়।

অতঃপর মুখতার মক্কা গিয়ে ইবনুয্ যুবায়রের কৃপাদৃষ্টি লাভের জন্য কোশেশ করতে থাকে।

হিজরী ৬৪ সনে ইয়াযীদের মৃত্যুর পর ইবনুয্ যুবায়র হিজায ও ইরাকে নিজের আধিপত্য কায়েম করেন এবং ইবনু মুতী'কে কূফার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। মুখতার এই সময় হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর খুনের প্রতিশোধ নেবার জন্য কূফাবাসীদের উত্তেজিত করতে থাকে। ফলে বিপুল শক্তি সংগ্রহ করে ইবনু মুতী'কে কূফা থেকে বিতাড়িত করে মুখতার নিজে কূফার শাসনক্ষমতা হস্তগত করে। তারপর ইবনুয যুবায়রকে শান্ত করার মতলবে তাকে জানায় যে, ইবনু মুতী' উমাইয়াদের পক্ষ সমর্থন করছিল বলে সে তাকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজে শাসনভার গ্রহণ করে।

কথিত আছে যে, তুফাইল ইবনু জা'দাহ নামক এক ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর বাড়ীতে একখানা অতি পুরাতন পরিত্যক্ত চেয়ার দেখেছিল। ঐ চেয়ারখানাকে সে বাড়ীতে নিয়ে এসে অতি যত্ন সহকারে ধুয়ে-মুছে সুন্দর ভাবে সুসজ্জিত করলো। অতঃপর মুখতারকে খবর দিল। খবর শুনে মুখতারের মাথায় তড়িৎ গতিতে একটা অভিনব কল্পনা খেলে গেল। তাই সে অবিলম্বে বহু মূল্যের পুরস্কার দিয়ে তুফাইলের কাছ থেকে চেয়ারটি হাসিল করল। অনন্তর, মিম্বরে উঠে নিম্নরূপ খুতবা দিলঃ

'এই চেয়ার হচ্ছে আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রাঃ)-এর পরিত্যক্ত সম্পদ; যেমন বনু ইসরাঈলের ছিল হযরত মূসা (আঃ)-এর নিদর্শন

সম্বলিত শান্তিময় সিন্দুক। এর মাঝে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে রয়েছে চির প্রশান্তি, আর এটা হচ্ছে হযরত মূসা ও হারূন (আঃ)-এর বংশধর যা ছেড়ে যান তার অবশিষ্টাংশের অনুরূপ।' বিধর্মীদের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ পরিচালনাকালে হযরত মূসা (আঃ)-এর পরিত্যক্ত সিন্দুকটিকে যেমন ইসরাঈলীরা সম্মুখভাগে স্থাপন করতেন, মুখতারও তদ্রূপ সৈন্যদের পুরো-ভাগে এই চেয়ারকে মহামূল্য রেশমী বস্ত্র দ্বারা আবৃত করে স্থাপন করতো।

মুখতার এই চেয়ারের সাথে আরও বহু কল্পনাপ্রসূত আধ্যাত্মিক, অলৌকিক এবং অনৈসলামিক অদ্ভুত ধরনের ঘটনাকে সম্পৃক্ত করে রেখে-ছিল। শুধু তাই নয়, কথিত আছে যে, মুখতারকে নাকি পয়গাম্বর বলে প্রচার করে বেড়াতো তারই একজন স্ত্রী। মুস্‌আব এই মর্মে শেকায়েত করেছিলেন আবদুল্লাহ ইবনুয্‌-যুবায়রের কাছে। তাই তিনি ভুয়া নবীর সেই স্ত্রীকেও হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন।

মুখতার নবুওতের দাবী করার পরে আরবী ভাষার ছন্দে ইবারাত তৈরী করে দ্বিধাহীন চিত্তে বলতো যে, এগুলো আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আগত। একদিন তাই মিম্বরে চড়ে খুতবা দিতে গিয়ে ওয়াহাবীর ভান করে বলতে লাগলো—'আকাশ থেকে অবশ্যই নেমে আসবে কৃষ্ণ অগ্নি; আর উহা অব-শ্যাই পুড়িয়ে ফেলবে কূফায় অবস্থিত আসমা বিনতু খারিজার ঘরবাড়ী।'

মুখতারের এই কথা যখন আস্‌মার কানে গেল তখন সে বলে উঠলো: সত্যই কি মুখতার আমার সম্বন্ধে এহেন উক্তি করেছে? তবে সে তো নিঃসন্দেহে আমার বাড়ীঘর ভস্মীভূত করেই ছাড়বে! এই বলেই সে কূফার বাড়ীঘর ছেড়ে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করল।

(তাবাকাত ইবনু সা'দ)

পূর্বে বলা হয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়রের পক্ষ থেকে তখন কূফার শাসনকর্তা ছিলেন আবদুল্লাহ বিন মুতী'। মুখতার তাই ইব্‌রা-হীম ইবনু মালিক আশতারকে স্বপক্ষে টেনে নিল মুহাম্মদ ইবনু হানা-ফীয়ার এক কৃত্রিম পত্র দেখিয়ে। তারপর সে ইবনু মুতী'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে তাঁকে কূফা থেকে বহিষ্কৃত করলো এবং স্থায়ীভাবে সেখানে আসন গেড়ে

বসলো। তারপর উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদের বিরুদ্ধে ইবনু আশতারের নেতৃত্বে অভিযান প্রেরণকালে সে পায়ে হেঁটে বহু দূর পর্যন্ত তাকে বিদায় দিতে গেল। আর বলল যে, তুমুল যুদ্ধের সময় মেঘখণ্ডের নীচু দিয়ে সাদা সাদা কবুতরের আকারে ফিরিশ্তা মণ্ডলীর দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করবেন। আসল ব্যাপারটা ছিল অন্যরূপ। মুখতার তার কতিপয় শিষ্যের কাছে সাদা রঙের কতকগুলো কবুতর রেখে দিয়েছিল আর বলে দিয়েছিল যে, ঘোরতর যুদ্ধের সময় এই পায়রাগুলোকে যেন আকাশের গায়ে উড্ডীন করা হয়। শিষ্যেরা পীরের নির্দেশ মত তাই করলো। আর তা' দেখে ইবনু আশ্তারের সৈন্যদল রণক্ষেত্রে নব বলে বলীয়ান হয়ে উঠলো। তাদের নবীর কথা যে মিথ্যা হবার নয়, এ বিশ্বাস তাদের মনে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়ে গেল। তাই তারা এ যুদ্ধে জয়লাভ করলো এই নব শক্তি সঞ্চারের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ। ইবনু আশতার নিজ হাতে উবায়দুল্লাহ্ ইবনু যিয়াদকে হত্যা করলো। এই যুদ্ধে জয়লাভের পর মুখতারের শক্তি সাহস শত গুণে বেড়ে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে জুলুম ও অত্যাচারেরও মাত্রা যেন চরমে ওঠে।

মুখতার কূফার শাসন ক্ষমতা হস্তগত করার পর ইবনুয্-যুবায়রের বশ্যতা স্বীকার করে তাঁকে একটা পত্র লিখেছিল—এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সাময়িকভাবে ইবনুয-যুবায়র তাকে কুফার শাসনকর্তার পদে বহাল রাখেন। তখন সে হযরত হুসাইন (রাঃ) এর হত্যাকারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল গণ্যমান্য লোককে সমানে হত্যা করে চলে; এমন কি মুখতারের সাথে যারই কোন মনোমালিন্য ছিল তাকেই সে এই অজুহাতে নির্বিবাদে হত্যা করতে থাকে।

অবশেষে এভাবে নিজ শত্রুদেরকে হত্যা করে মুখতার যখন গভীর আত্মপ্রসাদ লাভ করতে থাকে এবং নিজেকে নিষ্কণ্টক মনে করতে থাকে তখন মুখতারের উল্লিখিত নুবুওতের দাবী ও হযরত আলীর চেয়ার সম্পর্কিত উপাখ্যান ইত্যাদি ইবনুয-যুবায়রের কর্ণগোচর হয়। তখন ইবনুয-যুবায়র নিজ ভাই মুস্আবকে ইরাকের আমীর করে প্রেরণ করেন। মুসআব প্রথমে বসরা যান। তারপর হিজরী ৬৭ সনে বিশাল সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করে মুখতারকে

আক্রমণ করেন। তাহার মস্তক ছিন্ন করে ইবনুয-যুবায়রের নিকট পাঠানো হয় এবং তার দুই হাত শূলবিদ্ধ করে কূফার মসজিদের দরজার বাইরে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এইভাবে ভণ্ড নবী মুখতারের পাপ-পংকিলময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

৭. **মুকান্না' খুরাসানী**

এই ভণ্ড প্রতারকের নাম ছিল হাশিম ইবনু মালিক। সে তৎকালীন খুরাসানের মারভ শহরে জন্মগ্রহণ করেছিল। তার এক চোখ কানা ছিল এবং তার চেহারাও ছিল অত্যন্ত কদাকার ও বীভৎস। তাই সে তার মুখমণ্ডলে সোনার একটি মুখোশ লাগিয়ে তা ঢেকে রাখতো। এ কারণে সে মুকান্না' অর্থাৎ 'আবরণ দ্বারা আবৃত মুখমণ্ডল' উপাধিতে অভিহিত হতো। আব্বাসীয় সুলতান আল্ মাহদীর (শাসনকাল ঃ হিজরী ১৫৮—১৬৯) আমলে এই ভণ্ড নুবুওতের মিথ্যা দাবী করে অগণিত মানব সন্তানকে পথভ্রষ্ট করে ফেলে। এতেও সন্তুষ্ট হতে না পেরে অবশেষে সে আল্লাহ্ দাবী করে বসে। বাল্যাবস্থা থেকেই সে ছিল অত্যন্ত ধূর্ত, শঠ এবং ক্রূরমতি। তার মেধাশক্তিও ছিল অত্যন্ত প্রখর। বাল্যকাল থেকেই ইসলামী শিক্ষা বলতে সে কিছুই লাভ করেনি। তবে মান্তিক, দর্শন ও বিজ্ঞান সম্পর্কে বেশ জ্ঞান লাভ করেছিল এবং সেই সঙ্গে ভেল্কিবাজীও বেশ আয়ত্ত করেছিল। শেষ পর্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে সে ইসলাম থেকে দূরে—বহু দূরে সরে পড়েছিল।

এ মুখোশ পরিহিত ভণ্ড নবী সর্বপ্রথম ট্রান্সক্সোনিয়ায় নুবুওতের দাবী করে। তারপর সে তার তথাকথিত উম্মতের উপর থেকে নামায রোযার পাবন্দি বা বাধাবন্ধন তুলে দেয়। এ ছাড়া বিয়ে-শাদীর প্রথাকেও উৎখাত করে সে প্রকাশ্যভাবে ব্যভিচার ও অশ্লীলতার সূত্রপাত করে। ঐ অঞ্চলটি ইসলামী কেন্দ্র থেকে বহু দূরে অবস্থিত থাকায় সেখানকার অধিবাসীরা স্বাভাবিকভাবেই ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখতো না। কাজেই তারা দলে দলে ঐ ভণ্ডের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলো। মুকান্না যেখানে বাস করতো সেই দিকে মুখ করে তার শিষ্যরা তাকে সিজদা করতো। এতগুলো মন্ত্রশিষ্য হাতে

পেয়ে এখন সে প্রকাশ্যভাবে জোর গলায় তার প্রচার কার্য চালাতে শুরু করলো। অনন্তর সে এক রাজত্ব কায়েম করে তার রাজধানী স্বরূপ একটা বিরাট দুর্গও তৈরী করলো।

অতঃপর যখন ধন-মালের প্রাচুর্য দেখা দিল তখন সে এই মিথ্যা নবুওতে সন্তুষ্ট হতে না পেরে একেবারে খোদায়ী দাবী করে বসলো। ফলে তার ভক্তবৃন্দ চক্ষু বন্ধ করে তাকে আল্লাহ্ বলে মেনে নিল। তার খোদায়ী প্রভাব-প্রতিপত্তি অনতিবিলম্বে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো জঙ্গলের আগুনের মতোই। আশেপাশের দুর্ধর্ষ তুর্কীরা, যারা তখনও মুসলিম হয়নি, মুকান্নার বায়'আত গ্রহণ করলো। সুতরাং তার মুরীদ সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার সাহস এত দূর বৃদ্ধি পেল যে, প্রকাশ্যভাবে দেশের প্রতিটি আনাচে কানাচে তার খোদায়ী তবলীগ বেশ জোরে শোরেই শুরু হয়ে গেল।

তার তবলীগ ছিল অত্যন্ত সর্বনাশা। তার শিক্ষা এই ছিল যে, আল্লাহ্ মনুষ্য সমাজকে দর্শনদানের জন্য মাঝে মাঝে মানুষের রূপ পরিগ্রহ করেন। হযরত আদম, নূহ (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত সকল নবী-রসূলই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ ছিলেন এবং আল্লাহ্ তাঁদের রূপে প্রকাশ হতে হতে পরবর্তী যুগে অপর লোকদের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করতে থাকেন। সে আরও ঘোষণা করে যে, তার অব্যবহিত পূর্বে আল্লাহ্ আবু মুসলিম খুরাসানীর রূপে প্রকাশ হয়েছিলেন এবং এখন তারই মধ্যে আল্লাহ্ প্রকাশ হয়ে রয়েছেন। তারপর তার ধর্মের মূলনীতি এই ছিল যে, ধর্ম অন্তরের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। ধর্মের জন্য কোনও কার্যের প্রয়োজন নেই। মন ঠিক থাকলেই সব ঠিক।

এই অবতাররূপী ভণ্ড মিথ্যুক একটি বিশেষ ভেল্কিবাজী এই দেখাত যে, সে একটি কৃত্রিম চাঁদ তৈরী করে তার অট্টালিকার এক কূপ থেকে তা' উত্তোলিত করাতো। আর অন্য কূপে তাকে অস্তমিত করাতো। এতে দূর, এক জায়গা আলোকিতও হত। ইতিহাসে ইহা 'নাখ্শাবের চাঁদ' নামে প্রসিদ্ধ। এ দেখে আরও বহু লোক তার ধোঁকায় পড়ে।

যে সমস্ত সরলচিত্ত ও দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন মুসলিম তার খোদা হওয়াকে স্বীকার করতে পারেন নি, তাঁদের প্রতি এই দুর্বৃত্ত অমানুষিক জুলুম আর নৃশংস নির্যাতন চালাতো। এমন কি বহু মুসলিমকে সে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। এ ভাবে পাশবিক জুলুম সিতাম, হত্যাকাণ্ড এবং বল প্রয়োগ দ্বারা সে তার অনুগামীদের সংখ্যা দিনদিন বাড়াতে লাগলো। ফলে, পার্শ্ববর্তী মুসলিমদের পক্ষে সে অঞ্চলে অবস্থান করা একান্ত দুরূহ হয়ে উঠলো এবং তাদের অনেকে ঘরবাড়ী ছেড়ে বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল।

মুসলিম জগতের কেন্দ্র, মাহদীর রাজধানী বাগদাদ নগরী ছিল ঐ অঞ্চল থেকে অনেক দূরে। তাই সেখানে খবর পৌঁছানো দুরূহ ছিল। এই দূরত্বের সুযোগ গ্রহণ করে মুকান্না মুসলিমদের উপর বর্বরতম জুলুম চালাতে থাকে।

মুকান্না কৃত্রিম জান্নাত এবং জাহান্নামও তৈরী করেছিল। যাঁরা তাকে আল্লাহ্ বলে স্বীকার করতেন না, তাঁদের সে সোজাসুজি তার নিজের তৈরী জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতো। আর যে ব্যক্তি চক্ষু বন্ধ করে তার খোদায়ী মেনে নিতো, তাকে সে হুর-গিলমানে ভরা তার জান্নাতে বিচরণ করার সুযোগ দিত। এই কৃত্রিম জান্নাতের জন্য যে সব হুর-গিলমানের প্রয়োজন হতো তা ঐ ভণ্ডের লোকজন সংগ্রহ করত। এই উদ্দেশ্যে তারা দেশের নানাস্থান থেকে পরমাসুন্দরী যুবতী ও সুন্দর সুন্দর বালকদেরকে ছলে, বলে, কৌশলে, যেমন করেই হোক বাগিয়ে আনত।

অবশেষে সত্যই একদিন এই ভুয়া নবীর ভণ্ডামী ও নির্যাতনের দিন শেষ হয়ে এলো। যে সব সুদৃঢ় আকীদার মুসলিম তার ধোঁকায় পতিত হননি, তাঁরা বহু কষ্টে বাগদাদ গিয়ে আমিরুল মুমিনীন মাহদীকে এই ভণ্ডের খবর পৌঁছালেন। ফলে, এই ভণ্ডের বিরুদ্ধে তিনি মু'আয ইবনু মুসলিম এবং সাঈদ হারশী নামক সিপাহসালারদ্বয়ের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে অভিযান প্রেরণ করেন। উভয় পক্ষে দিনের পর দিন ধরে তুমুল যুদ্ধ হয়। বেগতিক দেখে মুকান্না তার দুর্গে আশ্রয় নেয়। তার ত্রিশ হাজার শিষ্য মুসলিম সৈন্যের সামনে আত্মসমর্পণ করে। মুসলিম সৈন্যগণ অতঃপর তার

দুর্গ অবরোধ করে ফেলেন। মুকান্না তাই অবধারিত পরাজয়ের গ্লানি এবং ভূয়া নবুওতের সকল রহস্য প্রকাশের ভয়ে দুর্গের মধ্যেই এক বিরাট অগ্নিকুণ্ড তৈরী করল এবং ধন, মাল, আসবাবপত্র, জীবজন্তু যা কিছু ছিল সবই এই আগুনে নিক্ষেপ করল। অতঃপর সে তার শিষ্যমণ্ডলী ও পরিবারবর্গকে বলল : আমার সাথে আসমানে আরোহণ করার ইচ্ছা যার থাকে সে এই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করতে পার। এই বলে সে নিজে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সঙ্গীরাও একে একে তার অনুসরণ করল। অতঃপর মাহদীর সৈন্য-সামন্ত ভিতরে প্রবেশ করে দেখে, দুর্গ একেবারে জনপ্রাণীশূন্য ও আসবাববিহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এভাবে মুকান্না ও তার উম্মতের বিলুপ্তি সাধিত হয়।

ইবনুল খাল্লিকানের বর্ণনায় প্রকাশ যে, খুরাসানের এই ছদ্মবেশী এবং মুখমণ্ডলে স্বর্ণমুখোশ বা সবুজ সিলকের অবগুণ্ঠন পরিহিত, মিথ্যা ধর্মপ্রচারক আল্-মুকান্নার আসল নাম ছিল আতা। মুকান্নার পিতার নাম ইবনু খাল্লিকান জানতেন না, কিন্তু লোকে তাকে হামিদ বলত। ইবনুল আসীরের মতে প্রকাশ যে, মুকান্নার আসল নাম ছিল হাকীম। সে বলতো যে, শিষ্যরা তার চেহারার উজ্জ্বলতর দীপ্তি সহ্য করতে অক্ষম বলেই সে স্বর্ণমুখোশ পরিধান করেছে। কিন্তু আসলে তার বিকলাঙ্গ ও বিকট কুৎসিৎ মুখমণ্ডলকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখাই ছিল তার মুখ্য উদ্দেশ্য। সর্বপ্রথম এক সাধারণ রজকরূপে সে তার জীবনযাত্রা শুরু করে। অনন্তর কিছু যাদুমন্ত্র ও ইন্দ্রজাল শিক্ষার পর নিজেকে আল্লাহ্ পাকের অবতার হিসেবে প্রচার করতে শুরু করে। তার মতে রূপান্তরিত না হলে কেউই আল্লাহ্‌কে দর্শন করতে সক্ষম হয় না। তাই আল্লাহ্‌র অবতারস্বরূপ সে মর্তের মাটিতে আবির্ভূত হয়েছে। এই কানা, খর্ব ও বামনাকৃতি বিশিষ্ট 'মুকান্না' তার প্রবঞ্চনামূলক ইন্দ্রজালের প্রভাবে অনুচরবর্গের মাঝে বেশ প্রতিপত্তি ও প্রাধান্য ছড়াতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু সম্ভবত নাখশাবের রহস্যময় কূপ থেকে কৃত্রিম চাঁদ উত্তোলিত করাই তার সাফল্য অর্জনে সহায়তা করেছিল সব চাইতে বেশী। এ সকল চাঁদের প্রতিচ্ছবি নাকি দু'মাস

...লার পথের দূরত্ব হতেও দেখা যেতো। দেশ-বিদেশের সর্বত্রই এ কথা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই নানা স্থান থেকে নাখ্শাবে বহু লোকের সমাগম হতে থাকে। জনসাধারণ এই চন্দ্রোদয়কে হয়তো যাদুবিদ্যার একটা ফল-শ্রুতি হিসেবে মনে করতো। কিন্তু আসলে ইহা অংকশাস্ত্রের কোন বিশেষ প্রণালীর প্রয়োগে প্রকৃত চাঁদের প্রতিবিম্ব দেখানো ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, সেকথাও পরে প্রমাণিত হয়েছিল। আল-মুকান্না' নিজেকে শুধু যে-আল্লাহ্ হিসেবে প্রচার করেই ক্ষান্ত হয়েছিল তা নয়, বরং দুশমনদের কাছ থেকে লুন্ঠিত ও আহরিত ধন সম্পদের একটা মোটা অংক সে মুরীদদের মাঝে অকাতরে বিতরণ করতো। নিজেকে আল্লাহ্‌র অবতাররূপে প্রমাণ করার মানসে মুকান্না' তার শিষ্যদের বলেছিল যে, আল্লাহ্ পাক হযরত আদম (আঃ)-কে সিজদা করার জন্য ফিরিশতামণ্ডলীকে শুধু এজন্য আদেশ করেছিলেন যে, তিনি স্বয়ং হযরত আদমের দেহে প্রবেশ করেন। অতঃপর আল্লাহ্ পাক ক্রমান্বয়ে হযরত নূহ (আঃ) ও তাঁর পরবর্তী সকল নবী ও জ্ঞানী-গুণীদের দেহ-দেহান্তর হয়ে অবশেষে আবু মুসলিম খুরাসানীর দেহাভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করেন এবং সর্বশেষে তিনি আল-মুকান্নার দেহে প্রবেশ করেছেন। এ জন্যে আবু মুসলিমকে সে রসূলে করীম (সঃ)-এর চাইতেও নাকি শ্রেষ্ঠতর পুরুষ বলে মনে করত।

৭৪৩ ঈসায়ীতে ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর প্রপৌত্র ইয়াহিয়া ইবনু যায়েদের হত্যার ইনতিকাম গ্রহণ করাও নাকি মুকান্নার মনোনীত একটা অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। মুকান্নার শাগরিদ শিষ্যরা সব সময় শুভ্র পোশাক পরিধান করতো বলে তাদের 'মুবাইয়েযা' নামে অভিহিত করা হয়। এই মুবাইয়েযা নামে আখ্যায়িত অনুচরদের মাঝে মুকান্না' নাকি মাযদাকের প্রচলিত সমস্ত ধর্মীয় রীতিনীতির পুনঃপ্রচলন করেছিল। আবুল ফারাজ ইসপাহানীর (১২২৬—১২৮৬ ঈসায়ী) মতে মুকান্নার মৃত্যু বিষপানেই হোক অথবা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়েই হোক, এই মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সে তার অনুচরদের কাছে ওয়াদা করেছিল যে, তার অমর আত্মা এক ধূসর বর্ণের অশ্বারোহীরূপে আবার তাদের কাছে অতি সত্বর ফিরে আসবে এবং তাদের সাংসারিক ভোগ দখলে পূর্ণ সহায়তা করবে। কেউ কেউ

বলেন : মুকান্না তীব্র হলাহল পান করার পর মুসলিম অবরোধকারীদের সেনানায়ক সাঈদ আল হারশী ১৬৩ হিজরী মুতাবিক ৭৭৯ ঈসায়ীতে তার ছিন্ন মস্তক হালব নগরীতে অভিযানরত প্রবাসী খলীফা আল-মাহদীর খিদমতে হাযির করেন। (বিস্তারিতের জন্য দেখুন : ইয়াকুৎ হামুভী কৃত 'কিতাবুল মুবহাত', সেহেশতানী কৃত 'মিলাল ওয়ান নিহাল' এবং ইবনু হাযম কৃত 'আল ফিগাল'।)

৮. উসতাদ সীস

আমীরুল মু'মিনীন মানসুরের রাজত্বকালে হিজরী ১৫০ সনে খুরাসান এলাকায় উস্তাদ সীস নামে এক ব্যক্তি নুবুওতের দাবী করে। হিরাত, বাদগীস ও সিজিস্তানের অধিবাসীরা এই ভণ্ড নবীর শঠতা, প্রতারণা ও ছলনায় পড়ে অবিলম্বে তার একান্ত অনুগামী হয়ে পড়ে। মারওয়ার্‌-রুদের শাসনকর্তা আজশাম এই নব উদ্ভূত ফিতনার বিনাশ সাধনে অগ্রসর হন। কিন্তু উস্তাদ সীসের ক্ষমতা এত দূর বেড়ে গিয়েছিল যে, তার হাতে আজশাম সৈন্য-সামন্ত ভীষণভাবে পরাজয় বরণ করেন। অবশেষে আব্বাসী সুলতান মানসুর খবর পেয়ে খাযিমের নেতৃত্বে বারো হাজার ফৌজ সীসের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। সিপাহসালার খাযিম যুদ্ধের বিভিন্ন কলা-কৌশল যোগে সীসের সৈন্যদেরকে পরিবেষ্টিত করে ফেলেন। অতঃপর উস্তাদ সীসের ৬০ হাজার সৈন্য নিহত ও ১২ হাজার সৈন্য গ্রেফতার হয়। উস্তাদ সীস পাহাড়ী এলাকায় পলায়ন করে, কিন্তু অবশেষে তাকেও গ্রেফতার করা হয়।

৯. ফাতিমা

আমীরুল মু'মিনীন মামুনের রাজত্বকালে (১৯৮—২১৮) ফাতিমা নাম্নী একজন স্ত্রীলোক নুবুওতের দাবী করে বসে। অনন্তর লোকে তাকে ধরে নিয়ে মামুনের রাজদরবারে হাযির করে। মামুন তার নাম ধাম জিজ্ঞেস করলে সে জওয়াব দেয় : আমি ফাতিমা নবী। মামুন জিজ্ঞেস করলেন : নবী মুস্তফা (সঃ) আল্লাহর কাছ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছিলেন,

তাতে ঈমান আছে তো? ভণ্ড মহিলা নবী জওয়াব দেয়ঃ হ্যাঁ, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) যা কিছু নিয়ে আসেন সে সবের প্রতি আমার অটল বিশ্বাস রয়েছে। আর আমি সেগুলোকে অমোঘ সত্য বলেই মনে করি। মামুন বললেন, তবে তুমি নবুওতের দাবী কর কি করে? কারণ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ 'লা নাবীয়্যা বা'দী' অর্থাৎ 'আমার পরে কোন নবীর উদ্ভব হবে না।' ভণ্ড মহিলা নবী সঙ্গে সঙ্গে জওয়াব দিলঃ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর এ উক্তির তাৎপর্য এই যে, তাঁর পরে কোন পুরুষ নবী আসবে না। এর অর্থ এ নয় যে, কোন স্ত্রীলোকও নবী হবে না। খলীফা মামুন এ উত্তর শুনে হাসি সংবরণ করতে পারলেন না; হাযিরানে মজলিসকে লক্ষ্য করে বললেনঃ আমার সকল প্রশ্ন ও দলীল-প্রমাণ চাওয়া শেষ হয়েছে। তোমাদের কিছু প্রশ্ন করার থাকলে প্রশ্ন করতে পারো।

বস্তুত ঐ যুগে নবুওতের দাবী-দাওয়া ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং নবুওত নিয়ে খেলা-তামাশা পর্যন্ত শুরু হয়। খলীফা মামুনের যুগে এ ধরনের এক ভুয়া নবীর কাছে মু'জিযা তলব করা হলে সে জওয়াব দেয়, আমি অন্তরের গোপন কথারও খবর দিতে পারি। লোকে বললোঃ বলো দেখি আমাদের অন্তরে কি নিহিত আছে? সে উত্তর দিলঃ তোমাদের অন্তরের কথা এই যে, আমি একজন আস্ত মিথ্যুক; আমি মোটেই নবী নই। এ থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, নবুওত নিয়ে হাসি রহস্য করতেও তারা আদৌ দ্বিধাবোধ করতো না।

অনুরূপভাবে মু'তাসিমের রাজত্বকালে তাঁর সামনে এক ভণ্ড নবীকে হাযির করা হয়। সুলতান মু'তাসিম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি নাকি নবুওতের দাবীদার?

—জী, হাঁ।

—কোন সব লোকের নিকট তুমি প্রেরিত হয়েছ?

—আপনার কাছে।

—আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি একজন আস্ত বেওকুফ ও নিরেট আহম্মক।

ভণ্ড নবী উত্তর দিলো : ঠিকই বলেছেন। যেমন উম্মত, ঠিক তেমনি নবীই পাঠানো হয় তাদের কাছে।

১০. মাহমুদ ইবনু ফয়েজ নিশাপুরী

মাহমুদ ইবনু ফয়েজ নিশাপুরী নামক এক ব্যক্তি মুতাওয়াক্কিলের রাজত্বকালে হিজরী ২৩৫ সনে সামার্‌রাহ শহরে নুবুওতের দাবী করে। সে নিজেকে যুল্‌কারনাইন বলে ঘোষণা করেছিল এবং একটা মনগড়া বই রচনা করে বলেছিল : এটাই কুরআন; জিবরাইলের মাধ্যমে এটা আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। শুধুমাত্র ২৮ জন লোক তার উপর ঈমান এনেছিল। এই ২৮ জন উম্মতসহ ভণ্ড নবীকে নিশাপুর থেকে গ্রেফতার করে যখন সুলতান জা'ফর মুতাওয়াক্কিলের কাছে হাযির করা হল, তখন তিনি তাদের প্রত্যেককে এক শো ঘা করে চাবুক মারতে আদেশ দিলেন। এই ভণ্ডের সাথে তার স্ত্রী, পরিবার-পরিজন এবং এক অশীতিপর বৃদ্ধও ছিল।

ভণ্ড নবী মাহমুদকে এক শো চাবুক মারা সত্ত্বেও সে তার নুবুওতের দাবী পরিহার করলো না। কিন্তু বৃদ্ধ উম্মতটিকে চাবুকের ৪০টি আঘাত করতেই সে এই ভুয়া নবীর নুবুওত অস্বীকার করে বসলো। অতঃপর ঐ বৃদ্ধ ভণ্ড নবী মিথ্যা কুরআনখানিও সর্বসমক্ষে হাযির করলো। কিন্তু নুবুওতের এত সাধ আর এত মোহ যে, এই ভণ্ড নবী মাহমুদ বেত খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত মরে গেল, তবুও নুবুওতের দাবী সে ছাড়লো না। হিজরী ২৩৫ সনে এই ভণ্ডের মৃত্যু হয়। এভাবেই তার নুবুওতের সাধ মিটে যায়।

১১. বাহবুজ ইবনু আবদুল ওহ্‌হাব

আব্বাসী সুলতান মু'তামিদের রাজত্বকালে (২৫৬-২৭৯) বাহবুজ নুবুওতের দাবী করে। সে সমগ্র মেসোপোটেমিয়া এলাকায় অতি ব্যাপকভাবে

ফিতনা-ফাসাদ ও অশান্তির রাজ্য কায়েম করে এবং সেখানকার সাইয়িদ বংশীয় লোকদেরও যথেষ্ট অবমাননা করে। তার কুকীর্তির মধ্যে প্রধান ছিল নৌদস্যুবৃত্তি। যে সব নৌকা খাদ্যসম্ভারসহ দিজলার উপর দিয়ে যাতায়াত করতো ভণ্ড নবী বাহবুজের নির্দেশক্রমে তার অনুচরেরা তা অবাধে লুটতরাজ করতো।

প্রথমে সে বসরার উপর নিজ আধিপত্য বিস্তার করে। তারপর এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে বাহবুজের অনুচরেরা আব্বাসী সৈন্যদেরকে এত অধিক সংখ্যায় হত্যা করে যে, মৃত লাশের পূতিগন্ধে ব্যাপক মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে। অতঃপর হিজরী ২৬৮ সনে যানজদের এই ভুয়া নবী আব্বাসীয় সৈন্য কর্তৃক নিহত হয়।

এই ভণ্ড নবী বাহবুজ নানারূপ ভেল্কিবাজী প্রদর্শন করে জনসাধারণ সমক্ষে ইলমে-গায়েব জানার দাবী করেছিল। আর অবোধ জনগণ তা দেখেই তার প্রতারণাজালে আবদ্ধ হয়েছিল। সে আরও বলতো: আল্লাহ্ স্বয়ং আমাকে রসূল করে পাঠিয়েছেন, কিন্তু আমি নিজেই সেই রিসালাতকে গ্রহণ করতে পারিনি।

১২. ইয়াহইয়া ইবনে যিকরাওইহ কারমাতী

আব্বাসী সুলতান আল্ মুক্তাফী বিল্লাহের রাজত্বকালে (২৮৯-২৯৫ হিঃ) ইয়াহইয়া ইবনু যিক্রাওইহ কারমাতী নুবুওতের দাবী করে বহু মুসলিম মুমিনকে গুমরাহ করে। এই ভণ্ড নবী ও তার অনুগামীরা রিক্কা নামক স্থানে গ্রেফতার হয়ে হিজরী ২৯১ সনে আল-মুক্তাফির সামনে নীত হয়। অনন্তর সুলতান আল-মুকতাফীর আদেশে এই ভণ্ড নবী নিহত হয় এবং তার অনুগামীদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়।

১৩. হুসাইন কারমাতী

ইয়াহইয়া ইবনু যিক্রাওইহ কারমাতী নিহত হওয়ার পর তার ছোট ভাই হুসাইন মনে করল যে, নুবুওত একটা বংশানুক্রমিক ব্যাপার। তাই

ভাই নিহত হওয়ার পর সে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে নবুওতের আসনে বসলো এবং 'আমিরুল মুমিনীন মাহদী' উপাধি গ্রহণ করলো। কিন্তু সে বেশীদিন নবুওতের গদীতে সমাসীন থাকতে পারেনি। হিজরী ২৯১ সনেই তারও পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়।

১৪. ঈসা ইবনু মিহরাওইহ কারমাতী

হুসাইন কারমাতীর মৃত্যুর পর তার চাচাতো ভাই ঈসা ইবনু মিহ্রা-ওইহ সিরিয়া দেশে নবুওতের দাবী করে এবং মুদ্দাসসির উপাধি গ্রহণ করে। সিরিয়া দেশে তার বহু অনুগামীও হয়। কিন্তু অল্পদিন পরেই হিজরী ২৯১ সনে সেও নিহত হয়।

১৫. আবু তাহির কারমাতী

আব্বাসী সুলতান মুক্তাদির বিল্লাহের রাজত্বকালে হিজরী ৩০১ সনে আবু তাহির কারমাতী কারামিতা সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব পদে বরিত হয়। তারপর কালক্রমে সে নবুওতের দাবী করে দেশে ও জনসমাজে ফিতনা এবং ব্যাপক অশান্তির স্রোত প্রবাহিত করে। হিজরী ৩১১ সনে আবু তাহির বসরা আক্রমণ করে তথাকার শাসনকর্তাকে হত্যা করে। ১৭ দিন পর্যন্ত সে বসরা নগরীতে লুটতরাজ ও ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের দ্বারা সমগ্র নগরীকে জনমানবহীন ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ও অবলা নারীদের ধরে নিয়ে হিজ্র নামক স্থানে চলে যায়। আবু তাহির ও তার অনুগামীরা হাজীদের কাফিলা লুট করতো। ৩১২ সনে তারা যখন হাজী-দের মালপত্র লুণ্ঠন করে তখন ঐ হাজীদের দলে সুলতান মুকতাদিরের চাচা আহমদও ছিলেন। তারা আহমদের সর্বস্ব অপহরণ করে তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

তার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ভয়-ভীতি চতুর্দিকে এত ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করে যে, বাগদাদের অধিবাসীবৃন্দও দেশ ত্যাগ করতে উদ্যত হয়। হিজরী ৩১৭ সনে আবু তাহির কারমাতী হজ্জের মওসুমে মক্কা মুয়ায্-যমা পৌঁছে হাজীদের ওপর হানা দেয়, তাদের অনেককে হত্যা করে এবং কা'বা গৃহের গিলাফ ও কা'বা গৃহের দেওয়াল থেকে 'হাজরে আস্ওয়াদ'

বা কৃষ্ণ পাথরটি নিয়ে পালিয়ে যায়। তারপর পূর্ণ কুড়ি বছর পরে সে হাজরে আস্ওয়াদ কা'বাগৃহে প্রত্যর্পণ করে।

১৬. আবু সাহীব তারীফ

দ্বিতীয় শতক হিজরীর প্রথম ভাগে আবু সাহীব তারীফ রাজত্ব কায়েম করেছিল এবং নবুওতের দাবী করে স্বীয় খান্দানের মধ্যে এক নতুন মযহাব প্রবর্তন করেছিল। হিজরী পঞ্চম শতক পর্যন্ত তাঁর খান্দানের মাঝে বাদশাহী কায়েম ছিল।

১৭. সালেহ ইবনু তারীফ

এই ভণ্ড নবী ১২৭ হিজরীতে পিতার হালাক হওয়ার পর সেই পরিত্যক্ত নবুওতের গদিতে বেশ শান-শওকতের সঙ্গে সমাসীন হয়। শুধুমাত্র নবুওতের দাবী করেই সে ক্ষান্ত হয়নি। বরং নিজের উপর এক নতুন কুরআন অবতারিত হওয়ার কথাও সে ঘোষণা করে। কিন্তু এই জাল কুরআনকে সে জনসমক্ষে হাযির করতে পেরেছিল কিনা বলা যায় না। কারণ সেই মেকী আয়াতগুলোর নমুনা খুঁজে পাওয়াই এখন ভার। যা-ই হোক, এই ভণ্ড নবী সালেহ ইবনু তারীফ সুদীর্ঘ ৪৭ বছর পর্যন্ত নিজের মনগড়া মযহাবকে প্রচার করে মৃত্যুবরণ করে। নিজেকে 'মাহদীয়ে আকবার' বলেও দাবী করে।

১৮. আবু মনসুর ঈসা

স্বীয় পিতার পরিত্যক্ত সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়ে সে নবুওতের দাবী করে এবং সুদীর্ঘ ২৭ বছর কাল ধরে বেশ শান-শওকত সহকারে এই মিথ্যা মযহাব প্রচার করার পর সে মৃত্যুবরণ করে। এই খান্দানও হিজরীর পঞ্চম শতক পর্যন্ত কায়েম ছিল।

১৯. বানান বিন সাময়ান তামিমী

এই ব্যক্তিকে 'কারামেতা' ফিরকার সাথে সংশ্লিষ্ট বলে মনে হয়। প্রথমে সে বেশ জোরশোরে নবুওতের দাবী করে। তারপর সে 'ইস্মে আযম'কে

নিজের আয়ত্তাধীন বলে ঘোষণা করে। সে এ কথাও প্রচার করে যে, হযরত আলী (রাঃ)-এর শরীরে স্বয়ং মহান প্রভু আল্লাহ পাক প্রবেশ করেছিলেন এবং এ কারণেই হযরত আলী (রাঃ) নাকি খায়বারের যুদ্ধে য়াহুদী কেল্লার সেই বিরাট দরজাটি উৎপাটন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

২০. দামিয়া

এই নারী ছিল সুদানের অধিবাসী। কিসের ভরসায় সে নবুওতের দাবী করেছিল বলতে পারি না। তবে একথা সত্য যে, অতি অল্প দিনের মধ্যেই অধিকাংশ সুদানী একান্ত অনুগত হয়ে তার ঝাণ্ডাতলে এসে সমবেত হয়েছিল। অবশেষে এই ভণ্ড নবী দামিয়া মুসলমানদের হাতে অতি শোচনীয়ভাবে নিহত হয়।

২১. ইউশিয়া

এই লোকটি খলীফা মাহদীর খিলাফতকালে নবুওতের দাবী করে। খবর পেয়ে খলীফা মাহদী তার বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। যুদ্ধে সে অতি শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে এবং মাহদীর সেনাদল তাকে ধরে এনে ফাঁসির যূপকাষ্ঠে লটকিয়ে দেয়।

২২. 'ইকদুল ফারীদের' লেখক আবদুল কাদের বাগদাদী বলেনঃ মামুন রশীদের খিলাফতকালেও এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি নবুওতের দাবী করেছিল এবং নিজেকে হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ হিসেবে প্রচার করেছিল।

২৩. খালিদ ইবনু আবদুল্লার যুগে আর এক নাম-না-জানা ব্যক্তি নবুওতের দাবী করে এবং পবিত্র কুরআনের মুকাবিলা করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে। অবশেষে ফাঁসির যূপকাষ্ঠে সে প্রাণ ত্যাগ করে।

২৪. আরও এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি নিজেকে হযরত নূহ নবী বলে দাবী করেছিল। এই দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে সে দেশব্যাপী সয়লাব ও ঝটিকা আসার ভবিষ্যদ্বাণী করলো। আর এ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সে বিরাট আকারের এক নৌকাও তৈরী করলো। অতঃপর সে জনগণের প্রতি গুরু-গম্ভীর স্বরে এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করলোঃ যারা আমার

আনুগত্য স্বীকার করে এই নৌকায় আশ্রয় নেবে তাদের জীবন রক্ষা পাবে, বাকী সমস্তই হালাক হয়ে যাবে। হালাক হওয়ার ভয়ে অগণিত লোক একান্ত অনুগতভাবে তার পতাকাতলে সমবেত হলো। অবশেষে এই ভন্ড মিথ্যুকের মৃত্যুতে তাদের ভয়-ভীতি বিদূরিত হলো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তারা এই আলেয়ার পেছন থেকে সরে দাঁড়ালো। তাদের মনে প্রাণে আবার শান্তি ফিরে এলো।

২৫. গাযারী নামে এক ব্যক্তি নবুওতের দাবী করেছিল। সে ছিল একজন আস্ত সাহের বা যাদুকর। সর্বপ্রথম তার আবির্ভাব ঘটেছিল সালেকা নামক এক জায়গায়। স্বীয় যাদুবিদ্যার ইন্দ্রজালে বহু লোককে বশীভূত করে সে তার অনুগামী করে ফেলে। অবশেষে ভ্রমণরত অবস্থায় একদিন 'গারনাডা' (Garnada) নামক শহরে উপনীত হলে আবু জাফর বিন যুবায়র নামক এক ব্যক্তি তাকে কতল করে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন।

২৬. অনুরূপভাবে 'লা' নামক আর এক ব্যক্তির আফ্রিকা দেশে প্রাদুর্ভাব ঘটে। সে নিজে নবী হওয়ার দাবী করে। স্বীয় দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে সে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর হাদীসেরও বিকৃত ব্যাখ্যা করতে আদৌ দ্বিধা বোধ করে না। এই হাদীসটি হচ্ছে 'লা নাবীয়্যা বা'দী'' অর্থাৎ আমার পরে কোন নবী হবে না। কিন্তু এই ভন্ড নবী হাদীসটির অর্থ করলো এই যে লা নামক ব্যক্তিই আমার পর নবী হবে। আর আমিই সেই একমাত্র 'লা'।

২৭. **ওবায়দুল্লাহ আল-আলাভী**

২৯৬ হিজরীতে এই ওবায়দুল্লাহ আলাভী ইমাম মাহদী হওয়ার দাবী করে। ২৯৭ হিজরীতে সে আফ্রিকায় উপস্থিত হয়ে সেখানকার শাহী গদী অধিকার করে ফেলে। বাদশাহ হওয়ার পর অত্যন্ত জোরেশোরে তার মাহদী হওয়ার প্রচার কার্য চলতে থাকে। দেশের আনাচে-কানাচে সে দূত প্রেরণ করে। এই দূত বা এলচীদের মাধ্যমেই তার প্রচারকার্য অতিশয় ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়ে পড়ে। অগণিত জনতা তার হাতে বায়'আত গ্রহণ ক'রে তার মুরীদ হয় এবং তাকে ইমাম মাহদী বলে অবনত মস্তকে স্বীকার করে।

আফ্রিকার শাহী তখ্ত অধিকার করার পর ন্যূনাধিক ২৪ বছর কাল ধরে সে তথায় অত্যন্ত জাকজমকের সঙ্গে বাদশাহী করে। এই খান্দানে সর্বমোট ১৩ জন বাদশাহ হয়েছিল। আর এই বাদশাহী ৫৬৭ হিজরী পর্যন্ত কায়েম ছিল। ৬৩ বছর বয়সে স্বীয় পুত্র আবুল কাসিমকে শাহী তখতের ভাবী উত্তরাধিকারী নির্দেশ করে। ওবায়দুল্লাহ মাহদী ৩২২ হিজরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।[১] অনুরূপভাবে এই উপমহাদেশে মুহাম্মদ জৌনপুরী (মৃত্যু ঃ ৯১০ হিজরী—১৫০৫ ঈসায়ী) নামক একজন পণ্ডিত ব্যক্তি দশম শতাব্দীতে নিজেকে ইমামে মাহদীয়ে মাওউদ (Promised Mahdi) বলে ঘোষণা করেছিল। এভাবে সে এক নতুন মযহাব প্রবর্তন করেছিল এবং দাক্ষিণাত্যের জয়পুর নামক রাজ্যে আজও তার অগণিত অনুসারী দেখতে পাওয়া যায়।[২]

২৮. বাবক খুররামী

বাবক খুররামীর অভ্যুদয় হয় খলীফা মামুনের রাজত্বকালে ২০১ হিজরী—মুতাবিক ৮১৬ ঈসায়ীতে। পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম পারস্যে সুদীর্ঘ বিশ বছর কাল পর্যন্ত সে এবং তার মাজুস অনুসারীরা ছিল এক বিরাট বিভীষিকা স্বরূপ। বাবকের ব্যক্তিগত জীবনচরিত সম্পর্কে 'ফিহিরিস্ত ইবনু নাদীম' নামক গ্রন্থে ওয়াকিদ বিন আমর আত্তামীমীর বর্ণনায় প্রকাশ যে, বাবকের পিতা আবদুল্লাহ ছিল মাদায়েনের একজন তেলী (তেলকিবা)। গ্রাম হতে গ্রামান্তরে সে তেল ফেরী করে বেড়াতো। আজারবায়জানের মায়মাদ গ্রামে দেশান্তর হওয়ার পর এক চক্ষুবিশিষ্ট অন্ধ নারীর প্রেমে পাগল হয়ে বিয়ে শাদীর পূর্বেই এই দুর্বৃত্ত অবৈধ যৌন মিলনে প্রবৃত্ত হয়। এই একান্ত অবৈধ ও অশুভ ক্ষণের সহবাস সংগমের কুফলরূপেই বাবকের জন্ম হয়। তার পিতা

১. দেখুন ঃ ইবনু খালদুন ঃ ৪র্থ খণ্ড; ইবনুল আসীর 'আল কামেল' ঃ ৮ম খণ্ড, মাসিক পত্রিকা 'নেদায়ে ইসলাম' ১৩৭৫ সাল অগ্রহায়ণ সংখ্যার বরাতে।

২. Dr. Zubaid Ahmad's Contribution of Indo-Pakistan to Arabic Lit. XIV Page.

আবদুল্লাহ ক দিন সাবলস পর্বত অভিমুখে যাত্রা করতে গিয়ে পশ্চাতের এক অজ্ঞাত আততায়ী কর্তৃক ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়। এই অজ্ঞাত আক্রমণই তার অকাল মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাবকের মাতা তাই নিরুপায় হয়ে এক বেতনভোগী ধাত্রী হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করতে থাকে।

দশ বছর বয়সে মেষ চরাতে চরাতে বাবক নাকি মাঠেই একদিন অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে। তার মা খুঁজতে গিয়ে ঘুমন্ত বাবকের দেহের প্রতিটি লোম ও মাথার চুলের গোড়ায় বিন্দু বিন্দু রক্ত দেখতে পায়। কিন্তু জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে আবার সব রক্ত কণিকা কোথাও যেন উধাও হয়ে যায়। বলতে কি, এই ঘটনার দরুনই তার মায়ের মনে বাবকের ভাবী জীবনের স্বর্গ সাফল্যের কথা বদ্ধমূল হয়ে যায়।

পার্বত্য এলাকার 'বুদ' কেল্লায় বাস করতো খুর্‌রামী মতাবলম্বী আবু ইমরান এবং জাভিদান নামক দুজন অতি প্রভাবশালী বিত্তশালী ব্যক্তি। 'খুর্‌রামী' শব্দের অর্থ হইল খুশী উপভোগ করা। তা যে কোন অবৈধ ও নিষিদ্ধ উপায়ে হোক না কেন। (ইবনুল আসীর: ৭ম খণ্ড, ১১১ পৃঃ) বস্তুত মাযদাকের প্রচলিত সমস্ত ধর্মীয় রীতিনীতি বিদ্যমান ছিল এই খুর্‌রামী মযহাবে। উপরন্তু মদ, জুয়া, ব্যভিচার কোন কিছুই এতে নিষিদ্ধ ছিল না। খুর্‌রামী মযহাবকে জাভিদানী ফিরকা নামেও অভিহিত করা হতো। কারণ জাভিদান নামক ব্যক্তিই ছিল এই ফিরকা বা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। 'জাভিদান' শব্দের প্রকৃত অর্থ আযালী বা অনন্ত অক্ষয়, (কিতাবুল কারাবাইনাল ফিরাক: ২৫১ পৃঃ) ব্যক্তিগত প্রাধান্য নিয়েই গ্রীষ্মের মৌসুমে জাভিদান ও তার প্রতিদ্বন্দ্বী আবু ইমরানের সংঘর্ষ বিবাদ প্রায়ই লেগে থাকতো। কিন্তু শীতকালে অতিরিক্ত বরফ পড়ার দরুন পরস্পরের এই বিবাদ-বিসম্বাদ সাময়িকভাবে বন্ধ থাকতো। এমন এক শীতের ঋতুতে জাভিদানকে একদিন বাণিজ্য ব্যাপদেশে বাবকের মাতার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। একান্ত অভাব হেতু ঘরে কোন আহার বা পানীয় না থাকায় শুধু মাত্র দীপশিখাটি জ্বালিয়ে দিয়েই বাবকের আম্মা মহামান্য অতিথির মেহমানদারী করেন। এখন জাভিদান অতি

সহজে তাদের সংসারের দারিদ্র্যের কথা মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারে। অবশেষে দয়াপরবশ হয়ে বাবককে সে মাসিক ৫০ দীনার হারে তার নিজস্ব কাজে নিয়োজিত করেন। এদিকে গ্রীষ্ম ঋতুর আগমনে জাভিদান ও আবু ইমরানের মাঝে আবার সেই পুরনো সংঘর্ষ শুরু হয়। পরিণামে উভয়েই আহত হয়ে প্রাণ হারায়। জাভিদানের স্ত্রী এখন পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে বাবককেই প্রাণ রক্ষাকর্তারূপে দাওয়াত দেয়। কারণ আগে থেকেই সে কুৎসিত বাবকের প্রতি ছিল পূর্ণমাত্রায় প্রেমাসক্তা। তাই অবিলম্বেই সে সমস্ত খুর্রামীদের ডেকে গুরু গম্ভীর স্বরে বললো : হে সমবেত সৈন্য-সামন্ত ও অনুসারীরা। তোমরা বিলক্ষণ জেনে রেখো যে, আমার মৃত স্বামী জাভিদান তাঁর অন্তিম মুহূর্তে অসিয়ত করে গেছেন বাবককে তোমাদের ত্রাণকর্তা আল্লাহ্ বলে স্বীকার করে নিতে। কারণ জাভিদানের মৃত্যুর পর তাঁর অমর আত্মা বাবকের নশ্বর দেহে প্রবেশ করে তাঁর আত্মার সাথে মিশে গেছে। বাবককে তাই আমি এখন স্বামীত্বে বরণ করছি। আর তোমরাও অনুরূপভাবে তার প্রতি তোমাদের অকৃত্রিম ও আন্তরিক আনুগত্য জানিয়ে প্রণিপাত করো। এই সসাগরা ধরিত্রী এখন বাবকেরই শাসনাধীন হবে। তিনি তোমাদের সঙ্গে নিয়ে দুনিয়ার সকল অত্যাচারী অনাচারীকে মিসমার করে আবার সেই অবলুপ্ত প্রায় মাযদাকী মযহাবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন। তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এখন তোমাদের সবাই হয়ে উঠবে বলীয়ান—মহীয়ান। আর চরম নীচ নিকৃষ্টরা পরম যশ গৌরব লাভ করবে।

এই তেজোদৃপ্ত ভাষণে চমৎকৃত হয়ে জাভিদানের সৈন্য-সামন্ত ও অনুসারীরা—সবাই আনন্দে উদ্বেল হয়ে বাবককে তাদের শ্রদ্ধাভরা অভিনন্দন ও ভক্তি অর্ঘ্যের পুষ্পাঞ্জলী নিবেদন করলো। এদিকে বাবকও তার ভাবী উন্নত জীবনের আশায় বুক বেঁধে সেই সোনালী সুপ্রভাতের প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

ফিহিরিস্ত ইবনে নাদীমের বর্ণনায় প্রকাশ যে, বাবক নিজেকে খোদা বলে একান্তভাবে দাবী করেছিল। সে একথাও ঘোষণা করেছিল যে, জাভিদানের আত্মা তার শরীরের সাথে একান্তভাবে মিশে গেছে। বর্ণিত বাবকের

এই দ্বিতীয় মতবাদ সম্পর্কে ইমাম তাবারীও একমত। সুতরাং এখন স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, শাহারাস্তানীর (ওফাত : ১১৫৩ ঈসায়ী) বর্ণনা হিসেবে গুলাত বা চরমপন্থী শিয়াদের চারটি মতবাদের নিম্নোক্ত তিনটি মতবাদেরই সমান অধিকারী :

১. 'হুলুল' অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার মানবদেহে আগমন।

২. 'তানাসুখুল আরওয়াহ' বা মৃত্যুর অব্যবহিত পর দেহ থেকে দেহান্তরে আত্মাসমূহের গমনাগমন।

৩. 'রিযা' অর্থাৎ পরলোকগত আত্মার মানবদেহে পুনরাগমন। বলা বাহুল্য, এই তিনটি মতবাদেরই সমন্বয় ঘটেছিল বাবকের মধ্যে।

বাবক একজন খালিস পারস্যবাসী ছিল কিনা এতে শক বা সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কারণ ফিহিরিস্ত ইবনে নাদীমের বর্ণনা অনুযায়ী বাবকের পিতার নাবাতীয় ভাষায় গান করার উল্লেখ পাওয়া যায়। দীনায়ারী বাবককে আবু মুসলিম খুরাসানীর মেয়ে ফাতিমার পুত্র মুতাহারের পুত্রদের একজন বলে উল্লেখ করেন। নিযামুল মুলক তাঁর 'সিয়াসতনামা' গ্রন্থে বলেন যে, খুররামিগণ তাদের গুপ্ত সভায় সর্বপ্রথম তাকে ইমাম বা ত্রাণকর্তা আবু মুসলিম খুরাসানী এবং পরে উপরিউক্ত ফাতিমার পুত্র ফিরোযের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তিধারা বর্ষণের জন্য দোয়া করতো। নিযামুল মুলক তাঁর 'সিয়াসত'নামায়' উক্ত ফিরোযকেই বাবকের আব্বা বলে অনুমান করেন।

বাবক প্রধানত তার মৃত অভিভাবক জাভিদানের ধ্বংসাত্মক মতবাদকে বিলুপ্তি ও বিস্মৃতির অতলতল হতে রক্ষা করে জগতের বুকে তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াস পায়। শুধু তাই নয়। ব্যাপক হত্যাকাণ্ড, রাহাজানি যুদ্ধ বিগ্রহ এবং নির্মম শাস্তিরও সে সংযোগ সাধন করে। সব সময় আরবীয়দের শাসনদণ্ড ও রাজত্বের প্রবল বিরোধিতা করার জন্য সে তার অনুসারীদের ইন্ধন যোগাতেও উত্তেজিত করতো। এমন কি মা, বোন, খালা, ফুফু, প্রভৃতি মুহরিম স্ত্রীদের সাথে বিয়ে-শাদী জায়েয এবং শরাবকে সুপেয় খাদ্য ও একান্ত পুণ্য কর্ম হিসেবে শুমার করতো। সুবিধাবাদীরা

এই সুযোগ পেয়ে দলে দলে তার ঝান্ডাতলে সমবেত হয়েছিল। ইরাক ও খুরাসানের মধ্যবর্তী স্থানগুলোতে যে সমস্ত বাণিজ্যিক ও মরু-চারী কাফেলা চলাফেরা করতো তাদের জানমালকে তারা অবাধে লুণ্ঠন করতো। তাছাড়া খুররামী নেতৃত্ব হাতে নেওয়ার পর সে আশেপাশের স্থায়ী বাসিন্দাদের উপর অতি নির্মমভাবে হামলা চালাতো। মুসলমান স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের বল পূর্বক ধরে নিয়ে গিয়ে মাযদাকী ধর্মের শিক্ষা দিতো আর গোলাম বা দাস বানাতো এবং অবলা নারীদের সতীত্ব নিয়ে ছিনিমিনি খেলতো। আজারবায়জান থেকে মাযানদারান পর্যন্ত আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা—সবাই তার আতংকে ছিল একান্ত অস্থির। সেই দুর্লংঘ দুর্গম পর্বত এলাকার যেখানে সেখানে সে এমন অসংখ্য ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গপথ তৈরী করেছিল যে, যখন যেখান দিয়ে ইচ্ছা করতো ঢুকে পড়তো এবং অন্য সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে অতর্কিতে হামলা করতো। তাকে পর্যুদস্ত করার জন্য আব্বাসী খলীফা মামুনের পক্ষ থেকে যখনই কোন খ্যাতনামা বীর সেনাপতিকে বিশাল বাহিনীসহ পাঠানো হয়েছে, তখনই পরাজয়ের কলংক ও গ্লানি নিয়ে তাদের ফিরে আসতে হয়েছে। এই উপর্যুপরি পরাজয়ের কারণ—'বুদ' নামক যে পাহাড়ী অঞ্চলে বাবকীদের বসবাস ছিল, সে এলাকাটা ছিল অত্যন্ত দুরতিক্রম্য। এর প্রতিটি পার্বত্য স্থান ও পথঘাট ছিল এত দূর দুর্গম, বন্ধুর ও কণ্টকাকীর্ণ যে, মুসলিম বাহিনীর সব চাইতে দূরদর্শী সিপাহসালারগণও সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় নিহত হয়েছেন। (ফুতুহুল বুলদান: বালাযুরী, পৃঃ ৪২৯—৪৩৬)

বাবকের শক্তি সাহস ও স্পর্ধা এতদূর বর্ধিত হয়েছিল যে, আব্বাসীয় বংশের অষ্টম খলীফা মুতাসিমের আমলে তুর্কিস্তান ও খুরাসানের অগণিত হাজীদের এক বিরাট কাফিলার সাথে আলীয়া ও রায়হানা নামক আব্বাসী ভদ্র মহিলাদ্বয় যখন সমরকন্দ থেকে বাগদাদ অভিমুখে সফর করছিলেন, তখন বাবকীদের কবল থেকে তারাও রক্ষা পান নি। মওলানা আবদুল হালীম শারার বলেন: বাবকের দল এই সম্ভ্রান্ত আব্বাসী মহিলাদ্বয়ের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠনের পর তাদের সতীত্বের অবমাননা করতে চাইলে তারা মুতাসিমের নাম নিয়ে উচ্চৈঃস্বরে ফরিয়াদ জানায়। সৌভাগ্যক্রমে এই

ফরিয়াদ ধ্বনি আববাসী মহিলা আলীয়ার মাধ্যমে মুতাসিম পর্যন্ত পৌঁছে যায়। (মওঃ আবদুল হালীম শারার কৃত বাবক খুর্‌রামী ঃ ১ম খন্ড—২৯ পৃঃ) এহেন ধৃষ্টতা দেখে মুতাসিমের গায়রাত চরমে ওঠে এবং রাগে অগ্নি-শর্মা হয়ে তিনি বাবকের উচিত শাস্তি বিধানের জন্য অচিরেই তাঁর খ্যাতনামা তুর্কী সেনাপতি আফশীন বিন হায়দার আশরাসিনাকে এক বিরাট বাহিনী-সহ প্রেরণ করেন। এই সুচতুর সমর কৌশলী ও বীর সেনাপতিকেও পূর্ণ একটি বছর লেগে যায় ধূর্ত বাবকের গতিবিধি লক্ষ্য করতে। অবশেষে ২২৩ হিজরী ৮৩৮–ঈসায়ীতে সেনাপতি আফশীন তাকে ছলে বলে ও কৌশলে পরাস্ত ও বন্দী করে সুররা-মান রা'য়ে খলীফা আল-মুতাসিমের কাছে প্রেরণ করেন। সেখানে তাকে 'আল-আকাবা' নামক স্থানে ক্রুশারোহণ করানোর পর তার ছিন্ন মস্তক খুরাসানে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তার ভাই আবদুল্লাহকেও অনুরূপভাবে বাগদাদে হত্যা করা হয়। এই ঘটনার প্রায় দু'বছর পর ৮৪১ ঈসায়ীয়ের সেপ্টেম্বর মাসে তাবারিস্তানের বিদ্রোহী নেতা মাযারারকে বাবক খুর্‌রামীর পাশে ফাঁসির যূপকাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

নিষ্ঠুর রক্তপিপাসু বাবক খুররামীর হাতে নির্মমভাবে নিহত লোকসংখ্যা ২৫৫,৫০০ বলে আল্লামা জারীর তাবারীর এক রেওয়ায়েতে প্রকাশ। কিন্তু মাসু'দীর মতে তাদের সংখ্যা ৫০০,০০০ (কিতাবুত-তান্‌বীহ ঃ ৩৫৩ পৃঃ)। তার মৃত প্রভু জাভিদানও তার প্রতিদ্বন্দ্বী আবু ইমরানের ন্যায় বাবকও কথিত সিয়াসতনামায় বর্ণিত মাযদাকীদের যথার্থবোধক আল-খুর্‌রামী বলা হতো। কিন্তু তার অনুচর খুর্‌রামীদেরকে সময় সময় মুহাম্মিরা বা লাল বেজধারী নামেও অভিহিত করা হতো।

২৯. মুহাম্মাদ বিন্ তুমারত আলাভী মাগরাবী

মুহাম্মাদ বিন্ তুমারত আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম খণ্ডে 'সুষ' নামক পাহাড়ী এলাকার বাসিন্দা। স্বীয় যুগে সে বেশ উঁচু দরের আলিম ছিল। তাই দলে দলে লোক এসে তাঁর মুরীদ হয়। এভাবে মুরীদের আধিক্য দেখে সে মাহদী হওয়ার দাবী করে। এই খবর শুনে তথাকার বাদশাহ যুদ্ধ করতে এলে সে পলায়নের চেষ্টা করে। কিন্তু ভক্ত মুরীদরা তাঁকে

এভাবে রণে ভংগ দিয়ে পলায়ন করতে বারণ করে। তখন সে ঝোপ বুঝে কোপ মারলেন। অর্থাৎ এই ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, পরিণামে তিনিই মুরীদানসহ জয়লাভ করবেন। কার্যত হলও তাই। তদানীন্তন বাদশাহ যুদ্ধে পরাজয় বরণ করলেন এবং তাঁর বিশাল সালতানাত মুহাম্মদ বিন তুমারতের করতলগত হয়ে গেল। অন্তিম শয্যায় বসে ইনি আবদুল মু'মিন নামক এক ব্যক্তিকে আমীরুল মুমিনীন উপাধিতে ভূষিত করে আর এক ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, এই আবদুল মুমিন উত্তরকালে বহু দেশ জয় করবে।

মুহাম্মদ বিন তুমারত প্রায় ১০ বছর ধরে ইমাম মাহদীরূপে বাদশাহী করেন এবং আবদুল মুমিন সুদীর্ঘ ৩৩ বছর ধরে মাহদীর খলীফা বা প্রতিনিধি এবং আমীরুল মুমিনীনরূপে রাজত্ব করার পর মৃত্যুবরণ করেন।

৩০° মির্যা আলী বাব এবং বাহাউল্লা

মির্যা আলী মুহাম্মদ ছিল সিরাজ নগরীর বাসিন্দা। সে নিজেকে বাবে ইলম (জ্ঞানের দ্বার) এবং নবী হওয়ার দাবী করে। সে 'খতম নুবুওতের' প্রতি আদৌ আস্থাবান ছিল না বরং পবিত্র কুরআনকে আল্লাহ্র শেষ আসমানী গ্রন্থরূপেও স্বীকার করত না।

১৮৫২ সালের কথা। ইরানের খুরাসান এলাকার এক উন্মুক্ত প্রান্তরে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসমাবেশে একটি মিম্বর স্থাপন করা হয়েছিল। সমবেত শ্রোতৃমন্ডলী নির্নিমেষ নয়নে তদানীন্তন ইমাম মির্যা আলি মুহাম্মদ বাবকের আগমন প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছিল। কারণ এতে সম্পূর্ণ এক নতুন ধর্ম সম্পর্কে নাকি সবাইকে অবহিত করাবে সম্যকরূপে।

মির্যা আলী মুহাম্মদ বাব গুরু গম্ভীর স্বরে এ কথা ঘোষণা করেছিল যে, নবীরূপে তার আত্মপ্রকাশ করার পর জগতের বুক থেকে শরীয়তে মুহাম্মদীর সকল আহকাম 'মনসুখ' বা বাতিল হয়ে গেছে। তিনি আরও প্রচার করেন যে, এই সসাগরা ধরিত্রীকে করতলগত করে অচিরেই তিনি এর একচ্ছত্র মালিক হবেন। তাঁর বিজয় গতিকে কেউ কোন দিন রোধ করে দাঁড়াতে পারবে না। এই সপ্ত আকলীম বা সারা বিশ্ব জাহানের প্রায়

সকলেই অবনত মস্তকে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করবে। দুনিয়ার বুকে এই যে বিভিন্ন মযহাব আর ফিরকা—এগুলো সবই অবলুপ্ত হয়ে যাবে। বাকী থাকবে শুধু একটাই দ্বীন বা মযহাব আর সেটা হবে এই বাবী মযহাব। এই মযহাবের শরীয়'ত বা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার এখনও আগমন সূচিত হয়নি। এর মাত্র কিছুটা অংশ বিকাশ লাভ করেছে আর বাকী অংশ অদূর ভবিষ্যতেই প্রকাশ পাবে। (বিস্তারিতের জন্য দেখুনঃ বাহাউল্লাহ ও মির্যা; মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী)

মির্যা আলী বাবের এক জবরদস্ত অনুসারীর নাম বাহাউল্লাহ। তিনি ছিলেন ইরানের এক প্রখ্যাত মন্ত্রীর ছেলে। তাঁর আব্বা শুধুমাত্র মন্ত্রীই ছিলেন না, বরং বেশ কিছুদিন ধরে শাহানশাহ ইরানের তিনি চীফ সেক্রেটারীও ছিলেন। মোটকথা, তিনি ছিলেন এক বিরাট সম্পদশালী আমীর। মির্যা আলী মুহাম্মদ বাবের শিক্ষা দীক্ষা সম্পর্কে কিছুটা পরিচিত হওয়ার পরই বাহাউল্লাহ তার নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে পড়লেন একেবারে অন্ধভাবেই। অবশ্য মির্যা আলী বাবের সহিত বাহাউল্লার জীবদ্দশায় একবারও দেখা সাক্ষাৎ ঘটেনি। তবে উভয়ের মাঝে উপর্যুপরি পত্রালাপ এবং ভাবের আদান-প্রদান হতো অবিরাম ধারায়। পরবর্তীকালে ইরানের এই বাহাউল্লাহ 'বাহায়ী মযহাবে'র প্রবর্তক এবং পুরজোশ আহবায়করূপে পরিচয় লাভ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি পরবর্তীকালে নুবুওতের দাবীও করেছিলেন বেশ জোরেশোরে। এভাবে এই প্রধান জাল নবী মির্যা আলী মুহাম্মদ বাব শুধুমাত্র বাহাউল্লাকেই তাঁর অনুসারী বা ছায়ানবী বানিয়েই যে ক্ষান্ত হয়েছে তা নয়, বরং তিনি আরও হাজার হাজার লোককে এভাবে ফিতনা জালে আবদ্ধ করে ফেলেছিলেন। তম্মধ্যে ছিল দিব্যকান্তি বিশিষ্ট এক পরমা সুন্দরী নারী। তাঁর নাম যারীন তাজ এবং লকব ছিল কুর্‌রাতুল আইন তাহিরা। তিনি ১৮১৯ সালে কাযভীনের এক সুদক্ষ আলিম হাজী মোল্লা সালেহর ঘরে পয়দা হয়েছিলেন। অত্যন্ত গোঁড়া পরিবারে পয়দা হওয়া সত্ত্বেও উচ্চ শিক্ষায় হয়তো তাঁকে অতি মাত্রায় স্বাধীনপ্রিয় করে তুলেছিল। অতি শৈশব থেকেই তাঁর উপযুক্ত শিক্ষার প্রতি বিশিষ্ট

নযর দেওয়া হয়েছিল। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি সমান পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন।

বাগদাদ নগরীতে অবস্থানকালীন বিদুষী তাহিরার সর্বোতমুখী বিদ্যাবত্তার প্রতি আলোকপাত করতে গিয়ে কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল এম. হিদায়েত হুসেন সাহেব বলেনঃ বাগদাদে বাবী মযহাবের তবলীগ করতে একদিন এই তাহিরা শিয়া উলামাদেরও মুবাহালার জন্য দাওয়াত দিয়ে বসলেন। বলা বাহুল্য, এই চ্যালেঞ্জের কথা শুনে স্থানীয় শিয়া উলামা আতংকে অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পেরে তদানীন্তন সরকার তাহিরাকে তাঁর সাথী-সঙ্গীসহ আল্লামা ইবনু আ'লুসী বাগদাদীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আল্লামা আলুসী তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তায় সত্যিই অত্যন্ত বিমুগ্ধ হয়েছিলেন। তাহিরা সম্পর্কে প্রিন্সিপাল এম. হিদায়েত হুসেনের এই প্রবন্ধের শিরোনামা হচ্ছে 'বাবী মযহাবের এক শহীদ নবী'।

বস্তুত তাহিরা ছিলেন সকল বিদ্যায় সমান পারদর্শী। কিন্তু মির্যা আলী বাবের মযহাবের প্রতি তিনি এতদূর অন্ধ বিশ্বাসী ছিলেন যে, অন্য কারো কথায় তিনি আদৌ কান দিলেন না। মারথা এল. রুট তাঁর 'Tahira The Pure' নামক গ্রন্থে তাহিরা সম্পর্কে বলেনঃ তাহিরা কুর্‌রাতুল আইনের প্রতিটি কথায় ছিল সম্মোহনী যাদুর প্রভাব, আর তাঁর সৌন্দর্য ছিল অনন্য ও অপরূপ। তাই অতি সহজেই লোকে তাঁর কথায় প্রভাবান্বিত হতো। তাঁর গলার সুমধুর স্বর শুনে সবাই সেদিকে সম্মোহিত ও আকৃষ্ট হতো।

কুর্‌রাতুল আইন তাহিরা তাঁর স্বভাবসুলভ সুমধুর স্বরে নিশিদিন বাবী মযহাবের তবলীগ চালাতেন অবিশ্রান্ত ধারায়। এই তবলীগের ব্যাপারে তিনি একরূপ পাগলপ্রায় হয়ে উঠেছিলেন। মওলানা আব্দুল হালীম শারার এবং অধ্যাপক খাজা মেহেরদাদ সাহেবও ইরানের এই তাহিরা সম্পর্কে মূল্যবান প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করেন। প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ

প্রফেসর জি. এডওয়ার্ড ব্রাউনও এই অস্ত্র দুঃসাহসিক মহিলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

মওলানা আবদুল হালীম শ্যারার এ সম্পর্কে বলেন: তাহিরা একাধারে মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছাড়া ফার্সী ভাষার একজন উঁচুদরের কবিও ছিলেন। তাঁর কবি-মানসের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে গিয়ে মওলানা শ্যারার বেশ কতকগুলো ফার্সী কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ডঃ ইকবাল অবশ্য এ অদ্ভুত মহিলার গুমরাহী এবং বিভ্রান্তির কথা শুনে দুঃখ করেছেন এবং বলেছেন যে, অযথা তিনি এই আলেয়ার পেছনে ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়েছেন। কিন্তু তৎসঙ্গে এই মহিলার ধর্মীয় উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে তিনি সত্যিই স্তম্ভিত হয়েছেন। তাই 'জাভিদনামায়' তিনি এভাবে এই মহিলার উল্লেখ করেন:

غالب وحلاج خاتون عجم * شورها افگند درجان حرم –

যাই হোক, এই তাহিরা কুররাতুল আইনের অন্তিম পরিণতি বা দুঃখময় মৃত্যু সম্পর্কে বেশ ইখতিলাফ রয়েছে।

মারথা এল. রুট এ সম্পর্কে বলেন: তাহিরাকে জীবন্ত হত্যা করার খবর যেদিন তদানীন্তন সরকার ঘোষণা করলেন, সে দিনটি ছিল ১৮৫২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর রোজ বুধবার। সেদিন অতি প্রত্যুষেই উঠে তাহিরা গোলাপের পানি দিয়ে গোসল করেছিলেন। সাদা ধবধবে কাপড় পরিধান করে তার উপর আতর গোলাপ লাগিয়েছিলেন। বাড়ীর সবার কাছে বিদায় নিতে গিয়ে তিনি হাসিমুখে বললেন: আমি আজ এক লম্বা সফর শুরু করছি, যার কোন আদি অন্ত নেই।

পরক্ষণেই কতিপয় সরকারী লোক তাঁকে বিশেষ এক অজুহাত দেখিয়ে বাগানে নিয়ে যান। সেখানে মদের নেশায় বিভোর এক হাবশী গোলাম তাঁর মুখে রুমাল ঠুঁসে গলা টিপে দেয়। তারপর এক অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে পাথর দ্বারা সেই কূপের মুখ বন্ধ করে দেয়। মওলানা আবদুল হালীম শ্যারার

বলেনঃ অনিন্দ্য সুন্দরী তাহিরার লম্বা লম্বা কুন্তল জালকে চতুর্দিক থেকে মুণ্ডন করা হয়েছিল। শুধুমাত্র মাঝের কিছুটা চুল রেখে দিয়ে তা' খচ্চরের লেজের সাথে বেঁধে দেয়া হয়েছিল। এভাবেই তাঁকে বিচারালয়ে হাযির করা হয়। কাযীর বিচারালয় থেকে যে ফয়সালা এসেছিল, সেটা ছিল তাঁকে জীবন্ত অবস্থায় আগুনে নিক্ষেপ করা। কিন্তু হত্যাকারীরা তাঁকে নাকি গলা টিপেই মেরেছিল। অতঃপর তার মৃত লাশকে আগুনে পোড়ানো হয়েছিল। (সিরাজ নিযামী কৃত 'কুর্‌রাতুল আইন তাহিরা' শীর্ষক প্রবন্ধঃ সাইয়্যারা ডাইজেস্ট—আগস্ট, ১৯৬৮ সাল, পৃষ্ঠা ৭৫)

৩১. মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ১৮৩৯ ঈসায়ীতে পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জিলার অন্তর্গত 'কাদিয়ান' গ্রামে জন্মগ্রহণ করে। শৈশবেই সে এক শিয়া আলিমের নিকট কিছু কিছু উর্দু ফার্সী ও আরবী শিক্ষা লাভ করে। অতঃপর 'ইল্‌মে তাসখীর' বা বশীকরণ বিদ্যা সম্পর্কেও সে কিছু দিন ধরে বেশ সাধ্য সাধনা করে। (তিরইয়াকুল কুলুবঃ পৃঃ ৬৮)

কৈশোর কাল থেকেই নবী হওয়ার স্বপ্ন-সাধ তার মনের গোপন গহনে দানা বেঁধে উঠেছিল। কিন্তু হঠাৎ করে এই 'নুবুওত'কে প্রচার করতে গেলে লোকে তা যে মাথা পেতে মেনে নেবে না, এই প্রত্যয় তার ছিল। তাছাড়া আরও নানা বাধা-বন্ধন হয়তো মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। তাই ধুরন্ধর মির্যা নুবুওতের মোহে হঠাৎ করে এক দিন তার শিয়ালকোট কাচারীর কেরানীগিরীতে ইস্তফা দিয়ে পীর-মুরীদীর সিলসিলা শুরু করে। তার মুরীদান সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলতে লাগলো। অতঃপর একদিন ফিরিঙ্গীদের সন্তুষ্টি সাধনার্থে সে গুরু-গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করলোঃ যীশুখৃস্ট-ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর কাশ্মীরে পলায়ন ও মৃত্যুবরণ করেন। সুতরাং এই ধরাধামে তাঁর প্রত্যাগমন আর সূচিত হবে না। অতএব সেই আগমনকারী ঈসা (আঃ) স্বয়ং আমিই।"

(ইযালাতুল আওহামঃ পৃষ্ঠা ১৮—১৯)

এমন কি হযরত ঈসার উপর স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম করতে গিয়ে সে বলে ঃ

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے

(দাফিউল বালা ঃ পৃঃ ২০)

ইসলামের সে কত বড় পরম শত্রু যে, মুসলমানদের অন্তরকোণ থেকে জিহাদী জোশ ও অনুপ্রেরণাকে চিরতরে নির্মূল করার জন্য এবং স্বীয় হীন স্বার্থসিদ্ধির খাতিরে সে বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখ বর্ণিত জিযিয়া সম্পর্কিত সুদীর্ঘ অকাট্য ও জাজ্বল্যমান হাদীসটিকে সম্পূর্ণরূপে বিকৃত ও উলট-পালট করতে একটুও কুণ্ঠাবোধ করেনি। জিযিয়া অর্থাৎ কর শব্দটির নুক্তাকে কেটে ছেঁটে সে হারাবাত অর্থাৎ যুদ্ধরূপে পরিবর্তিত করে।

(মিশকাত শরীফ ঃ নুযূলে ঈসা অধ্যায়, ১ম পরিচ্ছেদ)

একবার 'বারাহীনে আহমদিয়া' নামে একটা বই লিখে উহা প্রকাশনার্থে সে মুসলিম জনসমাজের কাছ থেকে চাঁদা চাইতে শুরু করল। ধর্মপ্রাণ মুসলিম ভাইয়েরা ধর্মীয় খিদমত হিসাবে সবার কাছ থেকে চাঁদা উঠিয়ে ছাপাবার ব্যবস্থা করে দিল। এভাবে কিছুটা আর্থিক সচ্ছলতা এলো এবং সে 'ইযালাতুল আওহাম', 'হাকীকাতুল ওয়াহী' প্রভৃতি পুস্তক ছাপিয়ে প্রচার করে যে, সে-ই হযরত ঈসা (আঃ) মাওউদ আর সে ইমাম মাহদী। অবশেষে ১৯০১ ঈসায়ীতে নিজের ও ভাবী বংশধরের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত নেতৃত্ব ও বিপুল অর্থলাভের চিরস্থায়ী উপায় উদ্ভাবন করতে গিয়ে সে নুবুওত ও রিসালাতের দাবী করে বসল বেশ গুরু-গম্ভীর স্বরে। (মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী কৃত মির্যা, দাস্তানে মির্যা ও 'চশমায়ে মারিফাত' হাকীকাতুল ওয়াহী ঃ পৃঃ ৩৯১ রিসালায়ে আনওয়ারে খিলাফাত পৃঃ ২৯৪)

মির্যা গোলাম কাদিয়ানী তার এই ভূয়া দাবী দাওয়াকে শুধু যে মুসলিম জনসমাজের মধ্যেই সীমিত রেখেছিল তা নয়, বরং হিন্দুদের জন্য নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ অবতাররূপে ঘোষণা করে। এভাবে সে আল্লাহ্‌র সরল

বিশ্বাসী বান্দাদেরকে ইসলামের সরল ও সঠিক সনাতন পথ থেকে বিভ্রান্ত ও বিচ্যুত করে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিল, কে তার সংবাদ রাখে?

(লেকচারে শিয়ালকোট : পৃঃ ৩৩)

مىں كبھى ادم كبھى موسى كبھى يعقوب ہوں
نيز ابراھيم ہوں نسليں ہيں ميرى بے شمار

(দুররে শামীম : পৃঃ ১০০)

منم مسيح زمان ومنم كليم خدا
منم محمد ﷺ واحمد كه مجتبى باشد

(তিরইয়াকুল কুলূব : পৃষ্ঠা ৩)

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর একটা মস্তবড় সুপরিচিত ও সর্ব-শেষ অস্ত্র ছিল তার ভবিষ্যদ্বাণী। যখন তখন এবং কথায় কথায় সে সুযোগ বুঝেই এই অমোঘ রূহানী অস্ত্রটি প্রয়োগ করত বীরদর্পে। এভাবেই সে দুর্বল ও সাধারণ ধর্মভীরু লোকদিগকে সন্ত্রস্ত ও প্রভাবিত করার ব্যর্থ প্রয়াস পেত। খৃষ্টান পাদরী আথামের সাথে মুনাযারা করতে গিয়ে সে ভবিষ্যদ্বাণী করল যে, ১১ মাসের মধ্যেই এই খৃষ্টান তার্কিক জাহান্নামে চলে যাবে নতুবা আমি ফাঁসির যূপকাষ্ঠে ঝুলতে রাযী। কিন্তু মিস্টার আথম এই নির্দিষ্ট মেয়াদ পেরিয়ে আরও প্রায় দু'বছর বেঁচে থেকে ১৮৯৬ ঈসায়ীতে মৃত্যুবরণ করেন। যার ফলে মির্যা গোলাম 'আঞ্জামে আথাম' লিখতে বাধ্য হয়।

(জংগে মুকাদ্দাস, পৃঃ ১৮৮)

অনুরূপভাবে 'শাহাদাতুল কুরআনে' মির্যা আহমাদ বেগ হুশিয়ার পুরীর জামাতা সুলতান মুহাম্মাদ সম্পর্কে সে আর এক ভবিষ্যদ্বাণী করে যে, আগামী ১১ মাসের মধ্যেই উক্ত সুলতান মুহাম্মদের ওফাত ঘটবে, আর তার বিধবা পত্নী মুহাম্মদী বেগমের সাথে স্বয়ং মির্যা সাহেবের নিকাহ ইতিপূর্বেই আসমানে পড়ানো হয়েছে।

(শাহাদাতুল কুরআন এবং আঞ্জামে আথামের হাশিয়া দ্রষ্টব্য)

কিন্তু নিকাহর এতো শখ আর এতো সাধ থাকা সত্ত্বেও সব কিছুকেই অপূর্ণ রেখে এই নশ্বর জগত থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করতে হ'ল। ভীষণ মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে ১৯০৮ ঈসায়ীর ২৬শে মে এই ছায়া নবীর অপমৃত্যু ঘটেছিল পায়খানার মধ্যে মলত্যাগ করা অবস্থায়।

فما زال سر الكفر بمن ضلوعه حتى اصطلى سر الزناد الوارى

(আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী কৃত মুশকিলাতু ক্বুরআন দ্রষ্টব্য)

মওলানা সানাউল্লাহ্ অমৃতসরী বলেন: নিকাহর খাহেশকে দূর করতে না পেরে মির্যা সাহেব সর্বপ্রথম তাঁর প্রথমা স্ত্রী ও দুই পুত্রকে চাপ দিয়েছিলেন মুহাম্মদী বেগমের সঙ্গে নিকাহর জন্য কথাবার্তা বলতে। কিন্তু সাধ করে কেউ কি আর সপত্নী ও সৎমা ডেকে আনতে পারে? তাই তার প্রথমা ও বৃদ্ধা স্ত্রী এবং পুত্রদ্বয় যখন কিছুতেই নিকাহর জন্য আলাপ-আলোচনা চালাতে রাযী হলো না, তখন মির্যা সাহেব রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে তার প্রথমা স্ত্রী ও পুত্রদ্বয়কে বয়কোট করল। শুধু তাই নয়, ১৮৯১ সালের ২রা মে লুধিয়ানা প্রেস থেকে এই মর্মে একটি ইশতিহার প্রকাশ করল যে, যেহেতু তার স্ত্রী ও পুত্রদ্বয় বেদ্বীন হয়ে গেছে, তাই সে এদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। অথচ আসল ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ অন্যরূপ।

মির্যা গোলামের সবচাইতে মারাত্মক ও জঘন্যতম আচরণ হচ্ছে এই যে, সে সুন্নী মুসলমানদের যেমন ঘৃণার চক্ষে দেখত, ঠিক তেমনি ইংরেজ সরকারের দাসত্বকে অত্যন্ত সুনযরে দেখত। অতএব সে ফতওয়া দিয়েছে: "আমার মুরীদদের জন্য, অন্য মুসলমানদের পিছনে নামায পড়া সম্পূর্ণরূপে হারাম।" (তুহফায়ে গুলড়ীয়াহ: পৃঃ ৮১ ও মির্যা বশীরুদ্দীন কৃত আন্ওয়ারে খিলাফাত: পৃঃ ৮৯) এই ফতওয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই কোন মুসলমানের ছেলে কাদিয়ানী হয়ে যাওয়ার পর তার মুসলমান পিতার জানাযা পড়ে না। শুধু তাই নয়, অল্প বয়স্ক মুসলিম সন্তানের জানাযা পড়াও নাজায়েয বলে মির্যা প্রকাশ্য ফতওয়া দিয়েছে। অনুরূপভাবে মুসলমানের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করাও সে নাজায়েয বলে ঘোষণা করেছে। (আনওয়ারে খিলাফাত: পৃষ্ঠা ৯৩—৯৪) মুসলিম আলিম সম্প্রদায় সম্পর্কে

সে বলে ঃ "এরা সবাই বড় রকমের মিথ্যুক এবং কুকুরের ন্যায় মিথ্যুকদের লাশ ভক্ষণ করে।" (যামীমা আঞ্জামে আথাম ঃ পৃঃ ২৫)

كل مسلم يقبلني ويصدق دعوتي الا ذرية البغايا –

প্রতিটি মুসলিমই আমার দাওয়াতকে কবুল করবে আর নবুওতকে-সত্য বলে জানবে, কিন্তু বেশ্যা ও বারবণিতাদের ছেলেরাই শুধু কবুল করবে না।

অর্থাৎ কিনা যারা তার নবুয়তকে মানবে না তারা সবাই হারামযাদা।
(আয়নায়ে কামালাত ঃ পৃঃ ৫৪৭)

সে আরও বলে ঃ দুনিয়ার বুকে সব চাইতে ঘৃণ্য ও নাপাক জন্তু হচ্ছে শূকর, কিন্তু এই মুসলিম আলিমরা শূকরের চাইতেও ঘৃণ্য ও অস্পৃশ্য (নাউযু বিল্লাহ)। (যামীমা আঞ্জামে আথাম ঃ পৃঃ ১২)

সে বলে ঃ আমার যারা বিরোধিতা করে তারা সবাই জঙ্গলী শূকর আর তাদের স্ত্রীগণ কুকুরীর চাইতেও নিকৃষ্টতর। (নাজমুল হুদা ঃ পৃঃ ১০)

এই উদ্ধৃতিগুলো থেকে আমরা অতি সহজেই অনুধাবন করতে পারি যে, এই জাল নবীর নৈতিক চরিত্র কতদূর নিম্নমানের ছিল।

এই তো গেলো মুসলমানদের সঙ্গে এই জাল নবীর অসভ্য ও কুরুচিপূর্ণ আচরণ। পক্ষান্তরে ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে তাঁর আচরণ সম্পূর্ণ উল্টো ধরনের। সে বহু জায়গায় ইংরেজ গোলামীর ফযীলত ও মহিমা কীর্তন করেছে পঞ্চমুখে। আর সে জিহাদ হারামের ফতওয়াও দিয়েছে ('আল-ফজল' ৭ জুলাই, ১৯৩২ ঈসায়ী) স্বীয় মুরীদদের সে এভাবে উপদেশ দেয় ঃ এই ইংরেজ জাতি তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র তরফ থেকে বরকত এবং ঢালস্বরূপ। এরা মুসলমানদের তুলনায় হাজার গুণে শ্রেষ্ঠ (তাবলীগে রিসালত ঃ ২য় খন্ড; পৃঃ ১২৩ এবং আরিয়া ধরম ঃ পৃঃ ৮১) অন্য এক জায়গায় সে ভক্তি গদ্‌গদ কণ্ঠে প্রচার করেছে ঃ 'আমরা যখন বৃটিশের তাবেদারী করি, তখন যেন আল্লাহরই ইবাদত করি। (শাহাদাতুল কুরআন ঃ পৃঃ ৩৪) উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, মির্যা ছিল সম্পূর্ণরূপে

ইংরেজপুষ্ট। তারাই তাকে দাঁড় করিয়েছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে। অবশ্য খৃীস্টান মিশন পাদ্রীরা মির্যা সাহেবকে খুব ভালোভাবেই জানতো। তাই একবার লুধিয়ানা থেকে প্রকাশিত 'নুর আফশা'-নামক পত্রিকায় মির্যার আসল স্বরূপকে উদঘাটিত করে তাঁকে মিথ্যাবাদী, দাংগাবাজ এবং নরহন্তা বলে অভিহিত করা হয়েছিল। আর সে নাকি স্বীয় কন্যার প্রতিও অসৎভাবে আসক্ত ছিল। (মূল ঃ তিরইয়াকুল কুলুব গ্রন্থের ৩ নং পরিশিষ্ট ঃ পৃঃ ৩০৮; অঃ মওদূদী সাহেবের কাদিয়ানী সমস্যা ঃ পৃঃ ৪৭) পাটিয়ালা রাজ্যের অধিবাসী ডাক্তার আবদুল হাকীম খান সুদীর্ঘ ২০ বছর যাবত মির্যার মুরীদ ছিলেন। তিনি মির্যার আপত্তিজনক কার্যকলাপ দেখে তার দল থেকে বেরিয়ে যান এবং তার বিরুদ্ধে রীতিমত কলমের অস্ত্র ধারণ করেন। অতঃপর উভয়ের মাঝে ইলহামী মুকাবিলা শুরু হয়। এই মুকাবিলার ফলশ্রুতি-স্বরূপ মির্যা ১৯০৮ ঈসায়ীর ২৬শে মে সকাল সাড়ে দশটায় কলেরা রোগে মারা যায় (বিস্তারিতের জন্য মওলানা সানাউল্লাহ মরহুমের 'তারীখে মির্যা' দ্রষ্টব্য)। তার মৃত্যুর খবর কাদিয়ানের 'আল-আহকাম' পত্রিকায় ১৯০৮ ঈসায়ীর ২৮শে মের বিশেষ ক্রোড়পত্রে বিঘোষিত হয়।

মির্যা মারাত্মক মতবাদ ও লেখনীর বিরুদ্ধে উপমহাদেশের যে সমস্ত ওলামায়ে কিরাম তর্ক-বিতর্ক ও মুবাহাসা মুবাহালা শুরু করেন তন্মধ্যে মরহুম মওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী সাহেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উভয়ের মাঝে যে সর্বশেষ মুবাহালা হয় তার বিজ্ঞাপন ছাপিয়েছিল স্বয়ং মির্যা ১৯০৭ ঈসায়ীর ১৫ ও ২৫ শে এপ্রিল বদর পত্রিকায়। উক্ত ইশতিহারে মির্যা বলে ঃ "আমার কাছে নিশীথ রাতে আল্লাহ্ পাকের ইলহাম বা ঐশী বাণী এসেছে। তিনি আমার মিনতি কবুল করেছেন। সুতরাং আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী সে সত্যবাদীর চোখের সামনে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হ'য়ে মৃত্যুবরণ করবে।" কার্যত হলোও তাই। মিথ্যার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ ঠিক নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই মির্যা ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু বরণ করল। আর মওলানা সানাউল্লাহ মরহুম এই ঘটনার ৪০ বছর পর অতি বৃদ্ধ বয়সে ১৯৪৮ ঈসায়ীর ২৫ শে মার্চ ইন্তিকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি...... রাজিউন।)

এই মুবাহাসা বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে ১৯১২ ঈসায়ীর এপ্রিল মাসে লুধিয়ানা জিলায় যে বিখ্যাত বাহাস অনুষ্ঠিত হয়। এই বাহাসের সালিসী বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন লুধিয়ানার গভর্নমেন্ট উকিল সর্দার বচন সিংহ। এ বাহাসে বিজয় লাভ করে মওলানা সানাউল্লাহ সাহেব ৩০০ টাকা পুরস্কার পান। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন ফতেহে কাদিয়ান)।

খৃীস্টান পাদরী মিস্টার আবদুল্লাহ আথামের মির্যা গোলামের মুবাহালা এবং অলীক পেশীনগুয়ী বা ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা মৃত্যুসংবাদ প্রচার করার ব্যর্থ প্রয়াসের কথা আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। তাই আর বিস্তারিতের দিকে না গিয়ে যদি মির্যার জঘন্য উক্তিগুলোর প্রতি আমরা একটু ধীর স্থিরচিত্তে লক্ষ্য করি, তবেই তার ভণ্ডামী ও ধাপ্পাবাজীর কথা আমাদের নয়নসমক্ষে ঠিক দিবালোকের ন্যায়ই সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। সে বলে ঃ

১। উচ্চতার সর্বোচ্চ সীমায় আমার পা।

(খুৎবা ইলহামিয়া ঃ পৃঃ ২৫)

২। সবার উচ্চে আমার তখ্‌ত স্থাপিত।

(হাকীকাতুল ওহী ঃ পৃঃ ৮৯)

৩। আমি স্বয়ং আল্লাহ্‌রূপে আসমানকে তারকাপুঞ্জ দ্বারা সুসজ্জিত করেছি। (আয়নায়ে কামালাত ঃ পৃঃ ৫৬৫)

৪। আরশের উপর আল্লাহ্‌ আমার প্রশংসা করে।

(আঞ্জামে আথাম ঃ পৃঃ ৫৫)

৫। আমাকে অমান্যকারীরা জারয বা হারামযাদা।

(আয়নায়ে কামালাত ঃ পৃঃ ৫৪)

৬। মৃতকে জিন্দা করবার ও যিন্দাকে মারবার শক্তি আমাকে দেওয়া হয়েছে। (খুৎবা ইলহামিয়া ঃ পৃঃ ২৩)

৭। আমার জন্যই বলা হয়েছে যে, মির্যা নিজের ইচ্ছায় কথা বলে না।

(৫০০ টাকা পুরস্কারের বিজ্ঞাপন)

৮। বিলক্ষণ জেনো যে, সব সময় আল্লাহ্‌র 'ফযল' আমার সাথে রয়েছে এবং আল্লাহর 'রূহ' আমার অন্তরে কথা বলে।

(আঞ্জামে আথাম ঃ পৃঃ ১৭২)

শ্রদ্ধেয় পাঠক, একটু স্থিরচিত্তে চিন্তা করে দেখুন! এত বাচালতা আর মিথ্যার পরও কি তাকে স্বীয় যুগের মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) এবং নবী বলে স্বীকার করা যেতে পারে ?

মোটকথা, মির্যা গোলাম আজীবন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে এতগুলো বই লিখেছে, সেগুলোর পত্রান্তরালে এমন সব অকেজো, অবান্তর ও আবোল তাবোল অকথ্য ভাষায় অশ্লীল গালি রয়েছে যে, একজন সুস্থির জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি সেগুলো পড়ে এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, অযথা সে কাগজ কলম নষ্ট করেছে, আরামকে হারাম করেছে, আর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ফলস্বরূপ প্রজ্বলিত নরককুণ্ডকে নিজের স্থায়ী আবাস-স্থল হিসেবে বেছে নিয়েছে। তার এই উক্তিগুলো শুনলে লোকে পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই বলবে না। আমরা এখানে এই নিরর্থক কথাগুলোর আরও কিছুটা নমুনা দিচ্ছি। সে বলে ঃ

১। হযরত ঈসার পিতা হচ্ছেন (মাআ'যাল্লাহ) ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) (রিসালা খাতমে নুবুওত ঃ ১ম খণ্ড; পৃঃ ২১ ও ইযালাতুল আওহাম ঃ পৃঃ ১৯৫)

২। আল্লাহ স্বয়ং আমার নাম রসূল রেখেছেন।

(আইয়্যামুস সুলহ ঃ পৃঃ ৭৫)

৩। ঈসা (আঃ) মদ্যপান (মাআ'যাল্লাহ) করতেন।

(কাশতীয়ে নূহ ঃ পৃঃ ৬৫)

৪। হযরত ঈসা (আঃ)-এর তিন দাদী ও নানী গণিকা ছিলেন।

(আঞ্জামে আথামের পরিশিষ্ট বা যামীমা ঃ পৃঃ ৭)

৫। হযরত ঈসা (আঃ) এক নম্বরের শারাবী, কাবাবী, আত্মশ্লাঘী আর খোদায়ীর দাবীদার।

(মাকতুবাতে আহমাদিয়া ঃ পৃঃ ২৩-২৪)

এই তো গেলো হযরত ঈসা সম্পর্কে মির্যা গোলামের কটূক্তি। ঠিক অনুরূপভাবেই তদীয় জননী হযরত মরিয়াম সম্বন্ধেও মির্যা অত্যন্ত অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করেছে।

(বিস্তারিতের জন্য দেখুন চশমায়ে মাসীহ ঃ পৃঃ ১৭-১৮)

১৯২৯ সালের ২৩শে ডিসেম্বর, রবিবারের এক সুন্দর সন্ধ্যায় পাঞ্জাবের ঝিলান নগরে মরহুম মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী সাধারণ সভায় এক জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিচ্ছিলেন যে—মির্যা গোলাম হযরত ঈসা (আঃ)-কে অবৈধ সন্তান এবং হযরত মরিয়মকে অসতী নারী বলে আখ্যায়িত করেছে। কথাটা সভাস্থ মির্যায়ীদের আদৌ প্রত্যয় হলো না। তাই তারা চৌধুরী সাদেক সাহেবের নেতৃত্বে তীব্রতর প্রতিবাদ জানালো। ঘটনাক্রমে সেখানে মির্যার 'আইয়্যামুস সুলহ' ও 'কাশতীয়ে নূহ' নামক বই দু'টোও পাওয়া গেল। সুতরাং মওলানা সাহেব সেই হাযিরান মজলিসে প্রথমোক্ত বইয়ের ৬৫ পৃষ্ঠা এবং শেষোক্ত বইয়ের ১৬ পৃষ্ঠা খুলে সবার চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, এই ভন্ড মিথ্যুক নবী কিরূপে সতী সাধ্বী হযরত মরিয়মের পবিত্র নামে কলংকের দাগ লাগিয়েছে। (১৯১৯ সালের জানুয়ারীতে অমৃতসর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক আহলে হাদীস ঃ পৃঃ ৫)

رسول قادیانی کی رسالت

جہالت ہے ! جہالت ہے !! جہالت !!!

এভাবে এই মিথ্যুক জাল নবী আরও কতো সৎলোকের অবমাননা আর কতো নিষ্কলংক চরিত্রকে মসীলিপ্ত করেছে, সত্যিই তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু একটি কথা এই যে, প্রত্যেক ফিরাউনের জন্য মূসা (আঃ) রয়েছেন। তাই মওলানা সানাউল্লাহ ছিলেন এই ভন্ড নবীর জন্য হযরত মূসা স্বরূপ। আরও একজন ছিলেন পাঞ্জাবের লুধিয়ানা জিলার মৌলবী সা'দুল্লাহ সাহেব, যিনি সব সময় মির্যা গোলামের প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করতেন। তাই একবার মির্যা তার চিরাচরিত ও মজ্জাগত অভ্যাস অনুযায়ী ভবিষ্যদ্বাণী করল যে, মৌলবী সা'দুল্লাহ অতি শীঘ্রই নিঃসন্তান

কিংবা প্লেগে মারা যাবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, মির্যা মিথ্যুক সাব্যস্ত হইল, তিনি মারা গেলেন সম্পূর্ণ আলাদা রোগে। মৌলভী সা'দুল্লাহর ঔরসে কোন ছেলে ছিল না। তাই মির্যা ইশতিহার দিল যে, মৌলভী সা'দুল্লাহর ইন্তেকালের পর তাঁর নাম নেয়ার জন্যও আর কেউ রইলো না। কিন্তু মির্যার একথাও মিথ্যা সাধিত করতে গিয়ে সা'দুল্লাহ সাহেবের এক নাতি মওলানা আবদুল কাবীর সাহেব মির্যায়ীদের পেছনে এমনভাবে উঠে পড়ে লাগলেন যে, প্রতিটি স্থানেই তাদের অতি শোচনীয়ভাবেই পর্যুদস্ত করে ছাড়লেন। (১৯২৬ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত 'আহলে হাদীস' পত্রিকাঃ পৃঃ ৮)

মির্যার মিথ্যা অপবাদ ও প্রবঞ্চনার এই সব অদ্ভুত দৃষ্টান্ত ও কাণ্ড-কীর্তি দেখে সত্যিই আশ্চর্য হতে হয়।

আগেই একথা উল্লেখ করেছি যে, সিরাজের মির্যা আলী বাব এবং ইরানের শেখ বাহাউল্লাহ যথাক্রমে বাবীয়া ও বাহাইয়া মযহাব কায়েম করেছিল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। এরা উভয়েই দাবী করেছিল যে, কুরআন আল্লাহ্‌র কিতাব এবং ইসলামও সত্য, কিন্তু তাদের আগমনে সেগুলো সব মানসুখ হয়ে গেছে। এই জাল নবীদ্বয় নবুওত ও রিসালতের দাবী করেছিল, কিন্তু অনুগামীরা তাদের বিভিন্ন নাম ধরেই ডাকতো। শেখ বাহাউল্লাহ দাবী করত যে, তার উপর একটা আসমানী কিতাবও নাকি নাযিল হয়েছে। (বিস্তারিতের জন্য দেখুনঃ কিতাবে আক্‌দাস, মওলানা সানাউল্লাহ কৃত রিসালা বাহাউল্লাহ আউর মির্যা এবং সানায়ী পকেট বুকঃ পৃষ্ঠা ৪৮)

মির্যা গোলাম স্বীয় নবুওতের অনুপ্রেরণা এই ইরানী ছায়া নবীর কাছ থেকে পেয়েছিল কিনা জানি না, তবে উভয়ের মাঝে বিভিন্ন দিক দিয়ে বহু সামঞ্জস্য রয়েছে।

মির্যা গোলামের ভণ্ডামী ও নির্জলা মিথ্যাবাদিতার আসল স্বরূপকে জানতে পেরে মুসলিম কওম যখন একেবারে ক্ষেপে উঠলো এবং তার বিরুদ্ধে শত শত পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ ও পত্র-পত্রিকায় গরম গরম প্রবন্ধ

বেরুতে লাগলো তখন তা দেখে লাহোরের একদল পরিণামদর্শী লোক মনে মনে প্রমাদ গুণল। এ দলের নেতৃত্ব হাতে নিলেন মওলানা মুহাম্মদ আলী এম. এল. এল. বি. এবং খাজা কামালউদ্দীন। তারা অবিলম্বে তাদের প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে বেশ জোরশোর দিয়ে একথা প্রচার করতে শুরু করল যে, মির্যা আদৌ নবুওতের দাবী করেনি। বরং সে দাবী করেছিল চতুর্দশ শতকের মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) হওয়ার। শুধু তাই নয়, মির্যা গোলামের সব কদর্যতা, অশ্লীলতা ও বাচালতার প্রতি তারা একটা শালীনতা ও নম্রতার প্রলেপ পেশ করতে প্রয়াস পেয়েছে। আমরা এক বিস্তৃত বিবরণ, উদাহরণ ও উপমাসহ অন্যত্র তাহা পেশ করবো (ইনশাআল্লাহ)।

আগেই বলেছি যে, এই ভণ্ড প্রবর্তক প্রথম দিন থেকেই স্পষ্টত বুঝতে পেরেছিল, মুসলিম কওমের সাথে সংঘর্ষ একদিন তার বাধবেই। তাই ইংরেজের গোলামী ও আনুগত্য নতশিরে মেনে নিয়ে তাদের করুণা দৃষ্টি আকর্ষণ ও স্বীয় শক্তিকে মজবুত করতে প্রয়াস পেয়েছে। পক্ষান্তরে ইংরেজ সরকারও মির্যায়ীদেরকে বড় বড় সরকারী চাকুরীতে বহাল করে মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট কোটা থেকে একটা বিরাট অংশ অপহরণ করে তাদেরকে দিয়ে এসেছে। শুধু চাকুরী কেন? জমি-জমা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কন্ট্রাক্টের বেলায়ও এই নীতি একইভাবে অনুসৃত হয়েছে। এভাবে মুসলমানদের হাতেই পরিপুষ্ট হয়ে মুসলিম কওমের অভ্যন্তরে সম্পূর্ণ একটা স্বতন্ত্র ও বিরোধী দল তথা কাদিয়ানী মতবাদ অতি মারাত্মক ক্যান্সারের ন্যায় মুসলিম সমাজদেহের মর্মমূলে তীব্র বিষ ছড়াচ্ছে। এর ফলশ্রুতি হিসেবে মুসলিম পরিবারে আজ চরম বিশৃংখলাও সর্বনাশ দেখা দিয়েছে। স্যার জাফরুল্লা খান প্রমুখের প্রচেষ্টায় এই বিষফোঁড়া আরও ভীষণ আকার ধারণ করেছে এবং এভাবে এই কাদিয়ানীরা বেলুচিস্তান দখল করে পাকিস্তানের বুকে একটা স্বতন্ত্র সরকার গঠনেরও প্রচেষ্টা নিয়েছে। বর্তমান কাদিয়ানী মুসলিম সমস্যাদি অত্যন্ত জটিল এবং এর সমাধানেরও রয়েছে একটা আশু প্রয়োজন। এই জটিল সমস্যার সব চাইতে মারাত্মক

রূপ এই যে, একদিকে তো কাদিয়ানীরা আজ অবাধে মুসলিম বেশে মুসলিম সমাজেরই অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে বিষ ছড়াচ্ছে আর অন্যদিকে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করে তাদের দল ভারী করছে। মহাকবি ইকবাল মরহুম আজ থেকে বহুদিন পূর্বেই এর সুষ্ঠু সমাধান দিতে গিয়ে বলেছেন: "কাদিয়ানীদেরকে মুসলিম সমাজ থেকে আলাদা করে একটি স্বতন্ত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে আইনত স্বীকৃতি দেওয়া হোক।" (মওলানা মওদূদী কৃত কাদিয়ানী সমস্যা: পৃ: ৬৮)

ডঃ ইকবাল মির্যা গোলাম সম্পর্কে আরও বলেন:

وہ نبوت ہے مسلمان کیلئے برگ حشیش
جس میں نہیں قوت وشوکت کا پیغام

যে নবুওতে জাতীয় শক্তি ও প্রভাব প্রতিপত্তির প্রেরণা নেই, সে নবীর নবুওত শুষ্ক তৃণ সদৃশ।

محکوم کے الہام سے اللہ بچائے
غارتگر اقوام ہے وہ صورت چنگیز -

পরাধীন নবীর ইলহাম থেকে আল্লাহ্ বাঁচায়। কারণ সে নবী জাতিসমূহকে ধ্বংসকারী চেংগিজস্বরূপ।

মোটকথা, এই মিথ্যুক ভণ্ড নবী ইসলামের অখণ্ডতা ও সংহতির মধ্যে ভাংগন সৃষ্টি করে ইসলামের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করেছে। মুসলমানদের অন্তঃস্থিত ঈমানের দৃঢ়তাকে শিথিল করেছে এবং সংশয় ও সন্দেহের নাগরদোলায় আজ দুর্বলচেতা মুসলিম সমাজের চিত্তকে শক ও সন্দেহে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। মুসলিম সুধী সমাজও অবশ্য তার ভণ্ডামীর দাঁতভাঙ্গা জওয়াব দিয়েছেন এবং তার বিভ্রান্তিকর কদর্যপূর্ণ উক্তিগুলোকে জনসমক্ষে তুলে ধরে বিভিন্ন ভাষায় বহু পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেছেন। আমরা এখানে সেগুলোর একটা তালিকা দিচ্ছি।

১। 'আল কাদিয়ানীয়াতু সাওরাতুন আলান-নুবুওতে ওয়াল ইসলাম ঃ সাঈদ আবু হাসান নদভী তাঁর এই অনবদ্য কিতাবটি আরবীতে লিপিবদ্ধ করে প্রথমে উপমহাদেশ ও পরে কাহিরা থেকে ১৩৭৫ হিজরীতে প্রকাশ করেন। তাঁর লিখিত এ সম্পর্কে অপর একটি পুস্তক হিন্দুস্তান থেকে ১৩৭৮ হিজরীতে প্রকাশ পেয়েছে। এর ইংরেজী সংস্করণ ছেপেছে আশরাফ পাবলিকেশন লাহোর থেকে।

২। (ক) আরবী ভাষায় মওলানা মওদুদী কৃত আল-বায়ানাত ফী আর রাদ্দি আ'লা কাদিয়ানীহ।

(খ) উর্দু ভাষায় তা'র রচিত 'কাদিয়ানী মাস্আল' নামক পুস্তকটি বাংলায় অনুদিত হ'য়ে ইসলামিক পাবলিকেশন, ঢাকা থেকে কয়েকবার প্রকাশ পেয়েছে।

৩। মুহাম্মদ লোকমান সিদ্দীক কৃত হা'কীকাতুল কাদিয়ানীয়া'। এটি আরবী ভাষায় ১৩৭৫ হিজরীতে কাহিরা থেকে প্রকাশ পেয়েছে।

৪। হা'দিয়াতুল মাহদিয়ীন ফী আয়াতি খাতিমিন নাবিয়্যিন'। এটি আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন মওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব।

৫। ইক্ফারুল মুলহিদীন ফী জরুরিয়াতিদ্ দীন'। আল্লামা মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী সাহেবের আরবী ভাষায় রচিত এই পুস্তকটি ১৩৫০ হিজরীতে উপমহাদেশ থেকে প্রকাশ পেয়েছিল।

৬। শাহ কাশ্মীরী সাহেব বিরচিত অপর একটি আরবী কিতাবের নাম 'সাদউন্ নিকাব আ'ন জাস্সাসাতিল পাঞ্জাব আল-কাদিয়ানী'। এটি উপমহাদেশ থেকে ১৩৪৩ হিজরীতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল।

৭। শায়খুল কুল আল্লামা মুহাম্মদ নাযীর হুসাইন দেহলভী (মিঞা-সাহেব) বিরচিত 'রিসালাহ ফী আর-রাদ্দি আলাল কাদিয়ানীয়াহ'।

৮। আল্লামা কাযী হুসাইন বিন মুহসিন আনসারী কৃত 'ফাতহুর রাব্বানী ফী আর রাদ্দি আলাল কাদিয়ানী'।

৯। শায়খ মুহাম্মদ বাশীর সাহসওয়ানী কৃত 'হাক্কুস সারীহ ফী ইস্বাতি হায়াতিল মাসীহ'।

১০। 'ইলাউল হাক্কিস সারীহ বি-তাকযীবি মাসিলিল মাসীহ'। এটি রচনা করেছেন শায়খ মুহাম্মদ ইসমাঈল আল-কওলী (বিস্তারিতের জন্য দেখুনঃ হাশিয়াহ আওনুল মা'বুদ ঃ ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৪০৬)।

১১। শাম দেশীয় পন্ডিত আল্লামা শায়খ হুসাইন মুহাম্মদ খালিদী কৃত 'আন্ নিস শাফ্‌ভীয়াহ ফী রাদ্দি আলাল কাদিয়ানীয়াহ'। এটি দামেশক থেকে ১৩৭২ হিজরীতে প্রকাশিত।

১২। 'সিহামুন-নাযাল ফী রাদ্দিয যালাল'। এটি আল্লামা শায়খ হুসাইন সেই ভন্ড নবীর 'হাকাইকি আহমাদীয়া নামক অতি কদর্যপূর্ণ পুস্তকের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে গিয়ে প্রণয়ন করেছিলেন। ১৩৪৬ হিজরীতে আলেপ্পো (হোলাব) নগরী থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩। আল'-উসুস-আস-সিয়াসিয়া লিল হারাকাতিল কাদিনীয়াহ' দক্ষিণ আফ্রিকায় 'দরবা' নগরীর অধিবাসী জনাব সাইয়েদ আব্বাসী এই পুস্তকটি ইংরেজী থেকে আরবীতে ভাষান্তরিত করে দিমাশক নগরী থেকে ১৩৭৭ হিজরীতে প্রকাশ করেন।

১৪। 'সাইফে রাব্বানী ফী উনুকিল কাদিয়ানী'। শায়খ জামীল শাত্তী এটিকে ১৩৫০ হিজরীতে লিপিবদ্ধ করে দামেশক থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন।

১৫। শায়খ উমার মুলতানী কৃত 'ইংরেজ এবং কাদিয়ানী'।

১৬। আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ হাশিম খাতীব দামেশক কৃত 'আল-বুরহানুল মুবীন ফী তাঈদে ফাতওয়া মুফতিয়ীন'।

১৭। আল্লামা মুহাম্মদ আবু যার নিযামী আইউবী (হিমস) কৃত 'ফাসলুল খিসাম ফী রাদ্দি আলা কাশফিল লিসাম।'

১৮। শায়খ মুহাম্মদ সঈদ আল জাবাভী কৃত 'হুজ্জাতুল ওজদান আলা জামাআ'তে কাদিয়ান (দামেশক, ১৩৬৭ হিঃ)।

১৯। শায়খ মুহাম্মদ ইলিয়াস বরনী কৃত 'কাদিয়ানী মাযহাব'।

২০। আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী কৃত 'আশ শিহাব লি রাজমিল খাতিফিল মুরতাব'।

২১। আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ বাদরে আলম মীরাঠী কৃত 'আলহি-ওয়ারুল ফাসীহ লি মুনকিরি হায়াতিল মাসীহ' (এটি ইং-রেজীতেও ভাষান্তরিত হয়েছে।)

২২। আল্লামা খালীল আহমদ সাহারানপুরী কৃত 'আশারাতুল কামি-লাহ ফী ইবতালিল মিরযাঈয়া ওয়াল নুবুওতিল বাতিলাহ'।

২৩। মওলানা মীর ইবরাহীম শিয়ালকোটী বিরচিত ঃ

(ক) 'শাহাদাতুল কুরআন' দুই খণ্ডে সমাপ্ত।

(খ) 'ফায়সালায়ে রাব্বানী'।

(গ) 'আয়নায়ে কাদিয়ানী' (যামীমা বা পরিশিষ্ট সহকারে)।

(ঘ) 'রেহলাতে কাদিয়ানী' অর্থাৎ মির্যা গোলাম কাদিয়ানীর অতি শোচনীয় অকাল মৃত্যু।

(ঙ) খোলা চিঠি এবং এই সম্বন্ধীয় আরও অন্যান্য রিসালা।

২৪। মুঙ্গের জিলার মুখসুসপুর নামক স্থানের এক প্রকাশনা থেকে কাদিয়ানীদের প্রকৃত অবস্থা ও তথ্য সম্বলিত বহু পুস্তক-পুস্তিকা উর্দু ভাষায় রচিত হয়েছে। তন্মধ্যে মওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী সাহেবের 'ফয়সালায়ে আসমানী' নামক তিন খণ্ডে সমাপ্ত বইটি অন্যতম। পশ্চিম বঙ্গের মালদহ আঞ্জুমানে মুহাম্মদীয়া কর্তৃক এটি বাংলায় ভাষান্তরিত হয়েছে।

২৫। মওলানা হাবীব আহমেদ সাহেব কীরানভী কৃত 'ইযহারুল বুত-লান লি দাওয়ায়ে মাসীহে কাদিয়ান।

২৬। কাদিয়ানী তৎপরতাকে যিনি সবচাইতে বেশী বানচাল করে-ছিলেন এবং যাঁর সাথে মুবাহালা হয়ে এই জাল নবীকে অকাল মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল, তিনি হচ্ছেন যুগ প্রবর্তক আলিম শেরে পাঞ্জাব আল্লামা আবুল অফা সানাউল্লাহ অমৃতসরী।

তিনি যে এই জাল নবীর বিরুদ্ধে শুধুমাত্র মুবাহালা করেই ক্ষান্ত হয়েছেন তা নয়, বরং বারবার বাহাস মুবাহালা ও মুকা-বেলা এবং জীবনভর নিরলস সংগ্রাম করেছেন। একনাই মুসলিম সুন্নী সমাজ তাঁকে 'ফাতেহে কাদিয়ান' বা কাদিয়ান বিজয়ী বীরপুরুষ নামে আখ্যায়িত করেন। মির্যা গোলামের ভণ্ডামী সম্পর্কে তার নিম্নলিখিত বইগুলো বেশ প্রণিধানযোগ্য।

(ক) ইলহামাতে মির্যা, (খ) ফায়সালায়ে মির্যা, (গ) ইলমে কালামে মির্যা, (ঘ) তা'লিমাতে মির্যা, (ঙ) ফাতেহে কাদিয়ান, (চ) বাহাউল্লাহ ও মির্যা।

২৭। দিনাজপুরের কৃতি সন্তান মওলানা আবু হেলাল মুহাম্মদ রুইসু-দ্দিন সাহেব (মৌলভী ফাযিল) ও এ সম্পর্কে দু'টো বই লিখে-ছেন। একটি 'ইযহারে হাকীকাত', অপরটি 'আখেরী ফয়সালা।' এছাড়া তাঁর কাছে এ সম্পর্কে আরও পাণ্ডুলিপি রয়েছে।

গ্রীক দর্শনের কুফল

জ্ঞান নুবুওতের এই যে একটা ব্যাপক ব্যাধি, এটাকে পরবর্তী পর্যায়ে গ্রীক দর্শনেরও ফলশ্রুতি হিসেবে ধরে নেয়া যেতে পারে। আব্বাসীয় যুগে এই গ্রীক দার্শনিকদের ধ্যান-ধারণা ও ঐতিহ্যসমূহ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে মুসলমানদের মাঝে সংক্রামিত হ'য়ে পড়ে। ফলে ধর্মীয় ফিতনা-ফাসাদ ও বিপর্যয়ের বিষময় ফলস্বরূপ ইসলাম জগতে উদ্ভব ঘটে মু'তাযিলা ফির্কার। গ্রীক দর্শনের ভিত্তি যেহেতু ছিল ইলহাদ ও কুফর, সেই আল্লাহ্‌কে নির্গুণ করাও ছিল সেই দার্শনিকদের একটা প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। এদের পূর্বসূরি এরিস্টটলের দর্শনই ছিল আল্লাহ্-দ্রোহিতা ও পৌত্তলিকতার নামান্তর। তাই সেই যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী আবু মা'শার বালখী এই দার্শনিকদের বিরোধিতা করতে গিয়ে তাঁদের কোপ-দৃষ্টিতে নিপতিত হলেন। আল্লাহ্‌র বাণী কুরআন পাক মাখলুক—সৃষ্ট না অসৃষ্ট—এটাও ছিল এই গ্রীক দর্শনের আর একটা গুমরাহী। এ নিয়ে আরও একজন যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে তাদের নির্মম অত্যাচার তিলে তিলে নীরবে সহ্য করতে হলো। অথচ আমাদের কাছে কুরআন পাকের শব্দসম্ভার যেমন আল্লাহ্‌র শাশ্বত বাণী, এর ভাব ও তাৎপর্যও ঠিক তেমনি আল্লাহ্ পাকের নিজস্ব। এতে মানুষের কোনই কীর্তি নেই। এখানেই নিহিত রয়েছে কুরআনের 'ই'জায' বা অলৌকিকতা। সুতরাং এই একান্ত স্বাভাবিক কথাটা স্বীকার করতে পারলেই সব সমস্যার সমাধান মিলে যায়।

মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্নমুখী বিস্তার লাভের সাথে সাথে মুসলমানগণ সংস্পর্শে আসলেন এমন সব বিজাতির, যাদের নিজস্ব ধর্ম ছিল, সংস্কৃতিও ছিল। এদের সাথে তাই মুসলমানদের প্রায়ই ধর্মীয় ও দার্শনিক

বিতর্ক অনুষ্ঠিত হত। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এঁদের বাহাস মুবা-হাসার প্রধান বিষয়বস্তু হত কুরআনের 'ই'জায'-এর চিরন্তন চ্যালেঞ্জ আর এই চিরন্তন দাবী যে, ইহা একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই নাযিল হয়েছে, নবী মুস্তফা (সঃ)-এর নিজস্ব শব্দ এতে একটিও নেই।

ইরাকের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উপনিবেশ বস্‌রা ও কুফায় যে সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক রেনেসাঁর প্রবর্তন হয়েছিল, এতে সর্বদলীয় সুধী-বৃন্দের মাঝে ধর্মগত, ভাষাগত, রাষ্ট্রগত ও সমাজগত ব্যাপার নিয়ে দৈনন্দিন বিতর্কগুলো এতদূর প্রসার লাভ করে যে, অল্পদিনের মধ্যেই এই মহানগরদ্বয় সরগরম হয়ে উঠে। পবিত্র কুরআনের চিরন্তন 'ই'জায'ও ছিল সুধী মজলিসের প্রধান প্রতিপাদ্য ও আলোচ্য বিষয়।

খুলাফায়ে রাশেদীন ও বনু উমাইয়া যুগে স্বাধীন মতবাদ ও চিন্তাধারার প্রসার লাভ ছিল বহুল পরিমাণে নিষিদ্ধ। ধর্মীয় ব্যাপার নিয়ে তদানীন্তন সমালোচক ও সন্দেহবাদীদের জীবনের কোন নিরাপত্তাই ছিল না। ইহাও প্রণিধানযোগ্য যে, কুরআনকে কেন্দ্র করে সর্বপ্রথম সমালোচনা শুরু হয় মহানবী (সঃ)-এর জীবদ্দশায় এবং তা' অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে হযরত আবু বকরের খিলাফতের প্রথম ভাগ পর্যন্ত। 'লুবাইদ ইবনুল আসাম' নামক জনৈক য়াহুদী বলেছিলো: 'বাইবেলের ন্যায় কুরআনও নাকি মানুষের তৈরী।' তার ভাগে তালুত এই মতবাদকে মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করে অতি ব্যাপকভাবে এবং বানান সম্প্রদায়ের নেতা 'বানা ইবনু সামান' এই মতবাদকে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাসও করে নেয়।

কথিত আছে যে, উমাইয়া বংশীয় শেষ খলীফা মারওয়ান হিমার বিন মুহাম্মদের শিক্ষাগুরু 'আল-জা'দ-ইবনু দিরহামও এই মত পোষণ করতো। জা'দ-বিন্-দিরহাম ছিল মস্তবড় একজন নাস্তিক। তাই সে সর্বপ্রথম কুরআনের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে এর বিষয়বস্তুকে সর্বতোভাবে অস্বীকার করতে চেয়েছিলো। শুধু তাই নয়, এই লোকটি পবিত্র কুরআনকে মানব-সৃষ্ট বলে দাবী করেছিলো যে, কুরআনের অলৌকিকতা বলতে কিছুই নেই, যে কোন লোকই এর সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে। এর চাইতে

পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে যে, এই উমাইয়া বংশীয়দের রাজধানী দামেশক নগরীতে প্রকাশ্যভাবে কুরআনের অবাধ সমালোচনা চলতো এবং শেষ খলীফা মারওয়ান ইবনু মুহাম্মদ স্বয়ং নাকি 'আল-জা'দ বিন ইবরাহিমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এই সমালোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। এ কারণেই তাঁকে 'মারওয়ান আল-জা'দী' ন্যায়ত আখ্যা দেয়া হয়। এতে করে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, স্বাধীন চিন্তাধারা প্রকাশে কোনরূপ প্রতিবন্ধকই ছিল না সে যুগে এবং এই বাক-কলহের স্বাধীনতা শুধু যে মুসলিম ও অমুসলিমদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, বরং তা মুসলমানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেও ছিল সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত, অবারিত। মুসলমানরা এই সমস্ত বিতর্ক সভায় কুরআনের বিভিন্ন ব্যাখ্যার প্রতি নির্ভর ও ভিত্তি করেই তাঁদের মতামত প্রকাশ করতেন।

ইসলামী খিলাফত উমাইয়াদের কাছ থেকে আব্বাসীদের হাতে হস্তান্তর হওয়ার পর থেকেই মুসলমানরা বিজাতীয়দের আরও গাঢ় সংস্পর্শে এসে পড়েন। রাজনীতি ছাড়া ধর্মীয় ও অন্যান্য ব্যাপারে আব্বাসীয় খলীফাগণ ছিলেন অত্যন্ত নিরপেক্ষ এবং উদারচেতা। এ'দের দ্বিতীয় খলীফা মানসুর তাঁর রাজত্বকালে আরব সাহিত্যিক ও অনুবাদ-শিল্পীদের এক অপূর্ব অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। তাই অতি অল্পদিনের মধ্যেই গ্রীস, পারস্য ও ভারতীয় সাহিত্যের সাথে আরবদের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এভাবে তাঁদের মাঝে একটা সম্পূর্ণ স্বাধীন মনোবৃত্তিও সৃষ্টি হয়। এমনকি ধর্মীয় ব্যাপার নিয়েও এ যুগে সম্পূর্ণ স্বাধীন চিন্তাধারা ও স্বাধীন চিন্তাবিদদের একটা বিশিষ্ট দল গঠিত হয়। এ'দের মধ্যে হিজরীর দ্বিতীয় শতকে ইবনুল মুকাফ্ফা (মৃত্যু ৭৬০ খৃঃ; ১৪২ হিঃ) বাশ্শার বিন বুরদ (মৃত্যু ১৬৭ হিঃ) সালেহ বিন আবদুল কুদ্দুস (মৃত্যু ৭৮৩ খৃঃ) আবদুল হামিদ বিন ইয়াহিয়া আল কাতিব প্রমুখ প্রখ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ও নেতৃস্থানীয়। এ'রা প্রায়ই কুরআনের সমালোচনার্থে সম্মিলিত হতেন এবং এর অনুরূপ বিষয়বস্তু ও স্টাইল সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চালাতেন।

কথিত আছে যে, হিজরীর পঞ্চম শতক পর্যন্ত এভাবে বহু কবি ও সাহিত্যিক কুরআনের মুকাবিলা করতে গিয়ে কতবার কত কৃত্রিম কুরআন তৈরী করার চেষ্টা নিয়েছেন এবং হিমসিম খেয়েছেন—কে তার সংবাদ রেখেছে? হতে পারে কুরআনের সাথে প্রতিযোগিতা করা সম্পর্কে কতকগুলো লোকের নামে এভাবে একটা মিথ্যা মনগড়া অপবাদ দেয়া হয়েছে; আর প্রকৃত প্রস্তাবে কতিপয় বিশিষ্ট লোকের বদনাম করার উদ্দেশ্য নিয়েই এই উপাখ্যানের সৃষ্টি। যা-ই হোক, এই জাল কুরআন সৃষ্টি করার অপরাধে সত্যই হোক, আর মনগড়াভাবেই হোক, পূর্বোক্ত কবি ও সাহিত্যিক ছাড়া আরও যাঁরা যাঁরা বদনাম কুড়িয়েছেন তাঁদের নাম হচ্ছে যথাক্রমে—আল-মুতানাব্বী (মৃত্যু ৩৫৪ হিঃ; ৯৬৫ খৃঃ) আবুল-আলা আল-মাআওরী (মৃত্যু ৪৪৯ হিঃ; ১০৫৭ খৃঃ) এবং ইবনু সীনা (মৃত্যু ৪২৮ হিঃ)। কথিত আছে, যখন তাঁরা নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, এ চেষ্টা তাঁদের কোনদিনই বাস্তবায়িত হবার নয়, তখন তাঁরা বাধ্য হয়েই একে পরিহার করলেন

আব্বাসীয় যুগে খলীফা মামুন রশীদের রাজত্বকালে কুরআন সম্বন্ধে অনুরূপভাবে স্বাধীন সমালোচনা ও মতবাদ প্রকাশে আদৌ কোন বাধা-বিপত্তি ছিল না। অমুসলিম পণ্ডিতরাও সে যুগে এতদূর স্বাধীনতা-প্রাপ্ত হয়েছিলেন যে, ধর্মীয় ব্যাপার, কুরআন মজীদ তথা নবুওতে মুহাম্মদী সম্বন্ধে দ্বিধাহীন চিত্তে যে কোন অভিমত পেশ করতেন। এতে রাজকীয় নিষেধাজ্ঞা বলতে কিছুই ছিল না। খলীফা মামুন স্বয়ং তাঁর অমাত্যবর্গ পরিবেষ্টিত প্রকাশ্য দরবারে এই ধর্ম-সম্বন্ধীয় বাক-স্বাধীনতায় বিপুল উৎসাহ প্রদান করতেন। এভাবে খালকে কুরআনের মাসলা' নিয়ে এক তুমুল বাকবিতণ্ডা ও মতদ্বৈধতার সৃষ্টি হয়—যার পরিণামস্বরূপ মহামতি ইমাম ইবনু হাম্বলকে (মৃত্যু ২৪১ হিঃ) প্রকাশ্য রাজপথে অসহনীয় যাতনা ভোগ ও কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হতে হয়। এই প্রতিক্রিয়ারই সরাসরি প্রতিফলন হয় ইজায শাস্ত্রের উপর এবং মুসলিমরাও তাই কুরআনের গুণাগুণ সম্পর্কে নানারূপ সন্দেহ পোষণ এবং কৃত্রিম কুরআন সৃষ্টির ব্যর্থ প্রয়াস—বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। নবী মুস্তফা

(সঃ)-এর যুগে হয় এর জন্ম এবং খুলাফায়ে রাশেদীন ও বনু উমাইয়ার যুগ পর্যন্তও থেকে যায় এর কিছুটা জের বা অস্তিত্ব। কিন্তু একথা সত্য যে, প্রকাশ্যভাবে তা প্রচার করতে পর্যন্ত কেউ কোনদিন সাহস করেনি। পক্ষান্তরে আব্বাসীয় যুগে মামুনের রাজত্বকালে অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, আবদুল্লাহ বিন ইসমাইল আল-হাশিমী নামীয় মামুনেরই জনৈক দরবারী, তাঁর খৃষ্টান বন্ধু আবদুল মাসীহ ইবনু ইসহাক আল-কিন্দিকে পত্র লিখেন ইসলামের অনুপম আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এ ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে। এ প্রসঙ্গে উক্ত পত্রে তিনি খৃষ্ট ধর্মের অসারতা তথা ইঞ্জিলের বিকৃতি এবং তৎসঙ্গে কুরআনের ই'জায শাস্ত্রের প্রতিও যথেষ্ট আলোকপাত করেন। কথিত আছে যে, আবদুল মাসীহ ঈসায়ী এই পত্রের উত্তর দেন অতি বিস্তারিত ও আক্রমণাত্মকভাবে। এতে তিনি আবদুল্লাহ হাশিমীর প্রতিটি কথাকেই রদ করার চেষ্টা করেন। শুধু তাই নয়, তিনি এতে কুরআনের ই'জায, তার সংকলন, সংযোজন এবং ভাবধারা ও রচনারীতির প্রতিও দোষারোপ করে তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি আরও বলেনঃ "কুরআন সম্পূর্ণভাবে মানব তৈরী; সুতরাং এতে অনুপম সাহিত্য বলতে কিছুই নেই।"

অনন্তর ই'জাযুল কুরআনের মর্মকথায় দুটো বিপরীতার্থক ধারা সংযোজিত হয়। একটি হচ্ছে মুসলিম চিন্তাবিদদের তরফ থেকে আর অপরটি ইসলামের পরম শত্রু বিধর্মীদের পক্ষ থেকে। আব্বাসীয় যুগে এই প্রথম দলটির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মু'তাযিলা সম্প্রদায় এবং রাজশক্তির সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতা পূর্ণ মাত্রায় প্রাপ্ত হ'য়ে তারা বেশ বলবৎ হয়ে ওঠে।

ইসলামের অজ্ঞাতশত্রুদের মুকাবিলা করতে গিয়ে হিজরী দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে এই মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের হাতে ও কলমে ই'জাযুল কুরআনের রক্ষণাবেক্ষণকল্পে মুতাকাল্লিমুন ও মুফাসসিরুন (Theologians

and exegetists)—এই উভয় দলই অনুরূপ পদ্ধতিতে মু'তাযিলাদের পদাঙ্কানুসরণ করেন।

দুঃখের বিষয়, মু'তাযিলা সম্প্রদায় পরবর্তীকালে নিশিদিন ব্যাপৃত হয়ে পড়ে কুরআন সৃষ্ট না অসৃষ্ট—এই সমস্যা নিয়েই। ফলে কুরআনের ই'জাযও তাদের মতবাদের একটা প্রধান অঙ্গ হ'য়ে দাঁড়ায়। এদের মধ্যে যাঁরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে ই'জায শাস্ত্রকে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তাদের নাম হচ্ছে:

১। আল-নায্যাম (মৃত্যু ৮৪৫ খৃঃ)

২। ঈসা বিন-সুবাইহ আল মিযদার (মৃত্যু ৮৫০ খৃঃ)

৩। আবু উসমান আল জাহিয (মৃত্যু ২৫৫ হিঃ—৮৬৯ খৃঃ)

পরিতাপের বিষয় আল-জাহিয প্রণীত 'নিয়ামুল কুরআন' নামক অনুপম গ্রন্থটির বর্তমান জগতে কোন সন্ধান মেলে না। মু'তাযিলা মতবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে গিয়ে আল-জাহিযের যেখানে পদস্খলন হয়েছে তার তীব্র সমালোচনা করে ইমাম বাকিল্লানী একটা বই লিখেছেন। এর নাম 'নাকদু ফুনুস লিল জাহিয'। আব্বাসী খলীফা আল মুতাওয়াক্কিল যখন খিলাফতের তখতে সমাসীন হলেন (৮৪৭ খৃঃ), তখন তাঁর এক আশ্রিত সমসাময়িক ব্যক্তি আলী বিন রাব্বাস আত্‌তাবারী এই 'ই'জাযের' প্রশ্নকে কেন্দ্র করে 'কিতাবুদ-দীন ওয়াদ দাউলাহ' (The Book of Religion and State) নামে একখানা অনুপম গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এর মুখবন্ধে তিনি বল্লেন যে, খলীফা মুতাওয়াক্কিল এই পুস্তক প্রণয়নে তাঁকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত এবং যথেষ্ট সহায়তা করেন। নবুওতে মুহাম্মদীর (সঃ) প্রমাণ সম্পর্কেও তিনি বেশ জোর গলায় এতে বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং বিশেষভাবে এর সপ্তম পরিচ্ছেদে তিনি বলেন: "কুরআনের 'মু'জিযা'ই হচ্ছে নবুওতে মুহাম্মদীর (সঃ) একমাত্র জ্বলন্ত প্রমাণ।" এ সম্পর্কে অকাট্য প্রমাণাদি পেশ করতে গিয়ে তিনি আরও বলেন: "অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে যে, 'ই'জাযের' মত এত গুরুত্বপূর্ণ

সমস্যার সমাধানকল্পে ইতিপূর্বে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য লিখিত প্রচেষ্টা চালানো হয়নি। অথচ সমস্ত মুসলিম সন্তান কুরআন পাকের 'মু'জিযাকে' কোন প্রমাণপঞ্জী ব্যতিরেকেই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে।" আবুল হাসান আল আশআরীও (মৃত্যু ৯১৪ খৃীঃ) এই বিষয়বস্তুর উপর কলম ধরেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এ সম্পর্কে তাঁর লিখিত 'মাকলাতুল ইসলামীন' (Islamic Treaties) ছাড়া আর কোন পুস্তকের অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না।

এ সম্পর্কে আরও অন্যান্য লেখকদের নাম হচ্ছে ঃ

১। মুহাম্মদ বিন্ ইয়াযীদ আল ওয়াসেতী (মৃত্যু ৯১৪ খৃীঃ)

২। আলী বিন্ ঈসা আর রুম্মানী (মৃত্যু ৯৯৪ খৃীঃ)

৩। আহ্মদ ইব্নু মুহাম্মাদ আল খাত্তাবী (মৃত্যু ৯৯৮ খৃীঃ)

৪। আবু বাকর মুহাম্মাদ আল বাকিল্লানী (মৃত্যু ১০১২ খৃীঃ)।

৫। মুহাম্মাদ বিন্ ইয়াহিয়া ইবনু সুরাকাহ (মৃত্যু ১০১৯ খৃীঃ)।

৬। আস্ শারীফ মুরতাযা (মৃত্যু ১০৪৪ খৃীঃ)

৭। আবু ইসহাক আল উস্তাইহ্ (মৃত্যু ১০১৭ খৃীঃ)।

এই শেষোক্ত গ্রন্থকারের অমর গ্রন্থের নাম হচ্ছে 'আল জামেউল জালিয়াহ ওয়াল খাফিয়াহ ফী উসূলিদ দীন ফী রাদ্দি আ'লাল মুলাহিদীন' —The Encyclopaedia of the clear and unclear in the principles of Religion for answering those who doubt.

৮। ইমাম আলী ইবনু হাযাম (মৃত্যু ১০৬৪ খৃীঃ) কৃত 'আল ফিসাল ফিল মিলালি ওয়ান নিহাল।

৯। ইমাম গায্যালী (মৃত্যু ১১১১ খৃীঃ) কৃত আল ই'ক্তিসাদ ফিল্ ই'তিকাদ।

১০। কাযী আইয়ায (মৃত্যু ১১৪৯ খৃীঃ) কৃত আশ শিফা ফী তা'রীফে হুকুকিল মুস্তাফা।

প্রকৃতপক্ষে ইহা নবী মুস্তফারই (সঃ) এক অনুপম জীবনীগ্রন্থ কিন্তু এর প্রথম অধ্যায়ে 'ই'জায' সম্পর্কেও অতি সুন্দর ও সার্থক বর্ণনা রয়েছে।

ইল্‌মে কালামে 'ই'জাযে'র প্রমাণপঞ্জী

ইল্‌মে কালামের (Islamic dogmatic theology) প্রবর্তন এ চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিলো আব্বাসী যুগের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই। ইসলাম, নবুওত ও আল্লাহ্‌ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করাই ছিলো এর প্রধান লক্ষ্য ও কার্যক্রম। মুসলিম মুতাকাল্লিমুন বা ইল্‌মে কালাম বিশারদরা অকুন্ঠ চিত্তে একথা স্বীকার করেছেন যে, পবিত্র কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী। দ্বিতীয়ত, তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, প্রত্যাদিষ্ট এই অমর বাণী হচ্ছে একটা চিরন্তন 'মু'জিযা'। কারণ প্রত্যেক পয়গাম্বরই ছিলেন কোন না কোন বিশেষ 'মু'জিযার ধারক'। মুসলিম মুতাকাল্লিমরা সব চাইতে গুরুত্ব আরোপ করেছেন এ কথার প্রতি যে, পবিত্র কুরআন বিভিন্ন ক্ষেত্রে কতবার আরবদেরকে স্পষ্টাক্ষরে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে এর মুকাবিলা করার জন্য; কিন্তু কেউ কোনদিনই এ চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে পারে নি। যদি কেউ জবাব দিতে পারতো, তা'হলে তার পরবর্তী যুগে পৃথিবীর সাহিত্য ভান্ডারে নিশ্চয়ই তা খুঁজে পাওয়া যেতো। যেমনভাবে ইসলাম-পূর্ব যুগের কবিতা ও অন্যান্য অতুল সাহিত্যশৈলী লোকপরম্পরায় অপূর্ব স্মৃতিশক্তির মাধ্যমে অবিকৃতরূপে চলে আসছে যুগের পর যুগ ধরে। হয়তো কেউ মনে করতে পারে যে, কুরআনের চ্যালেঞ্জের জবাব দেয়া হয়েছিলো তারই অনুরূপ ভাষায়; কিন্তু মুসলমানরা তা' দাবিয়ে রেখেছে। কিন্তু এ ধারণা যে সম্পূর্ণ অলীক ও ভিত্তিহীন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে এই যে, মুসলমানদের প্রবল শত্রুরা কোনদিনই তা গোপন রাখতে দিতো না। তাছাড়া পৃথিবীর বুকে সেই কৃত্রিম কুরআনের অস্তিত্ব রয়ে গেলে আজ আসল কুরআনের প্রতি মুসলমানদের অটল বিশ্বাস ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসতো আর ইসলামের প্রতি তাদের আনুগত্যও তেমন আর গাঢ় হয়ে থাকতো না। কিন্তু জগতের প্রতিটি মুসলিম অন্তর দিয়ে সব সময় একথা বিশ্বাস করে যে, কুরআন হাকীমের মুকাবিলা মনুষ্যশক্তির

সম্পূর্ণ বহির্ভূত। মুসলিম মুতাকাল্লিমরা তাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আরবরা যখন তাদের এত সাহিত্যিক উন্নতি ও [illegible] উৎকর্ষ থাকা সত্ত্বেও কুরআনের চ্যালেঞ্জের উত্তর দিতে সক্ষম হয়নি, তখন অনারবদের দ্বারা কস্মিনকালেও তা' সম্ভবপর ছিল না।

আল-বাকিল্লানী

কুরআনের ই'জায ও তার ইতিবৃত্তের পশ্চাতে সম্ভবত আল বাকিল্লানীর দান রয়েছে সবচাইতে বেশী। তাঁর অমর গ্রন্থ 'ই'জাযুল কুরআন' এদিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক। এর পরবর্তী গ্রন্থসমূহে এ নিয়ে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম তিনি এতে বর্ণনা করেছেন।[১] পরবর্তী লেখকরাও তাদের নিজ নিজ গ্রন্থে বাকিল্লানীর এই গ্রন্থের উপর ভিত্তি করেছেন সব চাইতে বেশী। বাকিল্লানীর মৃত্যুর পর ইজাযের সমস্ত মতবাদ একটা পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে এবং পরবর্তী লেখকরা এই বিষয়বস্তুর উপর পূর্ববর্তীদেরই পদাংক অনুসরণ করেন। দার্শনিকরা তাই ই'জাযের প্রশ্নে নতুন কোন প্রমাণপঞ্জী হাযির করতে সক্ষম হয়নি। বরং তাদেরকে এই ব্যাপারে সেই পুরাতন লেখক ও দার্শনিকদের মতামতগুলো বহু কষ্টে সংগ্রহ করতে হয়েছে এবং এ সম্পর্কে যে সমস্ত অভিনব প্রমাণপঞ্জীর উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোও যথাযথরূপে উপস্থিত করতে হয়েছে। প্রখ্যাত দার্শনিক আল-মাওআর্দী তাই ই'জাযের প্রমাণে যে ২০টি পয়েন্টের উল্লেখ করেছেন, তার একটাও আধুনিক বা মৌলিক নয়।

---

১. আল-বাকিল্লানীর এই পুস্তকে যে কবিতা অধ্যায় রয়েছে, তার ইংরেজী অনুবাদ করেছেন Gustave E. von Grunebaum। এই অনুবাদ ১৯৫০ সালে চিকাগো ইউনিভার্সিটি প্রেসে 'A Tenth Century Document of Arabic Literary Theory and Criticism' নামে মুদ্রিত হয়েছে। এই ইংরেজী অনুবাদ থেকে বাংলায় তরজমা করেছেন বাংলা একাডেমীর সৌজন্যে জনাব ফজলুর রহমান সাহেব।

এরপর থেকে মুসলিম দার্শনিকরা ই'জাযের প্রশ্নে যা কিছু লিপিবদ্ধ করেছেন—তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, অমুসলিম লেখকরা এই বিষয়বস্তুর উপর প্রচণ্ড আঘাত হানতে গিয়ে যে সব অবান্তর প্রশ্নের অবতারণা করেছেন—তারই দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে তাঁরা প্রয়াস পেয়েছেন।

স্বনামখ্যাত দার্শনিক আবুল হাসান আবদুল জব্বার আল-আসাদাবাদী (মৃত্যু ৪১৫ হিঃ—১০২৩ খ্রীঃ) এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে একটা সম্পূর্ণ গ্রন্থ 'তানযীহুল কুরআন আনিল-মাতায়েন' (The Acquittal of the Quran from Accusation) নামে প্রণয়ন করেছেন উক্ত গ্রন্থটি কায়রো থেকে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। আবদুল জব্বারের ছাত্র জীবন অতিবাহিত হয়েছে আসাদাবাদ (আফগানিস্তান), হামাদান এবং বাগদাদে। ইমাম ফাখরুদ্দীন রাযী (মৃঃ ৬০৬ হিঃ) প্রমুখ মনীষী তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তাফসীর কাবীরের প্রণয়নে রয়েছে আবদুল জব্বারের পরোক্ষ দান।

ইবনু জারীর ও হাসান আলকুম্মী

খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে 'ই'জাযের' উপর যে সমস্ত বই লেখা হয়েছে, তাদের অধিকাংশই আজ ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলীন হয়ে গেছে। শুধুমাত্র তাদের নাম অবশিষ্ট রয়েছে। নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে 'ই'জায' শাস্ত্রের আলোচনা চরম উৎকর্ষ লাভ করে। এ সময়ে এ বিষয়বস্তুর উপর যতগুলো গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে তন্মধ্যে বোধ করি মুহাম্মদ বিন জারীর আত-তাবারীর (মৃত্যু ৩১০ হিঃ—৯২২ খ্রীঃ) ৩০ খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থই হচ্ছে অন্যতম। এই মহা গুরুত্বপূর্ণ তাফসীরে পবিত্র কুরআনের বিশদ ব্যাখ্যা তো করেছেনই, তাছাড়া সেই যুগের প্রচলিত মতবাদগুলোর মধ্যে একটিকেও বাদ দেন নি তিনি। পরবর্তী যুগে এ ধরনের গ্রন্থের জন্য এটিই হচ্ছে একমাত্র নির্ভরযোগ্য মৌলিক অবদান। উক্ত তাফসীরে তিনি সূরাতুল বাকারার ২৩, ২৫ নম্বর আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'ই'জাযুল কুরআন সম্পর্কে সুবিস্তৃত জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন।

ইমাম তাবারীর পর 'ই'জাযে'র সুবিস্তৃত ময়দানে আবির্ভূত হন হাসান ইবনু মুহাম্মদ আলকুম্মী (মৃত্যু ৯৮৮ খৃীঃ)। তিনি ই'জাযুল কুরআনের উপর বই লিখেন বটে, কিন্তু তাঁর লেখার ধরন ও স্টাইল তাঁর পূর্ববর্তী লেখক ও তাফসীরবিদ ইমাম তাবারীর মত নয়। বরং তিনি এই আলোচনায় প্রধানত মুতাকাল্লিমিনদের পন্থানুসরণ করতঃ ইলমে কালামের পরিভাষাকে সম্পূর্ণভাবে অবলম্বন করেন। একজন পুরাপুরি দার্শনিক ও তাফসীরবিদ—এই দু'য়ের অপূর্ব সমাবেশ ছিল তাঁর মাঝে। এজন্যই সম্ভবত তিনি উভয়বিধ গুণের সংমিশ্রণে বই লিখতে সক্ষম হয়েছেন। পরবর্তী লেখকরাও তাবারীকে একরূপ পরিহার করে কুম্মীর স্টাইলকে অবলম্বন করেছিলেন। তাই তাফসীরুল কুরআন বা ই'জাযুল কুরআনের উপর কোন কিছু লিখতে গিয়ে সে লেখার মধ্যে স্বভাবতই এই দর্শনশাস্ত্রের দুরূহ ও জটিল পরিভাষাগুলো তাঁদের নিজেদের অজ্ঞাতসারে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু এতে করে আসল উদ্দেশ্যটাই বাদ পড়ে গেছে।

এরপর থেকে কুরআনের ভাষাগত সৌন্দর্য বিচার ই'জাযের একটা প্রধান অঙ্গ হলেও কুরআনের ভাষাশৈলীর তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার উর্ধ্বে কখনও তা' ওঠেনি।

আত-তাবারী ও কুম্মীর পরে 'ই'জায' শাস্ত্রের আলোচনায় যে সমস্ত মনীষী আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন তাঁদের নাম হচ্ছে ঃ

১। রাগিব ইস্পাহানী (মৃত্যু ১১০৮ খৃীঃ)।

২। জারুল্লাহ আয্-যামাখশারী (মৃত্যু ৫৩৮ হিঃ—১১৪৪ খৃীঃ)। তাঁর তাফ্সীরের নাম 'আল-কাশ্শাফ আন হাকাইকিন্তানখীল'।

৩। ইবনু আতীয়াহ আল-গারনাতী (মৃত্যু ১১৪৭ খৃীঃ)।

৪ ইমাম ফাখরুদ্দীন আর রাযী (মৃত্যু ১২০৯ খৃীঃ)।

৫। বদরুদ্দীন আয্-যারকাশী (মৃত্যু ১৩৯১ খৃীঃ)

৬। ইবনু কামাল পাশা (মৃত্যু ১৫৩৩ খৃীঃ)।

৭। আবু আস্ সাউদ (মৃত্যু ১৫৭৪ খৃীঃ) লিখিত পুস্তক 'আল

ইরশাদুল আকলিস-সালিম'। (Guidance for the sound mind)

৮। আল আলূসী (মৃত্যু ১৭৫৩ খৃঃ) তাঁর তাফসীর 'রূহুল মাআনী'।

৯। মুহাম্মদ রাশীদ রিযা (মৃত্যু ১৯৩৫ খৃঃ) তাফসীরুল মানার।

১০। আল্লামা তানতাভী জাওয়াহিরী (মৃত্যু ১৯৪০ খৃঃ) 'জাওয়াহিরুল কুরআন'।

হিজরী দ্বিতীয় শতকে 'ই'জায'

যেহেতু কুরআনের ভাবধারা ও ধ্যান-ধারণা এবং আরবী ভাষার ফাসাহাত ও বালাগাতের মধ্যে একটা গাঢ় সম্বন্ধ রয়েছে, তাই অনেক সময় এই 'ই'জায' শব্দটি কুরআনের ভাষার অলংকার ও বাগ্মিতা অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কারণ এই বালাগাত শাস্ত্রটির উৎপত্তি সম্পৃক্ত রয়েছে শুধু কুরআনের সাথে। পরবর্তী যুগের মনীষীরা এই শাস্ত্রকে আরও বিশিষ্ট পর্যায়ে উন্নীত করেন এবং তা করতে গিয়ে তাঁরা মু'তাযিলা, মুতাকাল্লিম, মুফাসসির এবং সাহিত্যিক—এই চারটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু চারটি গ্রুপকে কস্মিনকালেও কোন পৃথক এবং পরস্পর-বিরোধী সংঘর্ষশীল দলে বিভক্ত বলা যেতে পারে না। কারণ ইতিপূর্বে আমরা 'ই'জাযের লেখক হিসেবে যতগুলো মনীষীর নামোল্লেখ করেছি—তাঁদের প্রায় সবারই মাঝে আমরা সাধারণত একাধিক গ্রুপের বিভিন্নমুখী গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের অপূর্ব সমাবেশ দেখতে পাই। যেমন আল-জাহিয মু'তাযিলী দলের বিশিষ্ট নেতা হওয়া সত্ত্বেও একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ছিলেন। অনুরূপভাবে যামাখশারী ছিলেন একাধারে মু'তাযিলী, মুতাকাল্লিম এবং মুফাসসির।

অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারি যে, 'ই'জায' শাস্ত্রকে কেন্দ্র করে প্রথমে লেখনী হাতে নিয়েছেন মুতাকাল্লিমরা। তার পর মুফাসসিরূন ও মু'তাযিলুন। এমন কি অলংকার শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, ভাষাবিজ্ঞ সাহিত্যিকরাও এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে আদৌ কার্পণ্য

করেন নি। বলা বাহুল্য, এই শেষোক্ত দলের হাতে আলোচনাটা হ'য়ে উঠেছে সুন্দর ও সার্থক।

এক্ষণে আমরা ঐ সমস্ত যুগ প্রবর্তক পণ্ডিতদের কথা উল্লেখ করবো যাঁরা এই শাস্ত্রকে উত্তমরূপে অধ্যয়ন করে এর অগাধ সলিলে অবগাহন করতে সক্ষম হয়েছেন এবং এর উপর কাজও করেছেন যথাযথরূপে। এর সাথে আমরা একথাও জানতে প্রয়াস পাবো যে, তাঁরা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারা হিসেবে উপরিউক্ত চারটি দলের মধ্যে কোন দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং ইতিহাসের কোন সময়টিতে তাঁরা বাস করে গেছেন।

দ্বিতীয় শতক হিজরী

সে যুগের 'ই'জায' শাস্ত্রের উপর তেমন কিছুই লিখিত রেকর্ড আমাদের ঐ যুগে পরিদৃষ্ট হয় না। এর অর্থ এ নয় যে, সে যুগে এই বিষয়বস্তু নিয়ে কোন আলোচনাই করা হয়নি। অথচ সে যুগের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় ছিল এটাই। মুসলমানরা অমুসলিমদের সংস্পর্শে এসে উভয়ের মাঝে যে দ্বন্দ্ব-কোলাহলের সৃষ্টি হল—তার মূল সূত্র ছিল এটাই। এ যুগে অনেকেই মুসলমান হয়েছিলো বিশেষ কোন লোভের বশবর্তী হয়ে। অনেক নও-মুসলিমের উপর আবার কুফর ও ইলহাদের ইলযামও লাগানো হয়েছিলো, যাতে করে অনেক সময় তাদের মরণ যন্ত্রণাও ভোগ করতে হয়েছে। এই নও-মুসলিমদের মধ্যে ইবনুল মুকাফফা (মৃত্যু ৭৬০ খৃঃ) ছিলেন সব চাইতে উল্লেখযোগ্য। তাঁর স্বরচিত পুস্তকে তিনি তীব্র সমালোচনা করেছিলেন কুরআনের বিরুদ্ধে এবং আঘাতের পর আঘাত হেনেছিলেন এই বিশ্ব ধর্ম সনাতন ইসলামের প্রতি। বসরার শাসনকর্তা এই অভিযোগেই তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

ইসলাম তথা পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে ইবনুল মুকাফফার এই বিষোদ্গারকে সর্ব প্রথম উপলব্ধি করেন আবুল কাসিম ইব্রাহীম আর রাসী (২৪৬ হিঃ—৮৬০ খৃঃ)। তিনি ইবনুল মুকাফফার এই সব জঘন্যতম অভিমত ও কুরআনকে স্পষ্ট দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত করেন এবং

তৎপ্রতি প্রমাণপঞ্জী সহকারে তীব্র সমালোচনা করে 'আররাদ্দু আলা যিন্দীকিল লা'ইন, ইবনুল মুকাফফা (Reply to the cursed apostate Ibnul Mnqaffa) নামে একটি বই লিখেন।

এখানে জেনে রাখা উচিত যে, কুরআনের বিরুদ্ধে ইবনুল মুকাফফা কৃত এবং তাঁর বিরুদ্ধে আবুল কাসিম ইব্রাহীম কৃত এই উভয় গ্রন্থের সত্যতা সম্বন্ধে ডঃ আহমাদ আমীন ও আর্ রাফেয়ী প্রমুখ আধুনিক পণ্ডিত কতকটা সন্দেহ পোষণ করেছেন।[১] মুস্তাফা সাদিক আর রাফেয়ীও এ সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে বলেনঃ "ইবনুল মুকাফফা সে যুগে ছিলেন বাগ্মিতা, ভাষা ও সাহিত্যিক মর্যাদা ও অনবদ্যতা এবং এর মুকাবিলা করা যে মনুষ্য শক্তির আয়ত্তের একেবারেই বহির্ভূত তা তিনি নিশ্চিতই অন্তর দিয়ে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। দ্বিতীয়ত যারা ইবনুল মুকাফফাকে কুরআনের তীব্র সমালোচক বলে অপবাদ দিয়েছেন তাঁরা স্বয়ং মুক্তকণ্ঠে এ কথা স্বীকার করেছেন যে, তিনি পরবর্তীকালে নাকি এ থেকে তওবা করেছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে কুরআনের আয়াত আবৃত্তি করতে গিয়ে অথবা একটা ছোট্ট বালককে তা' আবৃত্তি করতে দেখেই কুরআন পাকের প্রতি তার সমস্ত বৈরীভাব চিরতরে তিরোহিত হয়েছিলো। সেই আয়াত কারীমাটি হচ্ছেঃ قيل يا ارض ابلعى ماءك [সূরা ১১ঃ আয়াত ৪৪]।

কিন্তু একথা চিন্তা করা কি কোনদিন ন্যায়সঙ্গত যে, ইবনুল মুকাফফার ন্যায় একজন সুধী কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ করতে উদ্যত হবেন এবং এক ছোট বালকের তিলাওয়াত শুনেই তিনি তা' থেকে নিবৃত্ত হবেন এত হঠাৎ করে? তৃতীয়ত 'দুররাতুল ইয়াতিমাহ' নামক গ্রন্থে এ কথা বলা হয়েছে যে, 'কুরআনের বিরুদ্ধে ইবনুল মুকাফফার সমস্ত ক্রিটিসিজম নাকি মাত্র কয়েকটি পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ রয়েছে যার কতকটা তিনি বিদেশীয় উৎসমূল

১. See Abdul Alim's article on this theme in 'Islamic culture' 32nd, year, Nos, I and 2 এবং 'দুহাল ইসলাম': ডঃ আহমাদ আমীন; ১ম খণ্ড; পৃষ্ঠা ২২৫।

থেকে অনুবাদ করেছিলেন আর কতকটা হযরত আলীর 'নাহজুল বালাগাহ' থেকে উপযোগী করে নিয়েছিলেন।[১]

শামদেশীয় আধুনিক পণ্ডিত নাঈম হামসী বলেন : ইবনুল মুকাফফা যদি কুরআনের ই'জাযকে এভাবে স্বীকার করেই থাকেন, তবে যে গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি তা' অস্বীকার করেছেন সে গ্রন্থটির সুখ্যাতি বা কুখ্যাতি সে যুগের সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়তো অতি ত্বরিতগতিতে। কিন্তু তা' হলো না কেন? আর একমাত্র ইব্‌রাহীম আর রাযীর বরাতেই বা কেন আমরা তা জানতে পারলাম? অথচ ইবনুল মুকাফফার অন্যান্য গ্রন্থ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছিল।

হিজরী তৃতীয় শতক

ই'জাযের প্রশ্ন নিয়ে সম্মিলিতভাবে জোরদার প্রচেষ্টা চলতে থাকে হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রান্তভাগে এবং তৃতীয় শতকের প্রথম ভাগে। খলীফা মামুনের (২১৮ হিঃ—৮৩৩ খৃঃ) রাজত্বকালে আবদুল্লাহ বিন ইসমাঈল আল-হাশিমী তাঁর খৃস্টান বন্ধু আবদুল মাসীহ বিন ইসহাক আল কিন্দীকে ইসলামের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে পত্র লিখেন। কিন্তু এর প্রতি-উত্তরে সেই খৃস্টান বন্ধু ইসলামের প্রতি প্রচণ্ড আঘাত হেনে এবং কুরআনের মু'জিযাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে তাঁকে জওয়াব দেন।

এই সময়েই ই'জায সম্বন্ধীয় মতামতগুলো মু'তাযিলা ও মুতাকাল্লিমুন কর্তৃক গৃহীত হতে থাকে। কারণ এ'রাই স্বীয় স্কন্ধে এর দায়িত্বভার

১. ইবনুল মুকাফফার একটা বইয়ের নাম 'আল আদাবুল কাবীর'। একে অনেক সময় ভুলবশত 'দুরে ইয়াতিমাহ' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। ইমাম সালিবীরও এই নামে একটি গ্রন্থ রয়েছে। ইবনুল মুকাফফার অন্যান্য বইয়ের নাম হচ্ছে 'আল আদাবুস সাগীর', 'খুদাই নামা', কালিলা দিমনা' ও 'সিয়ারুল মুলুকিল আজম' প্রভৃতি।

গ্রহণ করেন স্বাধীন চিন্তাধারার অগ্রদূত হিসেবে। নবুওত ও তার অবিচ্ছেদ্য অংশ 'ই'জায' সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়েও বেশ গরম গরম আলোচনা চলতে থাকে। এ যুগের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, বৈদেশিক সাহিত্য সম্ভারকে ভাষান্তরিত করার একটা ব্যাপক প্রবণতা দেখা দেয়। মুসলমানরা তাই বিশেষভাবে গ্রীক সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে তাঁদের সব কিছুকেই আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন এবং এভাবে তাদের মাঝে একটা স্বাধীন চিন্তাধারা ও উন্মুক্ত উদার মনোবৃত্তির উন্মেষ হয়। ঠিক এই সময়েই মু'তাযিলা সম্প্রদায় নেতৃত্ব হাতে নিয়ে ময়দানে এসে আবির্ভূত হয়। অবশেষে এই স্বাধীন মনোবৃত্তি এমন এক পর্যায়ে এসে উপনীত হয় যে, পবিত্র কুরআনের প্রণয়ন সম্পর্কেও নানারূপ সন্দেহ ও ভিন্নমত পোষণ করা হয়। আল-কাযী আল-মু'তালিম আহমদ বিন আবি দাউদ (২২০ হিঃ—৮৩৫ খৃীঃ)-এর সময়ে ব্যাপারটা আরো গুরুতর হয়ে উঠে। তাই ইসলাম তথা কুরআনের বিরুদ্ধে যে সমস্ত প্রশ্ন ও তীব্র সমালোচনা উত্থিত হয় সেগুলোর জবাব দেওয়াই মু'তাযিলাপন্থী-দের কার্যক্রমের প্রধান অংগ হয়ে দাঁড়ায়।[১]

খলীফা মুতাওয়াক্কিলের রাজত্বকালে (২৩২-২৪৭ হিঃ—৮৪৬-৮৬১ খৃীঃ) ইলমে কালামের উপর প্রথম গ্রন্থ প্রণয়ন করেন আলী ইবনু রাব্বান আত-তাবারী।

অতঃপর আল্-জাহিয প্রমুখ সাহিত্যিকও ই'জাযে' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কিন্তু মুফাস্সিরদের তরফ থেকে এই সম্বন্ধে হিজরী চতুর্থ শতক বা খৃস্টীয় দশম শতকের পূর্বে কোন পুস্তকই বের হতে দেখা যায়নি। অতএব যে সমস্ত পণ্ডিত 'ই'জায' শাস্ত্রের আলোচনায় অংশ নিয়েছেন হিজরী তৃতীয় শতকে বা খৃীস্টীয় নবম শতকে তাঁদের নিম্নলিখিত শ্রেণীসমূহে বিভক্ত করা যেতে পারে।

---

১. যিকরুল মু'তাযিলা: পৃষ্ঠা ৪২—৫২।

১. ইসলামে অটল বিশ্বাস না থাকার দরুন যাঁরা কুরআনের ই'জাযকে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতে পারেন নি, এ'দের মধ্যে স্বাধীন চিন্তাবিদ ও অমুসলিম—উভয় দলই শামিল রয়েছে। যেমন—ইবনু রাওয়ানদী এবং ঈসা বিন সাবীহ আল-মিযদার।

২. মু'তাযিলা গ্রুপ—এ'দের প্রতিনিধিত্ব করেন আন্নাজ্জাম (মৃত্যু ২২০ হিঃ—৮৩৫ খৃঃ)।

৩. মু'তাযিলা পন্থীদের সাহিত্যিক গ্রুপ। যেমন—আল জাহিয।

৪. মুতাকাল্লিমূন—যাঁরা কুরআনকে আরবী সাহিত্যের সর্বোচ্চ প্রতীক-রূপে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন—আলী ইবনু রাব্বাল আত্-তাবারী এ'দেরই অন্যতম।

আগেই বলেছি যারা কুরআনের 'ই'জাযকে সর্বান্তকরণে প্রত্যয় করতে পারেন নি, তাঁদের মধ্যে দু'জন প্রখ্যাত পণ্ডিতের নাম হচ্ছে ইবনু রাওয়ানদী ও ঈসা বিন্ সাবীহ আল-মিযদার।

প্রথমোক্ত পণ্ডিত—ইবনু রাওয়ানদী কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। [১]

আর রাফেয়ী বলেন: রাওয়ানদীর পুরো নাম ছিল আবুল হুসাইন আহমদ বিন ইয়াহিয়া বিন ইসহাক। দুঃখের বিষয় তিনি মুসলিম জগতে বিশেষভাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন শরীয়ত বিরূপ সমালোচক হিসেবেই। ইসলামের বিরুদ্ধে তার গ্রন্থরাজির মধ্যে 'আত্তাজ' এবং 'আদ-দাফিই' (The defender) সমধিক প্রসিদ্ধ।

আল-খাইয়াত এবং আবু আলী আল-জুব্বাই অকাট্য প্রমাণাদি সহকারে রাওয়ানদীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে তার দাঁতভাঙ্গা জবাবও দিয়েছেন। কথিত আছে যে, রাওয়ানদী নিজেই নাকি পরবর্তীকালে ছদ্মনামে একটি বই লিখে তার পূর্ববর্তী অভিমতের বিরোধিতা করেছেন।

১. আর রাফেয়ীর ইজাযুল কুরআন: পৃষ্ঠা ১৮৭।

এতে আশ্চর্য হ'বার কিছুই নেই। কারণ তাঁর অধিকাংশ পুস্তকই লিপিবদ্ধ হয়েছে অর্থের লালসায়—ভাড়াটিয়া হিসেবে। তাই ইসলাম তথা কুরআনের বিরুদ্ধে রাওয়ানদীর লিখা গ্রন্থরাজির মধ্যে তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত মতামত বলতে কিছুই নেই। ইসলামের জানী দুশমনের কাছ থেকে উপর্যুপরি বিপুল অর্থ গ্রহণ করে তার বিনিময়ে তিনি পশ্চাতে রেখে গেছেন অজস্র অকেজো গ্রন্থ।

আবু আলী আল-জুব্বাই বলেন: "রাওয়ানদীর বাইরের ও ভিতরের স্বরূপ ছিল একান্ত পরস্পর বিরোধী, আর তাঁর লেখার মধ্যেও ছিল না কোন আন্তরিকতা। তাই তার অন্তরের মানুষটি সত্যিকারের মুসলমান ছিল কিনা তা কে বলবে? সুপ্রসিদ্ধ লেখক আর রাফেয়ীয়ও ইবনু রাওয়ানদীর এই দিক সম্পর্কে আলোকপাত করতে ছাড়েন নি।

Dr. Paul Kraus মুআইয়িদ আশ-শিরাযীর বরাত দিয়ে বলেন যে, রাওয়ানদী নাকি তার পুস্তকে যুক্তি-প্রমাণ সহকারে একথা পেশ করেছেন যে, আরব-অনারবরা কেন সেই কুরআনের চিরন্তন চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করতে পারেন নি।

ডঃ পল ক্রাওস আরও বলেন যে, ইবনু রাওয়ানদী শুধু কুরআনের সাহিত্যিক মানের ই'জাযকে অস্বীকার করেই নাকি ক্ষান্ত হন নি, বরং তার চাইতেও প্রচণ্ড ও ব্যাপক আক্রমণ চালিয়ে তিনি কুরআনী আয়াতসমূহের অন্তর্গত ই'জাযকেও সম্পূর্ণভাবে ইনকার করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছেন।[১]

ইবনুল জাওযী তাঁর অনুপম গ্রন্থ 'আল-মুনতাযাম ফী তারীখিল উমাল' এবং আবদুর রহীম আল-আব্বাসী তাঁর 'মাআহিদুত তানসীস' নামক চমৎকার পুস্তকে কুরআনের বিরুদ্ধে ইবনু রাওয়ানদীর এই সমস্ত প্রবল আক্রমণ ও প্রচণ্ড আঘাত হানার কথা অতি সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত করেছেন। ডঃ ক্রাওস বলেন: কুরআনের বিপক্ষে যিনদীগদের যে সমস্ত জঘন্য অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে এবং মুতাকাল্লিমদের পক্ষ থেকেও যে দাঁতভাঙ্গা

১. আরবী পত্রিকা 'আল-আদিব' ১৯৪৩—৪৪ সাল: পৃষ্ঠা ৩২।

জবাব দেওয়া হয়েছে—সে সবগুলোর পুংখানুপুংখ আলোচনা রয়েছে 'আবদুল জাব্বার মু'তাযিলী' কৃত 'তানযীহুল কুরআন আনিল মাতাইন' নামক অমর গ্রন্থে। পণ্ডিত আবদুল আলীম বলেনঃ ইবনু রাওয়ানদী তার 'আদ-দাফিই' (The defence) নামক পুস্তকটি প্রণয়ন করেছিলেন স্বীয় জনৈক য়াহুদী বন্ধুর অনুরোধে উদ্বুদ্ধ হয়। এই বন্ধুটির সাথেই তিনি এক সময়ে মুসলমানদের ভয়ে এক অজ্ঞাত গুহায় লুকিয়েছিলেন বহুদিন ধরে। এই বইটি অনেকটা সেই Freelance Ghost লেখকের মতই যে কারো স্বপক্ষে বা বিপক্ষে যে কোন কারণে লেখনী ধারণ করতে এবং তা জোরেশোরে চালাতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করে না, যদি তৎপ্রতি এবং বিনিময়ে কিছুটা অর্থের ইংগিত করা হয়।[১]

কুরআনের আর একজন সমালোচকের নাম হচ্ছে ঈসা বিন সাবীহ আল মিযদার। তিনি ছিলেন মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের তথাকথিত মিযদারী মতবাদের অগ্রদূত। তিনি ছিলেন অতিশয় ধর্মভীরু এবং মু'তাযিলাদের পাণ্ডা পুরোহিত হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু অন্যের প্রতি ধর্মদ্রোহিতার অপবাদ লাগাতেও আবার অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত ছিলেন। একদিন তিনি

---

১. আরাবী লেখকদের মাঝে আরও একজন রাওয়ানদীকে আমরা দেখতে পাই। তাঁর নাম হচ্ছে সা'দ ইবনু হিবাতুল্লাহ। তাঁর 'খারাইজ আল জাওয়ারিহ' নামে একটি পুস্তক M'ss Berlin'-এ ছাপা হয়। উক্ত বইটি একবার মুহাম্মদ বাকির মাজলিসীর বই 'বাহারুল আনওয়ার' নামে তেহরান থেকে প্রকাশ পেয়েছিল ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে।

আমিলী তাঁর 'আ'লামুশ শিয়াহ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আল-রাওয়ানদী নাকি 'মাজমাউল বায়ান' নামক পুস্তক প্রণেতার ছাত্র ছিলেন। আমিলী একথাও বলেছেন যে, রাওয়ানদী এক খণ্ডে কুরআনের একখান্য তাফসীর সমাপ্ত করেন এবং তার পূর্ববর্তী তাফসীর গ্রন্থের ১০ খণ্ডে ব্যাখ্যা লেখেন। কিন্তু আমিলী একথা উল্লেখ করেন নি যে, 'খারাইজ আল-জাওয়ারিহ' নামের পুস্তকটি রাওয়ানদীরই লেখা।

বলেছিলেন যে, পৃথিবীর সমস্ত লোকই যিনদীক। তিনি প্রত্যয় করতেন যে, সাহিত্যিক মানের দিক দিয়ে কুরআনের মুকাবিলা করা একান্ত স্বাভাবিক এবং সম্পূর্ণরূপেই মনুষ্যশক্তির আয়ত্তাধীন।১

সম্ভবত ইবনু রাওয়ানদীর বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করতে গিয়ে একথা বলাই যথেষ্ট হবে যে, তাঁর লিখিত বিষয়বস্তু ও তার অন্তরের অন্তঃস্থিত মন—এ দুটির মাঝে কোনদিনই তেমন মিল ছিল না। সামান্য অর্থের খাতিরে তিনি যে কোন মতামতের সমর্থন করতেন সর্বান্তকরণে। আবার তার বিরুদ্ধাচরণও করতে পারতেন দ্বিধাহীন চিত্তে। পক্ষান্তরে ঈসা বিন সাবীহ বিন মিযদারকে কোনক্রমেই উক্ত দোষে দোষারোপ করা যেতে পারে না। কারণ তিনি যদিও ছিলেন অত্যন্ত সংকীর্ণমনা গোঁড়া ভাবাপন্ন ও খামখেয়াল; কিন্তু তথাপি ধার্মিকতাই ছিল তাঁর জীবনের অনুপম বৈশিষ্ট্য। এই খামখেয়ালের বশবর্তী হয়েই তিনি কোন এক সময়ে দুনিয়ার সমস্ত লোককে যিনদীক নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু ইবনু রাওয়ানদী তাঁর প্রমাণপঞ্জী পেশ করার দিক দিয়ে ছিলেন অতি সুচতুর এবং এদিক দিয়ে তার মনোভাবও ছিল যেন অনেকটা সেই কূট তার্কিকের মতই। কুরআনের এই উভয় সমালোচক এ বিষয়ে কিন্তু সম্পূর্ণ একমত যে, মনুষ্য শক্তি কুরআনের অনুরূপ সাহিত্যশৈলী সৃজন করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। আল-মিযদার তার এই উক্ত দাবী করেই ক্ষান্ত হয়েছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইবনু রাওয়ানদী এতেও ক্ষান্ত না হয়ে আরও একধাপ অগ্রসর হয়েছেন এবং কুরআনের অনুরূপ সাহিত্যরীতি সৃজনের অপচেষ্টা দ্বারা এর মুকাবিলা করার ব্যর্থ প্রয়াস পেয়েছেন।

কথিত আছে যে, ইবনু রওয়ান্দী নাকি কুরআন মিথ্যা হওয়ার স্বপ্ন সম্ভাবনাকে প্রকাশ করেছেন একমাত্র একথার উপর ভিত্তি করে যে, যেহেতু কুরআনে 'মিথ্যা' নামক শব্দেরও উল্লেখ রয়েছে। এতে করে একথা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে গুম্ভীরতা বলতে কিছুই ছিল না।

---

১. The History of the Idea of Miracle by Mr. Naim-al-Humsi, Islamic Review : June 1955, P. 15.

ইবনু রাওয়ান্দীর মু'তাযিলা দৃষ্টিভঙ্গীর গ্রন্থমালা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে ইমাম আশআরীর মাকাতুল ইসলামিঈন-এ। এমনি তো মু'তাযিলাদের ময়দানকে আগে থেকেই একটা কয়েদখানা মনে করেছিলেন তদুপরি তাঁকে এই দল থেকে বিচ্যুত করা হয়েছিল। তাই এবার তিনি শিয়া সম্প্রদায়ের সাথে হাত মিলিয়ে তাঁদের এক বিশিষ্ট আলিম হিসেবে অভিহিত হলেন। তারপর আবু ঈসা অররাক কর্তৃক প্রভাবান্বিত হয়ে স্বেচ্ছাচারিতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে এবং ইসলামের বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগে যান। শুধুমাত্র ইসলামকে কুরআন মজীদ তথা সমস্ত আসমানী কিতাবসমূহের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করতে গিয়ে প্রবল আক্রমণ ও প্রচণ্ড আঘাত হানতে শুরু করেন। যাহিজের লিখিত 'ফাযীলাতুল মু'তাযিলা' নামক গ্রন্থের কঠোর প্রতিবাদে 'ফাযীহাতুল মু'তাযিলা' বা মুতাযিলাদের অবমাননা নামে বই লিখেন। এটি খাইয়াত প্রণীত 'কিতাবুল ইন্তিসারের' সঙ্গে ছাপানো হয়েছে। এছাড়া ইবনু রাওয়ান্দীর 'কিতাবুদ দামিগ' নামক গ্রন্থটি ইবনুল জওযী 'আল্ মুনতাযাম ফী আত তারীখের' মধ্যে সংরক্ষিত আছে। এর মাধ্যমে তিনি কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের উপর মুহম্মদের প্রচণ্ড হামলা চালিয়েছেন। সকল যুগের নবী ও রসূল তথা নবী মুস্তফার (সঃ) সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা ও কঠোর প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে কুরআনের ই'জায 'মু'জিযা' বা অলৌকিকতাকে শুধুমাত্র একটা মনগড়া বস্তু হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে এই পবিত্র কুরআন কস্মিনকালেও ইসলামী কিতাব হতে পারে না। আর পয়গাম্বরগণকে যাদুকর অথবা মন্ত্র-তন্ত্র পাঠকারীদের সাথে অনায়াসে তুলনা করা যেতে পারে।

ইসলামের বিরুদ্ধে স্বীয় বিষোদগারকে গোপন রাখার মানসে অনেক সময় তিনি তাঁর চিন্তাধারাকে ব্রাহ্মণদের মুখ দিয়ে ব্যক্ত করার চেষ্টা করতেন। সমসাময়িক ওলামায়ে কিরাম প্রায় এক শতাব্দী কাল ধরে তাঁর এই মারাত্মক ধরনের চিন্তাধারা ও খেয়ালের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে থাকেন। এদের মধ্যে খাইয়াত, জুব্বায়ী, আশআরী, আবু হাশিম, আবু সাহল, নওবাখতী প্রমুখ আলিম বিশেষভাবে উল্লেখ্য (দেখুন, উদু ইনসাইক্লোপেডিয়া, পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি: ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫২০)।

মু'তাযিলাদের সারফা মতবাদ

আল-জাহিযের ওস্তাদ আবু ইস্‌হাক ইব্‌রাহীম আন নাজ্জামের (মৃত্যু ২২০ হিজরী; ৮২৫ খৃঃ) নেতৃত্বাধীনে মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মাঝে সারফা একটা মতবাদ গড়ে ওঠে। এদের ধারণা যে, আরবদের মাঝে প্রকৃতপক্ষে কুর-আনের মুকাবিলা করার পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্য নিহিত ছিল। আল্লাহ্ পাক তাদের সে শক্তির উন্মেষ ও বিকাশ অংকুরেই বিনাশ সাধন করেছেন। অতএব আল্লাহ্‌র পাকে এই সারফা বা প্রতিসরণই (deflection) হচ্ছে কুরআনের মু'জিযা। এই দলের কেউ এ কথাও বিশ্বাস করেন যে, কুরআনে যে সমস্ত অতীত দিনের বা অনাগত দিনের ঘটনাপঞ্জীর সমাবেশ রয়েছে সেগুলোই হচ্ছে এর অনুপম মু'জিযা।[১]

ইমাম ফাখরুদ্দীন রাযী (মৃত্যু ৬০৬ হিজরী) বলেন যে, নাজ্জাম নাকি এ কথাও বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ্ নবী করীম (সঃ)-এর সার্বভৌম নুবুওয়তের প্রমাণার্থে যে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন তা নয়, বরং এ নাযিল হয়েছে অন্যান্য আসমানী কিতাবের ন্যায় হক ও বাতিলের মধ্যে বৈষম্য প্রদানের উদ্দেশ্য নিয়ে।

আবু ইসহাক আন্-নাজ্জামের লেখা বইগুলো আজ ধরাপৃষ্ঠ থেকে যেন বিলুপ্তই হতে চলেছে। শুধু তাঁর অভিমতগুলো অন্যান্য বইয়ের বরাতে আমাদের হাতে এসেছে। এ কথা কিন্তু সত্যিই অতি চিত্তাকর্ষক যে, আপামর জনসাধারণের ভয়ে কুরআনের চিরন্তন মু'জিযাকে সরাসরি অস্বীকার করা আদৌ সম্ভবপর হয়নি বলেই একে ছলে, কৌশলে ও নানান গোপন ষড়যন্ত্রের ছদ্মবেশে ইন্‌কার করা হয়েছে। আর বলা হয়েছে যে, কুরআন নিজেই কোন একটা মু'জিযা নয় বরং এর সারফা বা প্রতিসরণটাই হচ্ছে মু'জিযা। নাজ্জা-মের প্রতিবাদে আবু বকর বাকিল্লানী একটি বই লেখেন। বইটির নাম—'কিতাবু উসুলিন নাজ্জাম'। (দেখুন, বাগদাদীর 'আল ফারক বাইনাল ফিরকাহ' কায়রো এডিশন—পৃঃ ৯১৫)

১. 'ই'জাযুল কুরআন ঃ আর-রাফেয়ী, পৃষ্ঠা ১৪৪। বিস্তারিতের জন্য দেখুন ইমাম রাযীর 'নিহায়াতুল ই'জায ফী দিরাইয়াতুল ই'জায।

সাহিত্যিক মু'তাযিলাদের অভিমত

মু'তাযিলাদের আর একজন বরেণ্য নেতা, স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক ও নাস্তিক আবু উসমান আমর ইবনু বাহর আল জাহিয (ঘোরানো চক্ষু বিশিষ্ট) 'ই'জায সম্পর্কে 'নুজুমুল কুরআন' নামে একটি বই লেখেন। তিনি ছিলেন বসরার অধিবাসী। তাঁর রচিত 'আল-বায়ান-আত্তাবয়ীন' এবং 'কিতাবুল হায়াওয়ান' নামক অপর গ্রন্থদ্বয়েও তিনি 'ই'জায শাস্ত্র সম্পর্কে স্বীয় মতামত প্রকাশ করেন। ইবনু খাল্লিকান "অফিয়াতুল আইয়া'নে এই শেষোক্ত গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।[১]

কুরআনের ই'জায শাস্ত্রে পূর্ণ আস্থা রেখে আল-জাহিয (মৃঃ ২৫৫ হিঃ) এ কথা স্বীকার করেন যে, আঁ হযরতের (সঃ) যুগে আরবরা আরবী সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ সাধন ও মনীষার অধিকারী হয়েও কোন দিনের তরে কুরআনের চ্যালেঞ্জকে হাতে নিতে সাহস করেনি।

নবী মুস্তফা (সঃ) আরবদের যে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন প্রকাশ্য মজলিসে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এবং তাঁদের মাঝে এ নিয়ে যে তুমুল বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছিলো—জাহিয তাঁর উক্ত গ্রন্থে এ সবগুলোর কথাই উল্লেখ করেছেন বিস্তারিতভাবে। তিনি বলেনঃ কুরআনের চিরন্তন চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে অপারগ হয়েই আরবরা এর মু'জিযা'কে সম্যক অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিল।[২]

আবুল ফাতাহ শেহেরিস্তানী (মৃত্যু ১১৫৩ খৃঃ) বলেনঃ "ইবনু রাওয়ানদী নাকি জাহিয সম্পর্কে এই তথ্য পরিবেশন করেছেন যে, আল-জাহিয সমগ্র কুরআনকে একটা শরীরের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে বলেনঃ "কখনো ইহা মানবের আকৃতি ধারণ করে, আবার কখনো জন্তুদের রূপ পরিগ্রহ করে।"[৩]

---

১. See Literary History of the Arabs by Prof, Nicholson.

২. দেখুন জালালুদ্দীন সুয়ূতীর 'আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন' : ২য় খণ্ড : পৃষ্ঠা ১১৮।

৩. আল্লামা শেহেরিস্তানী কৃত 'মিলাল আন্নিহাল,' ১ম খণ্ড : পৃষ্ঠা ৫৩,

উক্তিটা সত্যিই অতি হাস্যাস্পদ। আল-জাহিয সম্পর্কে যাঁরা মামুলী ধরনের জ্ঞান রাখেন তাঁরাও কোনদিন এ উক্তিকে বিশ্বাস করতে পারবেন না।

'ই'জায' সম্পর্কে আল-জাহিয যে দুটো অভিমত পোষণ করেছেন—তার একটি হচ্ছে সারফা মতবাদ আর অপরটি হচ্ছে এই যে, স্বয়ং কুরআনের স্টাইলই হচ্ছে এর 'ই'জায। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, জাহিযের 'সারফা' বা প্রতিসরণে আস্থা রাখার কথা এমন সময় ব্যক্ত করা হয়েছে যখন তিনি স্বীয় শিক্ষক নাজ্জামের বিপুল প্রভাবে ছিলেন সম্পূর্ণরূপে প্রভাবান্বিত। অথচ যখন তাঁর দ্বিতীয় অভিমত (অর্থাৎ কুরআনের স্টাইলই যে এর 'ই'জায' বর্ণনা করা হয়েছে, তখন তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীনচেতা ও প্রভাবমুক্ত। পরস্পরবিরোধী এই উভয় মতের তাতবীক ও সমাধানের কোন উপকরণ বা প্রমাণপঞ্জী আমাদের কাছে নেই। অথচ আল-জাহিয এই উভয় মতকেই সমভাবে ব্যক্ত করেছেন তাঁর কিতাবুল হায়াওয়ানে।[১]

সারফা সম্বন্ধে আল-জাহিয বলেন: কুরআনের অনুরূপ সাহিত্য সৃষ্টির জন্য আল্লাহ্‌র নবী যখন আরবদের দাওয়াত দিলেন গুরু গম্ভীর স্বরে, তখন সেই চিরন্তন চ্যালেঞ্জকে যে তারা মনে প্রাণে গ্রহণ করবে—সে মনোবৃত্তিকেই আল্লাহ্ পাক চিরতরে অপসারিত করে দিলেন তাদের অন্তরকোণ থেকে। তাই তখন থেকে আজ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ ১৪ শত বছর ধরে এ পথে আর কেউ পা বাড়ায়নি—বাড়াতে সাহসও করেনি।—

মুসলমানদের হয়তো তখন একটা বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। হয়তো তাঁরা বিপক্ষদলের সাথে আলোচনা পর্যালোচনার জন্য একটা প্রতিনিধি সম্মেলনের ব্যবস্থাও নিয়েছিলেন। এক দলকে অপর দলের স্বপক্ষে

লণ্ডন এডিশন। আল-জাহিয কৃত এ ধরনের কদর্থগুলোর তীব্র প্রতিবাদে কাযী আবু বকর বাকিল্লানী একটি বই লিখেছেন। বইটির নাম 'নাকদুল ফুনুন লিল জাহিয' দেখুন কাযী আইয়ায কৃত শিফা: পৃষ্ঠা ২৫৯।

১. দেখুন আল-জাহিয কৃত 'কিতাবুল হায়াওয়ান, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১-৩২।

বা বিপক্ষে দাঁড়াতে হয়েছিল এবং সম্ভবত এতে যথেষ্ট হৈ-হুল্লোড় এবং জল্পনাকল্পনার সৃষ্টি হয়েছিল। বনু নাওয়াহা ও মুসায়লামা কায্যাবের বন্ধু-বান্ধবরা তার মনগড়া শব্দসম্ভারে এত দূর আকৃষ্ট হয়েছিল যে, সেগুলোকে তারা স্বর্গীয় আপ্তবাক্য বলেই মনে করতো। অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে সেগুলো ছিল নিছক নকল, ডাহা মিথ্যা।

কুরআনে 'ই'জায' সম্পর্কে এর রচনাশৈলী ও সাহিত্যিক মানের ইঙ্গিত দিতে গিয়ে আল-জাহিয বলেনঃ "একজন দাহরী যে আল্লাহর একত্ববাদে আস্থাবান নয়—তার জন্য তাওহীদের প্রাথমিক ধ্যান-ধারণা এবং এই প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ এবং তার ধারক ও বাহকের সত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে সম্যক জ্ঞানলাভ করা চাই যে, সত্যতার সুন্দর শাশ্বত প্রমাণপঞ্জী স্বয়ং এই পবিত্র গ্রন্থেই পেশ করা হয়েছে অনুপম রচনাশৈলীর মাধ্যমে। সুতরাং মনুষ্য শক্তি দিয়ে এর মুকাবিলা করা কোনদিন সম্ভব হতে পারে কি?"

জাহিযেরই সমসাময়িক জনৈক মু'তাযিলা পন্থী লেখক কুরআনের আলংকারিক 'মু'জিযাকে অস্বীকার করে একখানা বই লেখেন। আল-জাহিয এর প্রতি-উত্তর দিতে ও কুরআনের স্টাইল সম্পর্কে সুন্দরতম আলোচনা করতে গিয়ে একখানা চমৎকার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। আবু বকর বাকিল্লানীর মতে 'ই'জায শাস্ত্রের উপর এটাই হচ্ছে সর্ব প্রথম গ্রন্থ।[১]

পরবর্তীকালে আল জাহিয এ প্রসংগে আরও একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এর নাম হচ্ছে 'আল হুজ্জাতু ফী তাসবিতিন নুবুওয়াহ।' (Proof for establishing the Prophethood)।

উপরিউক্ত বিবরণ থেকে আমরা স্পষ্টতই এ কথা উপলব্ধি করতে পারি যে, 'ই'জায শাস্ত্র সম্পর্কে 'মু'তাযিলাদের সমাধানকৃত বহু দার্শনিক সমস্যাকে সামনে নিয়ে তিনি অতি সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর আলোচনা করে গেছেন। আল-জুরজানী প্রমুখ পরবর্তী লেখকের ন্যায় স্বীয় প্রমাণাদির সমর্থনে তিনি কুরআনের আয়াত ও আরবী সাহিত্য থেকে বিশেষ কোন পদ্ধতি দেনন নি এবং

১. Ibid: vol. 1, P. 5.

এই 'ই'জায শাস্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও তিনি খুব বেশী লম্বা-চওড়া আলোচনায় প্রবেশ করেন নি। কিন্তু এ কথা বললে আদৌ অত্যুক্তি হবে না যে, এই 'ই'জাযের প্রশ্ন তিনিই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং এরই উপর পরবর্তী লেখকরা তাঁদের প্রমাণপঞ্জীর বিরাট সৌধমালা নির্মাণ করেছেন। জাহিযের গ্রন্থে কুরআনের ভাষার আলংকারিক বৈশিষ্ট্য এবং ইস্‌তিয়ারাত বা রূপকের ব্যবহার সম্বন্ধে পর্যাপ্ত পরিমাণে আলোচনা পাওয়া যায়। সম্ভবত 'ই'জায শব্দটি তখন পর্যন্ত শুধু কুরআনের রচনাশৈলীর মূল্য নির্ধারণের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না, কারণ জাহিযের মতে 'হিকমাতুল আরাব' বাক্যাংশটিকে 'আরব জাতির ধ্যান-ধারণা' বলে অনুবাদ করলে আলংকারিক অভিনবত্ব নষ্ট হয়ে যায়।

জাহিযের লেখা কিতাবের সংখ্যা তিনশতরেও অধিক। তম্মধ্যে অধিকাংশই কালচক্রের আবর্তনে ধরাপৃষ্ঠ থেকে লোপ পেয়েছে। 'ই'জায শাস্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত তিনখানা কিতাবের নাম আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। বাকী কতগুলোর নাম হচ্ছে এই ঃ

১. কিতাবু খালকিল কুরআন

২. কিতাবু আ'ইল কুরআন

৩. কিতাবু রাদ্দি আ'লাল ইয়াহুদ

৪. কিতাবুল বুখালা

৫. কিতাবুল আমসার

৬. কিতাবুল মাআ'দিন

৭. কিতাবুল ইখ্‌ওয়ান

৮. রিসালা ফিল ইশ্‌কি ওয়ান নিসা

জনাব হান্না ফাখুরী বলেন ঃ জাহিয নাকি পয়গাম্বরদের নিষ্পাপ হওয়াতে বিশ্বাস করতেন না (দেখুন-হান্না ফাখুরী কৃত 'আল-জাহিয'ঃ পৃষ্ঠা ২৫)।

যে সমস্ত মুতাকাল্লিম কুরআনের রচনাশৈলীকে 'মু'জিযা হিসেবে গ্রহণ করেছেন

কুরআনের রচনাশৈলীই যে এর 'মু'জিযার একমাত্র প্রমাণ—এই মতবাদটি সর্বপ্রথম জোরদার ভাষায় প্রকাশ করেন প্রখ্যাত মনীষী আলী ইবনু রব্বান আত্-তাবারী তাঁর 'দীন-ওয়াদ দাউলাহ্' নামক অমর গ্রন্থে। তিনি ছিলেন খলীফা মুতাওয়াক্কিলের সমসাময়িক জনৈক খৃষ্টান মতাবলম্বী। পরে ইসলামের অনন্য সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এর সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন; তিনি উক্ত গ্রন্থে বেশ জোর গলায় বলেছেন, "কুর-আনের ত্রুটিবিহীন রচনাশৈলী ও সাহিত্যরীতি জগতের কোন ভাষায় বা গ্রন্থে মিলবে না।" আবু হাতিম আস সিজিসতানী তাঁর এই উক্তির সাথে একমত। আত্-তাবারী উক্ত গ্রন্থে বলেন: "খৃষ্টান থাকাকালীন আমি প্রায়ই আবার সুবিজ্ঞ বাগ্মীপ্রবর মামার উক্তির পুনরাবৃত্তি করতাম। মামা বলতেন: 'যেহেতু কুরআনের অনুরূপ রচনাশৈলী সৃষ্টি করা মানবের একান্ত সাধ্যায়ত্ত তাই এ নবুওতের বৃহত্তর নিদর্শন বা অমর 'মু'জিযা' কস্মিনকালেও হ'তে পারে না।" পরবর্তী-কালে আমি স্থির মস্তিষ্কে এই নিয়ে যথেষ্ট জল্পনা কল্পনা ও পর্যালো-চনা করেছি, শুধু তাই নয়, কুরআনের অনুরূপ সাহিত্যশৈলী সৃষ্টি করতেও প্রয়াস পেয়েছি; কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও কোনদিন পেরে উঠিনি। অথচ এর মর্মার্থ অনুধাবন করতে কোনদিনই এতটুকু বেগ পেতে হয়নি আমার, বরং তা' সকল সময়েই ঠিক যেন প্রভাত-রবির আলোকরশ্মির ন্যায়ই সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে আমার নয়ন সম্মুখে। আমি অতি সহজ-সুন্দরভাবেই একথা উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, কুরআনের অনু-সারীরা তার সম্পর্কে যে দাবী করেছিল তা অমোঘ সত্য। কারণ জীবনে আমি কুরআন ব্যতিরেকে অন্য কোন গ্রন্থই এমন দেখিনি—যে, গ্রন্থ তার অনুসারীদের এত সুন্দর শাশ্বত উপমা ও উপদেশমালা দান করতে পারে। মন্দ থেকে বিরত রাখে সার্বভৌম নবুওতের প্রতি বিশ্বাস ও আল্লাহ্‌র অমোঘ বিধানকে বিশ্লেষণ করে। মানুষের অন্তরকোণে ইহা এমন

সার্থক ও সুন্দরভাবে রেখাপাত করে, যার নজির খুঁজে পাওয়া যায় না পৃথিবীর কোথাও। অথচ যিনি ছিলেন এর ধারক, বাহক ও প্রচারক তিনি সম্পূর্ণ অশিক্ষিত নিরক্ষর। এহেন নিঃসন্দেহরূপেই নুবুওতের বৃহত্তম নিদর্শন বা অমর 'মু'জিযা।' ১

অতএব আত্-তাবারীর মতে কুরআনের 'ই'জায' নিহিত রয়েছে এর ইস্লাহের সদুদ্দেশ্যে, এর বিনম্র বিধি-নিষেধ সার্থক রচনাশৈলী ও স্বর্গ মর্ত প্রভৃতির অপূর্ব কাহিনীর মধ্যে। আলী আত-তাবারী 'ফিরদাউসুল হিকমাত" নামেও ইলমে তিব সম্পর্কে একটি অনুপম গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৯২৮ সালে বইটিকে এডিট করার একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যুবায়র সিদ্দীকী। প্রফেসার E. G. Browne ও এইটিকে এডিট করার একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু তা পূর্ণ হওয়ার আগেই পরম্পরের আকুল আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে ১৯২৬ ঈসায়ীতে তাঁকে অবিনশ্বর জগতের পানে যাত্রা শুরু করতে হয় (আবদুর রহমান খাঁ কৃত কুরূনে উস্তা ফী ইলমী খেদমত ঃ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৮)।

হিজরীর ৪র্থ এবং খৃীস্টীয় ১০ম শতক

'ই'জায' শাস্ত্রের সর্বাঙ্গীন আলোচনায় এ কালের অন্যতম ব্যক্তি হ'চ্ছেন আরব কবি আল মুতানাব্বী' যিনি তাঁর নুবুওতের দাবীর অনুকূলে কুরআনের মুকাবিলা করে কতিপয় কৃত্রিম সূরা তৈরী করার অপচেষ্টা করেছিলেন। অতঃপর এই ময়দানে অবতরণ করেন আবুল হাসান আল-আশআরী। ইনি প্রথমে 'মু'তাযিলা, কিন্তু পরে সুন্নী মতবাদকে মনে-প্রাণে গ্রহণ ক'রে ইসলাম জগতে অন্যতম মুতাকাল্লিম হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। অনুরূপভাবে এ যুগে 'ই'জায' শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ হিসেবে সুনাম অর্জন করেন বান্দার আল ফারেসী মুতাকাল্লিম, মুফাস্সির আত-তাবারী ও আল-কিম্মী, সাহিত্যিক মুতাকাল্লিম আল-ওয়াসেতী, আল-খাত্তাবী

১. দেখুন ঃ আলী বিন রাব্বান তাবারী কৃত 'আদ-দ্বীন ওয়াদ দাউলাহ' ঃ পৃষ্ঠা ৪০।

আর-রুম্মানী এবং সাহিত্যিক আবু হিলাল:আসকারী। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এই সুধী পুরুষদের গ্রন্থসমূহ ও তন্মধ্যে তাঁদের লিপিবদ্ধ মতবাদগুলোকে আলাদাভাবে বর্ণনা করতে চেষ্টা করবো।

আল মুতানাব্বী : আবু তাইইব আহমাদ ইবনু হুসাইন আল মুতানাব্বী (নুবুওতের ভুয়া দাবীদার) কূফা ও দিমাশকের মধ্যবর্তী 'আদিউল হামামাহ' নামক স্থানে কুরআনের মুকাবিলা ও নুবুওতের দাবী ক'রে বসেন। বনু কাল্ব গোত্রের অনেকেই অনুগামী হয়ে পড়ে, তার অনুপম সাহিত্যশৈলী ও রচনারীতির ইন্দ্রজালে মুগ্ধ হয়ে। অনন্তর হিমসের গভর্ণর আবু লুলু তাকে গ্রেফতার করে যিনদানখানায় নিক্ষেপ করেন। মুতানাব্বী তার নুবুওতের নিদর্শনস্বরূপ কুরআনে যে কতিপয় জাল আয়াত তৈরী করেছিলেন তার কিছুটা উল্লেখ পাওয়া যায় আবুল আলা মা'আরীর 'রিসালাতুল গুফরান' (ক্ষমার পয়গাম) নামক কবিতা গ্রন্থে।[১]

মুতানাব্বী তার অনুকৃত জাল সূরাগুলোকে আল্লাহর কাছ থেকে অবতীর্ণ বলেই দাবী করতেন। এই জাল সূরাগুলোর রেকর্ড বর্তমানে অতি অল্পই পাওয়া যায়। মুস্তাফা রাফেয়ী এই কৃত্রিম সূরাগুলোকে অতি নিখুঁতভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মন্তব্য করেছেন যে, পবিত্র কুরআনের সঙ্গে কোনক্রমেই সেগুলোর তুলনা হতে পারে না।

কথিত আছে যে, বুওয়াহিদ শাসনকর্তা আযদুদ্দাউলাহর পুরস্কার সম্পদে বিভূষিত হয়ে প্রত্যাবর্তনকালে তিনি ব্যাবিলনে এক দস্যুদল কর্তৃক আক্রান্ত হন। প্রাণভয়ে তিনি পলায়ন করছিলেন। এমন সময় তাঁর ভৃত্য কাতিক বললো : "আপনি সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করছেন অথচ আপনার অমর কাব্যে নিজেই এই উক্তি করেছেন :

الخيل والليل والبيداء تعرفني

والسيف والرمح والقرطاس والقلم -

১. আল-মা'আরীর 'রিসালাতুল গুফরান' দ্রষ্টব্য : পৃষ্ঠা ২২০।

বিপুল অশ্বারোহী সৈন্য, রাত্রির অন্ধকার, বিপদসংকুল মরু-প্রান্তর, হাঙ্গামা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ, মসী, লেখনী ও কাগজ—সবই আমাকে ভালো-রূপে চেনে।

একথা শুনে তিনি রুখে দাঁড়ালেন এবং দস্যুদল কর্তৃক তথায় নিহত হ'লেন (৩৫৪ হিজরী; ৯৬৫ খৃীঃ)। বস্তুত তাঁর হঠকারিতা এবং কাব্য-প্রীতিতাই তার মৃত্যুর একমাত্র কারণ।[১]

কথিত আছে যে, একদা যখন তিনি কুরআন মজীদ দেখছিলেন, ঠিক সেই সময় তাঁর এক বন্ধু প্রবেশ করলেন; কিন্তু আল মুতানাব্বীর কুরআন সম্পর্কীয় ধর্মবিরোধী মতবাদের জন্য বন্ধুটি তাঁর কুরআন দেখাকে পছন্দ করলেন না। সুতরাং আল-মুতানাব্বী তাঁকে বললেন: তাঁর সর্বপ্রকারের আলংকারিক প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও এই মক্কাবাসী নিজেকে কবিতায় প্রকাশ করতে সমর্থ হননি।[২]

তাঁর এই ধর্মবিরোধিতামূলক মনোভাব সম্বন্ধীয় এ গল্পটি যদি সত্য হয়, তবে একথা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি গদ্য অপেক্ষা কবিতায় অলংকার প্রয়োগ অধিকতর স্পষ্ট বলে বিবেচনা করতেন।

আর যারা কুরআনের গদ্য ভঙ্গীনে দৃষ্টান্তস্বরূপ দাঁড় করিয়ে কবিতা অপেক্ষা গদ্যের প্রাধান্য দিতে চান, (মুযহির খণ্ড ২, পৃঃ ২৩৬) তাঁদের এই দাবীকে খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন যে, কুরআন গদ্যে অবতীর্ণ হয়েছে এবং কাব্যিক গঠনের স্বাভাবিক সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হ'য়েও এর পূর্ণ-তার অনন্যতা অধিকতর বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে।

---

১. Dr. Nicholson's Literary History of the Arabs and Anthology of al-Mutanabbi.

২. F. Gabrieli, RSO, XI (1926), 33—34

আল-মুতানাব্বীর প্রতিদ্বন্দ্বী কুরআন এখনও সংরক্ষিত রয়েছে এবং এ থেকে একটি স্তবক অনুবাদ করেছেন R. Blachere, 1935, Paris, P, 67,

পবিত্র কুরআনের খ্রীস্টান সমালোচকগণ গ্রন্থটির রচনাপদ্ধতি সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেন। স্পেনীয় আলবারো কুরআনের ভাষাগত সৌন্দর্যে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছেন।[১]

মুতাকাল্লিম আবুল হাসান আশ'আরী

(মৃত্যু ঃ ৩২৩ হিঃ—৯৬৫ খ্রীঃ)

আল-মুতানাব্বীর অব্যবহিত পর এই ময়দানে অবতরণ করেন আবুল হাসান আলী-বিন ইসমাঈল। আশ'আরী তথা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা-আতের সর্বজনমান্য কালাম বা ধর্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি ২৬০ হিঃ—৮৭৩ ঈসায়ীতে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন আবু মূসা আশ'আরীর (রাঃ) নবম অধঃস্তন বংশধর। ইনি প্রথমে ছিলেন মু'তাযিলা, কিন্তু পরে সুন্নী মতবাদকে অবলম্বন ক'রে অন্যতম মুতাকাল্লিম হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। আবুল হুজাইলের মৃত্যুর পর মু'তাযিলা মতবাদের বিশিষ্ট ইমাম আবু আলী যুব্বাইর কাছে তিনি তাঁর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। মু'তাযিলা চিন্তাধারাকে (School of Thought) পরিহার করার পর ইমাম আশ'আরী খলীফা মামুনের যুগের শ্রেষ্ঠ মুতাকাল্লিম ইবনু কুল্লাবের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করেন। এরপর থেকেই তিনি মু'তাযিলী আকীদার তীব্র প্রতিবাদে লেখনী চালাতে আরম্ভ করেন। অবিশ্রান্ত-ভাবে, অস্থিরগতিতে। তাঁর এই সময়ের রচিত দু'খানা বইয়ের নাম হচ্ছে যথাক্রমে 'কিতাবুল লুমা' এবং 'কাশফুল আসরার-অ হাতকুল আসতার'। প্রথমোক্ত বইটির শারাহ লিখেছেন কাযী আবু বকর বাকিল্লানী।[২]

---

১. See The Preaching of Islam, by Thomas W. Arnold, 2nd Edition. London 1913 P. 138: The Encyclopaedia of Islam: 2, 1021, Al Kindi, Apology.

২. ইবনু আসাকির ঃ ২১৫ পৃষ্ঠা এবং আশ-শিফা ফী তা'রীফিল মুস্তাফা; কাযী আইয়ায ঃ পৃঃ ২৫৭।

ইমাম আশ'আরীকে মুতাকাল্লিমুনদের মধ্যে এ জন্য গণ্য করা হয় যে, তিনি তাঁর সালাফীদের মতবাদকে বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা করণার্থে ইল্‌মে কালামকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতেন। এ সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া বলেন ঃ

كما رجع الأشعرى من مذهب المعتزلة سلك طريق ابن كلاب ومال الى اهل السنة والحديث وانتسب الى الامام احمد كما قد ذكر ذلك فى كتبه كلها كالابانة والموجز والمقالات وغيرها ـ

ইমাম আশ'আরী মু'তাযিলাদের মতবাদ পরিত্যাগ করার পর ইবনু কুল্লাবের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করেন এবং আহলে সুন্নাত ও আহলে হাদীসদের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তাই তিনি ইমাম আহমদের দিকে মানসুব হন। একথা স্বয়ং তিনি তাঁর বিভিন্ন পুস্তক, যেমন—'ইবাণ' মু'জায ও 'মাকালাত', ইত্যাদিতে বর্ণনা করেছেন।[১]

এরপরে শুরু হয় মু'তাযিলাদের সাথে ইমাম আশ'আরীর মুনাযারা বা তর্কযুদ্ধ। যেহেতু তিনি ছিলেন মু'তাযিলাদের ঘরের খুঁটিনাটি সব খবর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল, তাই তাঁর সাথে তর্কযুদ্ধে পেরে উঠা মু'তাযিলীদের পক্ষে একান্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। যে ইল্‌মে কালামের উপর ভিত্তি করে মু'তাযিলিগণ তাঁদের যুক্তিতর্কের বিরাট সৌধমালা নির্মাণ করেছিলেন, আল আশ'আরী ছিলেন সেই ইল্‌মে কালামের মস্তবড় সুপণ্ডিত। তাই অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শাব্দিক কূটতর্ক তুলে তাঁর নিকট বাজীমাত করা মু'তাযিলীদের পক্ষে কোনক্রমেই যেন আর সম্ভবপর হ'য়ে উঠছিল না। এভাবে উপর্যুপরি বিভিন্ন তর্কযুদ্ধে বহু মু'তাযিলী পণ্ডিতকে নাজেহাল করার ফলে আল-আশ'আরীর অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে

১. ইজতিমাউল জুয়ূদিল ইসলামিয়া ঃ পৃষ্ঠা ২১০।

পড়লো দ্রুতগতিতে এবং জ্ঞানপিপাসুরা তাঁর অগাধ জ্ঞান ভান্ডারের মদিরা পান লালসে মধুমক্ষিকার ন্যায় তীব্রবেগে ছুটে আসলেন চতুর্দিক থেকে। ইমাম মুহাম্মাদ বিন খাফীফ সিরাজীর একটি উক্তি থেকেই আমরা অতি সহজে আল আশ'আরীর বিদ্যাবত্তার কথা সম্যক উপলব্ধি করতে পারি। তিনি বলেছেন :

دعانی لدب وحب ادب وولوع وشوق ان احرک نحو البصرة رکابی فی عنفوان شبابی لکثرة ما بلغنی عن لسانی البدوی والحضری من فضائل شیخنا ابی الحسن الاشعری لاسعد بلقاء ذلک الوحید واستفید مما فتح الله تعالی من منابع التوحید اذحاز فی ذلک الفن قصب السباق وکان ممن یشار الیه بالاصابع فی الافاق وفاق الفضلاء من ابناء زمانه واشتاق العلماء الی استماع بیانه —

যৌবনের প্রারম্ভে আরবী সাহিত্য ও জ্ঞান-চর্চার প্রতি অদম্য মোহ ও প্রবণতাই একদিন আমাকে বসরাভিমুখে যাত্রা করার জন্য আহবান জানালো। কারণ ইতিপূর্বেই আমি প্রতিটি শহর ও মফস্বলবাসীর নিকট থেকে সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিটির গুণ-গরিমার কথা শুনে আসছিলাম। তাই তাঁর সঙ্গে মুলাকাত করতে এবং তাওহীদ সম্পর্কে যে সব বিদ্যার দ্বার তাঁর সম্মুখে আল্লাহ্ পাক উদঘাটিত করেছেন, তা থেকে কিয়ৎ পরিমাণ উপকৃত হওয়ার মানসে আমি বেরিয়ে পড়লাম। কারণ তিনি এ বিদ্যায় সকলকে ছাড়িয়ে অতি উর্ধ্বে উঠেছিলেন। এমন কি তিনি সকলের অঙ্গুলী নির্দেশের পাত্র হয়ে স্বীয় যুগের ওলামায়ে কিরামের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর মুখ-নিঃসৃত বাণী শ্রবণে সব আলিমই একান্ত উৎসুখ ও আগ্রহশীল।

ইমাম আশ'আরী একজন পুরোপুরি মুতাকাল্লিম হলেও তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ ও তর্কশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। বস্তুত তিনি

ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ তর্কবাগীশ। তাঁর তর্কানুষ্ঠানগুলোর কিছু কিছু আলোচনা 'আজ' তাবাকাতুস শাফেয়ীয়্যাহ' নামক অমর গ্রন্থে পাওয়া যায়। তিনি কুরআনের একখানা সুন্দর তাফসীর লিখে ৫০০ শত খণ্ডে তা সমাপ্ত করেন। তিনি স্বয়ং তাঁর গ্রন্থরাজির যে সূচী প্রদান করেছেন তাতে তাঁর তাফসীর সম্বন্ধে লিখেছেন :

والفنا كتاب تفسير القران وردنا فيه على الجبائى
والبلخى ماحرفا من تاويله —

আমরা কুরআনের একখানি তফসীর লিখেছি যাতে আমরা জুব্বাঈ ও বালখীকৃত কদর্থগুলোর প্রতিবাদ জানিয়েছি।

'মালাকাতুল ইসলামিউন' তার ইজায সম্পর্কে অতি মূল্যবান প্রবন্ধের সমষ্টি।

ইমাম আশ'আরী রচিত অন্য গ্রন্থেও ই'জায সম্পর্কে সুন্দর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাছাড়া এই ই'জায শাস্ত্রকে কেন্দ্র করেও বিশেষভাবে তিনি লেখনী চালিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তার অধিকাংশ গ্রন্থই আজ কালের আবর্তনের সাথে সাথে ধরাপৃষ্ঠ থেকে অবলুপ্ত হয়েছে। অবশ্য তাঁর অভিমতগুলো কিছু কিছু অন্যান্য লেখকদের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।[১]

ইমাম আল-আশ'আরীর মতে কুরআনের এই চিরন্তন চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ্ই অবগত আর সমস্ত মানবকুল নাকি অপরিজ্ঞাত। কিন্তু ইবনু[২] হাজাম তাঁর এই অভিমতের উত্তর দিয়েছেন যে, যদি এটা মানবের

১. ইসলামিক কালচারে প্রকাশিত মনীষী আবদুল আলীমের প্রবন্ধ; ১ নং, ২৩শ বর্ষ।

২. ইবনু হাজামের 'আল-ফিসাল ফিল মিলাল ওয়াল আহ্ওয়া ওয়ান নিহাল' The Arbiter on sects, views and Reports; P. 15 etseq. এবং আল্লামা শেহরাস্তানী কৃত আল-মিলাল-ওয়ান-নিহাল : ১ম খণ্ড; পৃষ্ঠা ১২৪—২৫, কায়রো; ১৩২০ হিজরী।

নাগালের বাইরেই হতো তবে তাদেরকে এতদ্বারা চ্যালেঞ্জ দেয়া সম্ভব হতো কি করে? আর-রাফেয়ী তাঁর ইজাযুল কুরআনে এই উভয় মনীষীর পরোক্ষ বাদানুবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আল আশ'আরীর 'আল-কাস্‌ব' মতবাদ বা Theory of Acquisiton সম্বন্ধে হামুদা গোরাবা একটা সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছেন।[১]

আবুল হাসান আশ'আরী ছিলেন একজন সৃষ্টিধর্মী লেখক। জীবনের শেষভাগকে তিনি শুধুমাত্র বই লেখার জন্যই নিজেকে সর্বতোভাবে কুরবান করেছিলেন। তাঁর বিরচিত শতাধিক গ্রন্থের মধ্যে পবিত্র কুরআনের বিস্তৃত তাফসীর এবং 'মাকালাত-আল ইসলামীন' নামক গ্রন্থদ্বয়ই সম্ভবত তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। এই শেষোক্ত গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি শুধু যে কুরআনের ই'জায সম্পর্কে তার বিস্তারিত মতামত ব্যক্ত করেছেন তা নয়; বরং গ্রীকদর্শনকে গোঁড়া ধর্মমতের ছাঁচে ঢালাই করে ধর্মীয় বিধান, মতবাদ ও মূলসূত্রগুলোর আক্ষরিক ভাষ্য কিভাবে সম্ভবপর হ'তে পারে, তারও একটা অনুপম দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন তিনি। এজন্যই সম্ভবত ইমাম আশ'আরীকে 'ইলমুল কালাম' বা দর্শনের জন্মদাতা বলে স্বীকার করা হয়েছে।

তাঁর অপর গ্রন্থ অর্থাৎ বিস্তৃততম তাফ্‌সীরের কথা উল্লেখ করেছেন 'আল-আওয়াসেম আনিল কাওয়াসিম' নামক পুস্তকের রচয়িতা হাফিয আবু বকর ইবনে আরাবী। ইমাম আশ'আরীর এই অমূল্য তাফসীর পাঁচ শত খণ্ডে সমাপ্ত। এই বিরাট তাফসীরকে অধ্যয়ন করতে গিয়ে পাঠকের স্বভাবতই যে একটা ধৈর্যচ্যুতি ঘটার কথা, তা চিন্তা করে অতি দূরদর্শী লেখক আল্লামা আবদুল জাব্বার হামদানী 'মুহীত' নামে একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ সংকলন করেন। এটা তার সারাংশ মাত্র।

দুঃখের বিষয় যে, ইমাম আশ'আরীর মূল তাফসীরখানি আজ বিশ্বজগতের কোন পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে বলে আমরা অবগত হ'তে পারিনি। কথিত

১. See The Islamic Quarterly. vol. II No. April 1955. "Al-Asharis Theory of Acquisition" by Hammonda Ghoraba Ph. D. Al-Azhar, Ph. D., Cambridge.

আছে যে, সায়েদ বিন আব্বাস নামক জনৈক মু'তাযিলী বাগদাদের সরকারী লাইব্রেরীতে সুরক্ষিত এর পাণ্ডুলিপিগুলোতে অগ্নিসংযোগ করার জন্য দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ঘুষ দেয়।

বিখ্যাত জীবনী লেখক ইবনে খাল্লিকান বলেন: আল-আশ'আরী গোঁড়া ধর্মমতের একজন বিশিষ্ট সমর্থক ছিলেন। মদ গর্বিত মু'তাযিলারা যখন আকাশে মাথা তুললো, ঠিক সে সময় আল-আশ'আরীর আগমনে তাদের অবসান ঘটলো। আল আশ'আরীর ধর্ম মতবাদের প্রধান সমর্থক ও ভাষ্যকার ইবনুল আসাকীর (১১০৫—১১৭৫) তাঁকে ইসলামের পুনরুজ্জীবন দানকারী প্রধান নেতা হিসেবে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং মু'তাযিলা প্রভৃতি যুক্তিতর্কের মতবাদী দলকে ইসলামের ঘোর বিরোধী বলে সোজা গালাগাল করেছেন।

ইবনু আসাকীর ইমাম আবুল হাসান আল আশ'আরী কর্তৃক 'ক্ষতিকর অসত্যের স্বরূপ প্রকাশ' নামক গ্রন্থে আল আশ'আরীর ধর্মমতবাদের ২৪টি বিভিন্ন দফার বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন।

আল আশ'আরীর শিক্ষা সারা প্রাচ্যখণ্ডে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে, এ কথার দ্বিমত নেই। প্রাথমিক অবস্থায় তাঁর শিক্ষা অবশ্য যুক্তিবাদীদের হাতে বেশ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলো, কিন্তু শেষে ইমাম গাযযালীর ন্যায় মনীষীর সমর্থনে এবং নিযামুল মুলক প্রমুখ রাষ্ট্রীয় কর্ণধারের পৃষ্ঠপোষকতায় আল আশ'আরীর মতবাদ সমগ্র মুসলিম জগতে স্বীকৃত হতে থাকে। এবং যুক্তিবাদিতা ও ধর্মবাদিতার দ্বন্দ্বে সাধারণ মুসলিম শেষোক্ত দলেরই পুষ্টিসাধন করতে থাকে।

প্রখ্যাত পণ্ডিত সৈয়দ আমীর আলী বলেন: আবুল হাসান আশ'আরী ও আল-গাযযালীর প্রভাবে যে প্রতিক্রিয়াশীল প্রগতিবিমুখ অবস্থার সৃষ্টি হয় তার সঠিক চিত্র অংকন করা অসম্ভব। আল-বিরুনীর 'আল-আসারুল বাকীয়াহ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের সম্পাদক প্রাচ্যতত্ত্ববিদ পণ্ডিত Mr. E. বলেন যে, আল-আশ'আরী ও আল-গাযযালী না জন্মালে আরবরা শুধুমাত্র গ্যালিলিও, কেপলার ও নিউটনদের জাতি হয়ে থাকতো।

আবুল হাসান আল্-আশ'আরীর তাফসীর ও 'মাকালাতুল ইসলামিউন' প্রমুখ গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গোড়ামিশূন্য ও সৃষ্টিধর্মী রচনাবলীর মাধ্যমে 'ই'জাযুল কুরআনের ধারাবাহিক উন্নতি ও উৎকর্ষ সম্পর্কে অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সন্ধান পাওয়া যায়। 'মাকালাতুল ইসলামিউন' নামক এই শেষোক্ত গ্রন্থটিকে জনাব মহীউদ্দীন আবদুল হামীদ সাহেব তাঁর নিজস্ব টীকা টিপ্পনী ও ভ্রম সংশোধনসহ অতি যত্ন সহকারে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন বেশ কয়েক খণ্ডে। এই জ্ঞানগর্ভ বইয়ে সমকালীন মুসলিম সম্প্রদায়গুলোর বর্ণনাও রয়েছে। ইমাম আশ'আরী লিখিত আল ইবানা আন উসূলিদ দিয়ানাহ' এবং 'রিসালাহ্ ফিল ইস্তিহসান' নামক গ্রন্থদ্বয় অত্যন্ত মূল্যবান। দু'টিই হায়দরাবাদ থেকে প্রকাশ পেয়েছে।

আবু হাইয়ান তাওহিদী

আবু হাইয়ান তাওহিদী (৩১০-৪০০ হিজরী) 'ই'জায' সম্পর্কে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেন। [১]

ইমাম সুয়ূতী স্বীয় 'আল-ইত্কান" গ্রন্থে উপর্যুপরি আবু হাইয়ানের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বরাতও দিয়েছেন। [২]

তাওহিদী একজন প্রথিতযশা আলিম, স্বনামধন্য দার্শনিক ও খ্যাতিমান লেখক ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি আল-জাহিযের ভক্ত ও অনুসারী ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি জাহিযের প্রভাবে ছিলেন সম্পূর্ণরূপে প্রভাবান্বিত। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, এত অগাধ পাণ্ডিত্য আর এত বিদ্যাবত্তা সত্ত্বেও ভাগ্য কোনদিন তার সুপ্রসন্ন হয়নি। জীবনেও তাই কোনদিন সচ্ছলতা ও আরাম-আয়েশের ছোঁয়াচ তিনি পান নি। বরং উপর্যুপরি দারিদ্র্যের কষাঘাতে অহরহ জর্জরিত হয়ে জীবনের দিনগুলো

---

১. ইয়াকুত কৃত ইরশাদুল আরীব ঃ ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮০।

২. "আল ইত্কান ফী উলূমিল কুরআন" আল্লামা জালাল সুয়ূতী ; ২য় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ১১৮।

তাকে অতিবাহিত করতে হয়েছে। জীবন সংগ্রামে তাঁর এই একান্ত ব্যর্থতা ও হতাশার ছায়া নেমে আসার অনেকটা কারণ ছিল এই যে, একদা তিনি বুআইহিদ বংশীয়দের প্রখ্যাত উযির মুল কিফায়াতাইন ইবনুল আমিদ ও সাহেব বিন্ আব্বাদ (মৃত্যু ৩৮৫ হিঃ)-এর কোপে পড়েছিলেন। তার অপ্রসন্ন ভাগ্যলিপির ফয়সালা আরও দ্রুততর হয়ে যায়, যখন তিনি উপরিউক্ত মন্ত্রীদ্বয়ের বিরুদ্ধে 'মাসালিবুল অযির ইন' নামে একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন।

আবু হাইয়ান তাওহিদী বহু গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন। তন্মধ্যে প্রায় ১৭ খানা পুস্তকের ফিহরিস্তি দিয়েছেন ইয়াকুতরুমী।[১]

ডঃ আহমদ আমীন ও হাসান সান্দুবী স্বীয় প্রচেষ্টায় তার কিছু কিছু বই প্রকাশ করেছেন। যাই হোক, তাওহিদীর শুধুমাত্র নিম্নলিখিত বইগুলোই বহির্জগতের আলো দেখার সুযোগ পেয়েছে। যেমন :

১. 'কিতাবুল মুকাবাসাত'
২. 'কিতাবুল ইম্তা ওয়াল মুআনাসাত'
৩. 'আল-বাসাইর ওয়ায-যাখাইর'
৪. 'রিসালাহ ফী আস্-সাদিক ওয়াস্-সাদকাহ
৫. 'আল-হাওয়ামিল ওয়াস্-শাওয়ামিল'
৬. 'মাসালিবুল অযিরাইন'

মুতাকাল্লিম বানদার আল-ফারেসী

আবু হাইয়ান তাওহিদী স্বীয় গ্রন্থে 'ই'জায' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বান্দার আল ফারেসীর অভিমতকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন : বানদার আল-ফারেসীকে 'ই'জায' সম্পর্কে তার অভিমত জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিতেন যে, ইহা একটা শাশ্বত সত্য। বস্তুত কুরআনের প্রতিটি অংশই একেবারে অনন্য অনবদ্য এবং চিরন্তন 'মু'জযা'। আঁধার কুহেলিকায় ইহা

১. ইয়াকুত কৃত ইরশাদুল আরীব; ৫ম খণ্ড : পৃষ্ঠা ৩৪২।

নিয়মিত পাঠকবর্গের জন্য দিকদিশারী ও পথ নির্দেশক। এজন্য বোধ করি নিখিল ধরণীর মানবকুল এতে বিমোহিত প্রাণ। বাগদাদর ফারেসীর এ উক্তি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ছিলেন পুরোপুরি মুতাকাল্লিম এবং অতি চাতুর্যের সাথে তিনি এ বিষয়বস্তুর বিস্তারিত আলোচনাকে এড়িয়ে গেছেন। তিনি বিভিন্নমুখী প্রমাণপঞ্জী পেশ করার পরিবর্তে শুধু এই দাবী করেই ক্ষান্ত হয়েছেন যে, কুরআনে সবকিছুর 'মু'জিযা' এবং নবী করীম (সঃ)-এর নবুওতের একটা জ্বলন্ত প্রতীক। এভাবে তার অভিমত কুরআনের ইজাব শাস্ত্রে একটা নতুন দিকের প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হয়েছে।

কুদামা আল কাতিব এবং ইবনু দুরাইদও এ সময়ে ইজায সম্পর্কে বই লিখেছেন।

মুফাসসির আত-তাবারী

আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারীর আত্ তাবারী (মৃত্যু ৩১ হিজরী) তাঁর অমূল্য তাফসীরে সূরাতুল বাকারার ২৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইজায সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন।[১]

তিনি তাঁর এই অনবদ্য তাফসীরখানাকে ৩০ খণ্ড এবং ৩০ হাজার পৃষ্ঠায় সমাপ্ত করতে ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু পরে শিষ্যদের পুনঃ পুনঃ সনির্বন্ধ অনুরোধে তাঁকে তিন হাজার পৃষ্ঠার এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণে সমাপ্ত করতে হয়। আবুবকর প্রমুখ মনীষী এরও আবার সংক্ষিপ্ত এডিশন বের করেন। অতঃপর ইহা ফারসীতে অনূদিত হয়।[২]

সৌভাগ্যক্রমে ইমাম তাবারীর এই অমূল্য তাফসীরখানা সুদীর্ঘ এক হাজার এগার বছর পর ১৯০০ খৃস্টাব্দে প্রথমে মিসরের ময়মনা প্রিন্টিং

---

১. অফয়াতুল আয়ান ; ইবনু খাল্লিকান ও তারীখে খাতীব বাগদাদী।
২. ফিহিরিস্ত ইবনে নাদীম : পৃষ্ঠা ৩২৭।

প্রেসে এবং পরে বুলাক প্রেসে ৩০ খণ্ডে ছাপিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে।[১] কুরআনের যে সমস্ত আয়াতের মাধ্যমে মক্কাবাসীদের মুহম্মদ চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছিল, ইবনু জারীর তৎসম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। প্রকাশ্য মজলিসে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কুরআনের শেষ চ্যালেঞ্জটি এরূপ :

'হে অবিশ্বাসিগণ। কুরআন যে আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থ, এ সম্বন্ধে যদি তোমরা বিন্দুমাত্রও সন্দিহান হও তবে ভাল কথা, এমন মনোহর ভাষা, গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ভাব, এহেন শিক্ষাপ্রদ উপমা ও আখ্যান, সর্বসাধারণের বোধগম্য স্বাভাবিক ও সুন্দর উপদেশাবলী এবং উজ্জ্বল ও অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত একটি সূরা তোমাদের নিজেদের প্রয়াসে অথবা তোমাদের দেশবিখ্যাত কবিকুলনন্দিত মুরুব্বী ও সমপূজিত দেবদেবীগণের সহায়তায় উপস্থাপিত কর, কারণ তোমরাই ভাষাবিজ্ঞ সুদক্ষ পণ্ডিত আর তিনি তো নিরক্ষর—উম্মী, তা হলেই বুঝতে পারবো যে, তোমরা সত্যবাদী; কিন্তু মনে রেখো এটা তোমাদের সম্পূর্ণ সাধ্যাতীত। অতএব যদি যথার্থ কল্যাণ চাও তবে আমার কঠোর শাস্তির ভয় কর আর এই পবিত্র ঐশী বাণীকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করো'।[২]

ইজাযের প্রশ্নে ইমাম তাবারীর মতামতগুলোর সারমর্ম নিম্নরূপ নির্ণয় করা যেতে পারে :

১. এই মহাগ্রন্থের অমোঘ-বাণী একটা অবিনশ্বর 'মু'জিযা' এবং এভাবেই এই চিরন্তন 'মু'জিযা' চিরতরে অক্ষুণ্ণ থাকবে। মানুষ তার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা দ্বারাও কোনদিন এর প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হবে না।

২. পবিত্র কুরআনের বক্তব্য বিষয়কে সার্থক ও সুন্দরভাবে বর্ণনা করতে এতদূর সিদ্ধহস্ত যে, একে 'মু'জিযা' ছাড়া অন্য কিছু বলার কোন উপায় নেই।

---

১. See Prof. Nicholson's Literary History of the Arabs P. 351 এবং জুরজী যায়দানের তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়াহ : ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৯।

২. তাফসীরে সূরাতুল বাকারা : ২৩ ও ২৪ নং আয়াত।

৩. কুরআন সমগ্র আরববাসীকে প্রকাশ্যভাবে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে তাদের নিজস্ব ভাষায়।

৪. কিন্তু আরবরা এর মুকাবিলা করতে সম্পূর্ণরূপে অপারগ হয়েছে; আর মুসায়লামার ন্যায় যারা এর মুকাবিলার অপচেষ্টা করেছে, তাদের সে মুকাবিলা একটা বাতুলতা মাত্র।

পবিত্র কুরআনের রচনারীতি প্রসঙ্গে আত-তাবারী বলেন: আমাদের এই সুমহান গ্রন্থটির সাহিত্যশৈলী ও তার অসাধারণ গুণাবলী পূর্ববর্তী সমস্ত ঐশী গ্রন্থের গুণাবলীকে অতিক্রম করেছে নিঃসংকোচে। কত প্রখ্যাত-নামা সমসাময়িক সেরা কবি আর যুগযুগান্তরের কত সাহিত্যরথী বাগ্মীরা সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছে কুরআনের অনুরূপ বাণী রচনা করতে; কিন্তু তবুও পারেনি। তাদের সকল সাধনা ও প্রচেষ্টা একান্তভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।[১]

আল কুম্মী মুফাসসির (Exegete)

হিজরী ৪র্থ শতক এবং খ্রীস্টীয় দশম শতকের অন্যতম নেতৃস্থানীয় মনীষী নিযামুদ্দীন হাসান বিন মুহাম্মদ আল-কুম্মী নিশাপুরী (মৃত্যু ৩৭৮ হিঃ ৯০০ খ্রীস্টাব্দ) কুরআনের ইজাযকে নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। কিন্তু স্বীয় যুগের একজন ক্ষণজন্মা মুফাসসির হওয়া সত্ত্বেও তিনি এই আলোচনা প্রসংগে স্থানে স্থানে মুতাকাল্লিমদের আশ্রয় নিয়েছেন এবং তাদেরই দৃষ্টি-ভংগী ও ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন। অন্যান্য মুফাসসিরদের দৃষ্টান্ত পেশ করতে গিয়ে তিনি ই'জাযের এই অনন্ত সম্ভাবনাকে অতি দিগন্ত বিস্তৃত ও ব্যাপকভাবে লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরেছেন। অবশ্য এ করতে গিয়ে দর্শনশাস্ত্র ও ইলমে কালাম থেকে গৃহীত বহু প্রমাণপঞ্জী ও সাক্ষী-সাবুতের সাহায্য নিতে হয়েছে। পণ্ডিত আবদুল আলীমের বর্ণনানুসারে আল

১. তাফসীর ইবনু জারীর তাবারী: ১ম খণ্ড: পৃষ্ঠা ৬৫।

কুম্মীর এটা দৃঢ় বিশ্বাস যে, এ পর্যন্ত শুধু কুরআনের মু'জিযার প্রতিই বিভিন্ন মনীষীর কলম দ্বারা কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে মাত্র, কিন্তু এর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা ও অন্যান্য বর্ণনাগুলো এখনও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। এ পর্যন্ত কেউ সেগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করে নি।[১]

আল-কুম্মী বলেন : ই'জায শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত যেন একটা চকচকে তকতকে স্বর্ণখণ্ডের ন্যায় অথবা লাবণ্যময় শুভ্র মুখশ্রীর ন্যায়। কারণ এই উভয় বস্তুকেই চেনা যায় অতি সহজে, কিন্তু এদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা বা এনালাইসিস করাই হচ্ছে মুশকিল। আল-কুম্মীর মতে সারফাহ (deflection) মতবাদের মাধ্যমে কুরআনের ই'জাযকে স্বীকৃতি দান করা একটা মারাত্মক ভুল।[২] ই'জায শাস্ত্রের বিস্তৃত আলোচনা সম্বলিত যে অনবদ্য তাফসীরটি আল-কুম্মী রচনা করেছেন, তার নাম 'গারাইবিল্ তানযীল' একে তাফসীর কাবীরের সংক্ষিপ্ত সার বললেও অত্যুক্তি হয় না। ১২৮০ হিজরীতে উহা তেহরানে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। ১৩৩০ হিজরীতে তাফসীরে তাবারীর সাথেও উহা একবার ছাপা হয়েছিল। প্রসংগত আমাদের মনে পড়ে যে, কুম্মী নামে শিয়াদেরও একজন বিশিষ্ট গ্রন্থকার রয়েছেন। শিয়া সম্প্রদায়ের মাঝে তিনি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে 'শায়খ সাদুক' উপাধিতে ভূষিত। তিনি পয়দা হয়েছিলেন এবং ওফাত পেয়েছিলেন 'রেই' নগরে। তাই অনেকের কাছে রাযী নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু উপযুক্ত তা'লীম ও তরবিয়াত পেয়ে তিনি মানুষ হয়েছিলেন এই 'কুম' নগরে। এইজন্যই সবার কাছে তিনি মুহাদ্দিস 'কুম্মী' নামে সুপরিচিত। মুহাদ্দিস কেলিনীর পরেই তাঁর স্থান। কুম্মীর লিখিত গ্রন্থরাজির মধ্যে 'আকাইদুস শিয়া' ও 'মাসলা ইয়াহযুরুহুল ফাকীহ' শিয়া সম্প্রদায়ের কাছে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। প্রথমোক্ত গ্রন্থে রয়েছে শিয়াদের উদ্ভট উদ্ভট আকীদার সমাবেশ। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, তাঁদের ইমাম হঠাৎ করে তাঁর জীবনের এক বিশিষ্ট লগ্নে নাকি লোকচক্ষুর অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে যান। তাঁদের শেষ

১. ইসলামিক কালচার; ৩২শ বর্ষ : ১ম ও ২য় সংখ্যা।

২. 'সারফাহ' শব্দটির বিশ্লেষণ ও আলোচনা ইতিপূর্বেই করা হয়েছে।

ইমাম আবুল কাসেম মুহাম্মদ নাকি এভাবে অদৃশ্য হওয়ার পর এখনও বেঁচে আছেন এবং রোয কিয়ামত পর্যন্ত থাকবেন।

আল-ওয়াসেতী

আল-ওয়াসেতী, সাহিত্যিক ও মুতাকাল্লিম শায়খ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ আল-ওয়াসেতী আল-মু'তাযিলী (মৃত্যু ৩০৩ হিজরী; ৯১৪ খৃঃ) তার ই'জাযুল কুরআন ফী নাযমিহি ওয়া তা'লীফিহি' নামক নির্ভরযোগ্য অনবদ্য গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পর্যালোচনা দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, কুরআনের বাকরীতি, ভাষাশৈলী ও ভাবধারা সবকিছুই হচ্ছে এর অমর 'মু'জিযা। নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, বইটি এখন দুষ্প্রাপ্য। তাই এর আভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হওয়া আমাদের জন্য হয়েছে দুষ্কর। আর-রাফেয়ীও তাই শুধু আল-ওয়াসেতীর নামোল্লেখ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও পুস্তক সম্বন্ধে তিনি কোন বিশদ বিবরণ দিতে পারেন নি। তবে একথা তিনি উল্লেখ করেছেন যে, শায়খ আবদুল কাহির আল-জুরজানী (মৃত্যু ৪৭৪ হিজরী) হচ্ছেন ই'জায সম্পর্কে আল ওয়াসেতীর পরবর্তী লেখক এবং আর-রুম্মানী (মৃত্যু ৩৮২ হিজরী) তার পূর্ববর্তী লেখক। আবদুল আলীম ও আর-রাফেয়ী—উভয়েই এ বিষয়ে একমত যে, আল-ওয়াসেতীর উপরিউক্ত গ্রন্থের একটি বিস্তারিত পারায় লিখেছেন, তাঁর পরবর্তী লেখক শায়খ আবদুল কাহির আল-জুরজানী। এই বিশদ ব্যাখ্যাটির নামই হচ্ছে 'আল-মু'তাযিদ। পরবর্তীকালে 'আল-মু'তাযিদের'ই আর একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বের করেছিলেন শায়খ আল-জুরজানী; কিন্তু মনে হয়, এটির অস্তিত্বও এখন খুঁজে পাওয়া ভার হয়েছে। একথাও প্রণিধানযোগ্য যে, শায়খ আল-জুরজানী এই অন্যতম খিদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন তাঁর 'দালাইলুল ই'জায' ও 'আসরারুল বালাগাহ' নামক অমর গ্রন্থদ্বয় লিপিবদ্ধ করার পূর্বেই। আর-রাফেয়ী বলেনঃ "জাহিরে কর্মপ্রবাহের উপর ভিত্তি করেই আল-ওয়াসেতী তাঁর কাজ শুরু করেন এবং আল-ওয়াসেতীর উপর ভিত্তি করেই শায়খ

আবদুল কাহির তাঁর অমূল্য গ্রন্থরাজির মাধ্যমে ই'জায শাস্ত্রের সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করেন।"

আর-রুম্মানী, সাহিত্যিক ও মুতাকাল্লিম

এই শতকের আর একজন লেখক হচ্ছেন আবুল হাসান আলী বিন ঈসা আর-রুম্মানী (মৃত্যু ৩৮২ হিজরী)। তাঁর 'ইজাযুল কুরআন' গ্রন্থে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর-রাফেয়ী বলেন: 'কুরআন পাকের অপূর্ব ভাষা-শৈলী ও রচনারীতি হিসাবে এর অমর 'মু'জিযাকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃতি দেওয়ার দিক দিয়ে আর-রুম্মানী হচ্ছেন তৃতীয় পর্যায়ের মনীষী। প্রথম ও দ্বিতীয় হচ্ছেন যথাক্রমে আল-জাহিয এবং আল-ওয়াসেতী।

ইবনু সিনান খাফফাজী স্বীয় 'সিররুল কুরআন' গ্রন্থে আর-রুম্মানীর অভিমতকে ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন: "আর-রুম্মানী কালামকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন:

১. মুতানাফির (Contradictory)

২. মুতালাইম ফী-আত্-তাবাকাতিল উস্তা (Harmonions in the middle stage).

৩. মুতালাইম ফী আত্-তাবাকাতিল উলিয়াহ (Harmonions in the higher stage)

আর-রুম্মানীর অভিমত অনুসারে আল-কুরআন তৃতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ ইহার সর্বোচ্চ পর্যায়ের ঐক্যতান বিশিষ্ট। তাঁর সর্বান্তিকরণে সমর্থিত এই উক্তির সত্যতাকে সর্বতোভাবে তাঁরাই উপলব্ধি করতে পারেন যাঁরা পবিত্র কুরআনের শাশ্বত বাণী নিয়ে তুলনামূলকভাবে চিন্তা করে দেখেছেন প্রশান্ত অন্তরে। তিনি আরও বলেন: "বর্ণমালার মাঝে ঐক্যতানের দিক দিয়ে পাক কালাম ও অন্যান্য কালামের মাঝে এতদূর পার্থক্য রয়েছে যেমন অপরাপর পরস্পর বিরোধী এবং মধ্য পর্যায়ের ঐক্যতান

বিশিষ্ট কালাম (Contradictory and Harmonions in the middle stage)-এর মাঝে পার্থক্য বিরাজ করে।" মোটকথা আর-রুম্মানীর মতে কুরআনের ই'জায-এর শব্দসম্ভার বর্ণমালার ঐক্যতানের উপর পূর্ণমাত্রায় নির্ভরশীল। তাঁর 'ই'জাযুল কুরআন' পুস্তকটি একবার দিল্লীর 'জামেয়া মিল্লীয়া' থেকেও প্রকাশ পেয়েছিল। রুম্মানী একজন বৈয়াকরণিকও ছিলেন এবং পবিত্র কুরআনের একখানি তাফসীরও লিখেছেন। আবদুল মালিক বিন আলী হারাভী এই তাফসীরের সংক্ষিপ্তসার লিখেছেন। হয়তো এতে 'ইজায সম্পর্কে তাঁর মতামত পাওয়া যেতে পারে।

আর-রুম্মানী সম্বন্ধে ইয়াহিয়া আল-ইয়ামানী

আমীর ইয়াহিয়া আল-ইয়ামানী ই'জায শাস্ত্রকে কেন্দ্র করে 'আতীতিরায' নামে একখানা অনুপম গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে তিনি আর-রুম্মানীর অভিমত ও তৎসঙ্গে ঐ সমস্ত লোকের অভিমত নিয়েও তীব্র সমালোচনা করেন, যাঁরা কুরআনের ই'জায এর রচনারীতির উপর বিশেষ-ভাবে নির্ভরশীল বলে মত পোষণ করেছেন। আল-ইয়ামানীর মতে কুরআনের ই'জায-এর রচনারীতির সাথে সাথে এর অর্থের উপরও সমভাবে নির্ভরশীল। এভাবে তাঁর অভিমত রুম্মানীর অভিমতকে অনেকখানি গোলমেলে করে দিয়েছে। আল্লামা জালাল সুয়ূতী স্বীয় 'আল-ইতকানে' রুম্মানীর অভিমত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[১]

এই আলোচনাই বোধ করি সবচাইতে প্রণিধানযোগ্য। আবদুল আলীম হিন্দি এ প্রসঙ্গে ইমাম সুয়ূতীর আলোচনা ও মতবাদের সার-সংক্ষেপ দিতে গিয়ে বলেন: 'আর-রুম্মানীর মতে কুরআন মু'জিযা হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, এর মুকাবিলার জন্য এত সুবর্ণ সুযোগ আর উপর্যুপরি স্পষ্টতম

---

১. আল-ইত্কান ফী উলূমিল কুরআন; ২য় খণ্ড: পৃষ্ঠা ১১৮।

চ্যালেঞ্জ দেয়া সত্ত্বেও কেউ কোনদিন তা গ্রহণ করতে সাহস করেনি।" আবদুল আলীম আরও বলেন: আনন্দের বিষয় যে, আর-রুম্মানী ই'জায শাস্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ এর রচনাশৈলীর অনুপমত্ব এবং সারফা-এই উভয় মতবাদকেই একীভূতকরণের প্রচেষ্টা নিয়েছেন যদিও এই মতবাদ দুটো সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী।"[১]

এ প্রসঙ্গে বেশ একটা চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হচ্ছে এই, তিনি তাঁর পূর্ববর্তী লেখকদের এ সম্বন্ধীয় সমস্ত মতবাদকেই একত্রিত করেছেন; কিন্তু কারুর মতবাদকেই তিনি অস্বীকার বা তৎসম্পর্কে কোন বিরূপ সমালোচনা করেন নি। পূর্বপ্রকাশিত সমস্ত উক্তিকে তিনি শুধু যে গ্রহণ করেছেন তা নয়, বরং সেগুলোর মাঝে একটা ঐক্যের বন্ধন সুদৃঢ় করারও তিনি প্রয়াস পেয়েছেন। কুরআনের সাহিত্যরীতির তুলনা করতে গিয়েও তিনি বেশ দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। তাই কোন চূড়ান্ত ফয়সালা না দিয়ে তিনি শুধু এ বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন যে, এটা একটা একান্ত ব্যক্তিগত অভিরুচির কথা।

আল-খাত্তাবী

প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা ও মাআ'লিমুস্-সুনানের লেখক হামদ বিন্ মুহাম্মদ আল-খাত্তাবী আল বুসতী আশ-শাফেয়ী (মৃত্যু ৩৮৮ হিজরী) 'ই'জায সম্পর্কে একটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক প্রণয়ন করেন। অত্র পুস্তকে তিনি ইল্মে কালাম ও বালাগাত—উভয়েরই সমন্বয়ে 'ই'জায শাস্ত্রের প্রতি অতি সুন্দরভাবে আলোকপাত করেছেন। ইমাম সুয়ূতী স্বীয় 'ইতকান' গ্রন্থে খাত্তাবীর অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন: 'আল-খাত্তাবীর অভিমত হচ্ছে যে, বহু সাহিত্যরথী কুরআনের অভিনব রচনারীতিকে এর 'ই'জায হিসেবে অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাঁরা আবার এ কথাকে দলীল-দস্তাবেজের মানদণ্ডে ওজন করে অন্যকে প্রত্যয় করানো অত্যন্ত কঠিন ও শ্রমসাধ্য মনে করেছেন। এটা হচ্ছে একটা একান্ত ব্যক্তিগত অভিরুচির কথা।" খাত্তাবীর এই

১. 'ইসলামিক কালচার' ১ম ও ২য় সংখ্যা: ৩২শ বর্ষ।

বইয়ের একটা কপি লেইডেনে এখনও রক্ষিত রয়েছে। তিনি বলেনঃ "সরলতা ও কাঠিন্য—এ দুয়েরই অপূর্ব সংমিশ্রণ বিদ্যমান রয়েছে কুরআনের রচনারীতির মধ্যে। তাই এদিক দিয়ে ইহা নবী মুস্তফার (সঃ) নবুওতের সত্যতাকে প্রতিপন্ন করেছে সর্বতোভাবে; উপরন্তু আরবরা আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও এর অনুরূপ সূরা আনয়ন করতে কোন দিন সক্ষম হয়নি। কারণ কুরআনের অনুরূপ ভাষা ও শব্দার্থের উপর তাদের সে দখল ছিল না। কুরআনের মাঝে রয়েছে তাই রচনার শব্দগত ও অর্থগত উৎকর্ষের অভিনব সমাবেশ। আর থাকবে নাই বা কেন? এ ঐশী বাণী যে মহাজ্ঞানী ও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আগত। এহেন সর্বতোমুখী গুণাবলীর অধিকারী আর কে হতে পারে আল্লাহ্ পাক ব্যতিরেকে?' অতঃপর আল-খাত্তাবী স্বীয় গ্রন্থে পবিত্র কুরআনের পত্রান্তরালে নিহিত সমুদয় বিষয়বস্তুগুলোর একটা তালিকা নিরূপণ করেন। বিশেষ করে ভবিষ্যৎবাণী সম্বলিত ভূত ভবিষ্যতে সংঘটিত হওয়ার সেই ঘটনাপঞ্জী এবং দূর অতীতের ঐতিহাসিক কাহিনীসমূহ। এই বিষয়বস্তুর উপর প্রমাণপঞ্জীর অন্যান্য সংক্ষিপ্তসার সম্ভবত এই গ্রন্থেরই বরাতে দেয়া হয়েছে। আল-খাত্তাবী বলেনঃ 'আমি কুরআনেরই ই'জায সম্পর্কে এতকিছু বলে যাই কিন্তু মানুষ তৎপ্রতি ততটা মনোনিবেশ করে না। অথচ মনের কোণে কুরআনের প্রভাবই সবচাইতে বেশী দাগ কাটতে পারে। কুরআন ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থের শব্দসম্ভার ও ভাষা শৈলী মানুষের অন্তরে এমন আনন্দদায়ক, আবেগ, অনুভূতি ও প্রভাব সৃষ্টি করতে অপারগ—সে ভাষা ও শব্দসম্ভার কবিতার মাধ্যমেই হোক অথবা গদ্যের মাধ্যমে। আল্লাহ্ পাক ফরমিয়েছেনঃ

'যদি এই কুরআন পাককে আমি কোন পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম, তা হলে হে মুহাম্মদ (সঃ)। তুমি দেখতে পেতে সেই পর্বতকে আল্লাহ্‌র ভয়ে অবনমিত বিদীর্ণ অবস্থায়, আর আমি এই ধরনের উপমাগুলো প্রকাশ করে থাকি মানুষের যথার্থ মঙ্গল ও কল্যাণার্থে, যেন তারা চিন্তা করে দেখে।'

(সূরা হাশরঃ ২১ আয়াত)

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন ঃ

الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشعر منه
جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى
ذكر الله ذلك هدى الله يهدى به من يشاء —

আল্লাহ্ পাক নাযিল করেছেন এই উৎকৃষ্টতম বাণী অর্থাৎ কুরআন মজীদ, যার আয়াতগুলো সাদৃশ্যাত্মক বা পরস্পর সুসঙ্গমস এবং (যার উপদেশমালা) পুনঃ পুনঃ বর্ণিত, যারা আপন প্রভু পরওয়ারদিগার সম্বন্ধে সতর্ক ও সন্ত্রস্ত। তাদের দেহ এই কুরআনের কলাপণে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে, অতঃপর বিনম্র ও সুকোমল হয়ে ওঠে তাদের দেহ-মন আল্লাহ্র স্মরণ ও ভজনের দিকে, এটাই হচ্ছে আল্লাহ্ প্রদত্ত হিদায়ত, তিনি যাকে চান এর দ্বারা সুপথ প্রদর্শন করেন। (সূরা যুমার ঃ ২৩ আয়াত)

এখানে একটি কথা অত্যন্ত জরুরী যে, ই'জায সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে—সে সমস্তই ইমাম খাত্তাবী তাঁর এই মূল্যবান কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি এ কথাও প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পেয়েছেন যে, ই'জায সম্বন্ধে বিভিন্ন মনীষীর বিভিন্ন মতামতের মাঝে প্রকৃত প্রস্তাবে কোনই বৈপরীত্য নেই। তিনি কুরআনের ভাষাগত, ভাবগত ও অন্যান্য গুণাবলীর যে মূল্য রূপায়ণ করেছেন, তার সার-সংক্ষেপ এভাবে দেয়া যেতে পারে ঃ

১. উচ্চতর অর্থ ও মর্ম,

২. সার্থক ও সুন্দর রচনারীতি,

৩. অন্তঃস্থিত আবেগ ও আনন্দদায়ক অনুভূতির প্রভাব।

আবূ মনসূর সাআ'লিবী তাঁর 'ইয়াতিমাতুদ-দাহর' গ্রন্থে ইমাম খাত্তাবী সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর নাম লিখতে গিয়েই ভুল-বশত তিনি হামদের স্থানে আহমদ লিখেছেন। আল-খাত্তাবীর জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয় নিশাপুরে। তাঁর অমূল্য গ্রন্থমালা তিনি সেখানেই প্রণয়ন করেছিলেন। উপরিউক্ত গ্রন্থদ্বয় ছাড়াও তাঁর লিপি-বদ্ধ আরও অনেক গ্রন্থ রয়েছে, যেমন—গারীবুল হাদীস, শারাই আস-মাউল হুসনা, কিতাবুল আয্‌লাহ, শারাহ্ আবী দাউদ এবং বুখারীর শারাহ ইলমুস্ সুনান, ইসলামিক ইনসাইক্লোপিডিয়া ১ম খণ্ড। কবিতার প্রতিও তাঁর বেশ প্রবণতা ছিল। বন্ধু-বান্ধবের অভাবকে অতি তীব্রভাবে অনুভব করে একস্থানে তিনি আবৃত্তি করেছেন :

والى غريب بين بست واهلها

وان كان فيها اسرتى وبها اهلى -

নিশ্চয়ই আমি আজ স্বীয় জন্মভূমি বুস্‌ত ও তার অধিবাসীবৃন্দের মাঝে অবস্থান করেও যেন প্রবাসী হয়ে রয়ে গেছি। যদিও আমার আত্মীয়-স্বজন এবং স্ত্রী পরিজন এখানেই মওজুদ রয়েছে।

আল-'আসকারী

আবূ হিলাল আল-'আস্‌কারী[১] এই মত পোষণ করেন যে, কুরআনের ই'জায যেহেতু এর রচনারীতিতে নিহিত রয়েছে, তাই একান্ত অভিনিবেশ সহকারে একে অধ্যয়ন করারও যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। তিনি বলেন : বালাগাত বা অলংকার শাস্ত্রকে একান্ত নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করার আশু জরুরাত রয়েছে। কারণ এছাড়া কুরআনের ই'জাযকে সম্যক অনুধাবন করা নিতান্ত মুশ্‌কিল। ব্যক্তিগতভাবে এই ময়দানে অবতরণ না করে

১. আবূ হিলাল হাসান আবদুল্লাহ্ 'আসকারী (মৃত্যু : ৩২০ হিজরী)

শুধু অপরের সাক্ষী-সাবুতের পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের[১] ই'জাযের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা আদৌ সমীচীন নয়।

আবু হিলাল আল-আসকারীর 'কিতাবুস সানা'আতাইন' বইটি তাঁর উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক অবদান। এতে শুধু গদ্য/পদ্য রচনা সম্বন্ধেই আলোচনা রয়েছে তা নয়, বরং বালাগাত শাস্ত্র এবং অলংকার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনা এবং উদ্ধৃতি রয়েছে এর মধ্যে। এই কারণেই বোধ করি আবু হিলাল কুরআনের ই'জায শাস্ত্র সম্পর্কে বিশেষ কোন নির্ধারিত অভিমত পেশ করেন নি। অলংকার শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ দিয়েই তিনি একে বেশী নিরীক্ষণ করতে চেয়েছেন। পবিত্র কুরআনের ভাষ্যে তাঁর আর একটি সুদীর্ঘ এবং অন্যতম অবদান হচ্ছে 'কিতাবুল মাহাসীন ফী তাফসীরিল কুরআন'। এতেও ইঙ্গিত রয়েছে ই'জায শাস্ত্র সম্বন্ধে। তাঁর আর একটি বইয়ের নাম 'কিতাবুল মাহাসীন ওয়া দিউআনুল মা'আনী'।[২] পূর্ববর্তী লেখকরা অলংকার শাস্ত্রের মাধ্যমেই ই'জাযকে জানতে চেয়েছেন।

আল-জাহিয আল-জুরজানী

ই'জায শাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের আলোচিত পূর্ববর্তী লেখকদের কর্ম-প্রবাহকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সাধারণত সে যুগের মনীষীরা ইলমে বালাগাত বা অলংকার শাস্ত্রের মাধ্যমেই কুরআনের ই'জাযকে সম্যক উপলব্ধি করতে প্রয়াস পেয়েছেন। এই জন্যই বোধ করি তাঁরা কুর-আনের ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যের প্রতি এত বেশী জোর দিয়েছেন এবং এ নিয়ে দিনের পর দিন সাধনা করেছেন। এ বিষয়ে তাই কোন সন্দেহের

১. এ প্রসঙ্গে বিস্তারিতের জন্য দেখুন আল-খাওয়ালীর আল-বালাগাতুল আরাবিয়াহ্-ওয়া-আসারুল ফালসাফাতি ফীহা'' ঃ পৃষ্ঠা ২৪ এবং আল-বালাগাহ্ ওয়া-ইলমুন্ নাফস; মিসরের 'কুল্লিয়াতুল আদাব' পত্রি-কায় প্রকাশিত আমীন খাওয়ালীর প্রবন্ধ Vol 4, No. 2, for 1936.

২. See Urdu Encylopaedia of Islam, vol. 4, P.498.

অবকাশ থাকতে পারে না যে, ই'জায শাস্ত্রের ক্রমোন্নতি থেকেই অলংকার শাস্ত্রের ক্রমবর্ধমান বিকাশ লাভ সম্ভবপর হয়েছে। যাই হোক, ই'জাযুল কুরআনের মতবাদকে যারা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন তাঁরা শুরু থেকেই দু'ভাগে বিভক্ত। একদল সব সময় এই মত পোষণ করে থাকে যে, কুরআনের ই'জায-এর আলংকারিক সৌন্দর্য ও উচ্চতর সাহিত্যিক মানেরই শামিল। অপর দলটির অভিমত হচ্ছে এই যে, ই'জায শুধুমাত্র আলংকারিক সৌন্দর্য ও উৎকর্ষের মধ্যেই যে সীমাবদ্ধ রয়েছে তা নয়, বরং আরও অন্যান্য গুণাবলী এবং বিভিন্নমুখী বৈশিষ্ট্য শামিল রয়েছে এই ই'জাযের মাধ্যমে। কিন্তু প্রথম দলটিই হচ্ছে বেশী শক্তিশালী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই গ্রুপের প্রধান সমর্থকরা তাই কুরআনের সাহিত্যিক মানকে উচ্চতর ও স্বতঃসিদ্ধ সাহিত্যকর্মের সঙ্গে তুলনা করে তাঁদের স্ব স্ব অভিমতকে দলীল দিয়ে বলিষ্ঠ করতে প্রয়াস পেয়েছেন। দার্শনিক পণ্ডিত আল-জাহিয 'নাজমুল কুরআন' নামে একটি বই লেখেন। একে অলংকার শাস্ত্রের সর্বপ্রথম নিয়মতান্ত্রিক বই হিসেবে গণনা করা হয়। এরপর অলংকার শাস্ত্রে তাঁর দ্বিতীয় এবং স্বতঃসিদ্ধ অবদান হচ্ছে 'আল-বায়ান ওয়াত্ তাবয়ীন' (The Style and Method)। কিন্তু অন্যান্য মনীষীদের অভিমত হচ্ছে এই যে, অলংকার বা বালাগাত শাস্ত্রের উপর সর্বপ্রথম নিয়মতান্ত্রিকভাবে যিনি লেখনী হাতে নিয়েছেন, তিনি হচ্ছেন শায়খ আল-জুরজানী। আমার মনে হয়, এই উক্তিই বহুল পরিমাণে সত্য। কারণ তখন পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে অলংকারশাস্ত্রে যে সব অভিমত প্রকাশ পেয়েছিল, সেগুলোর সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক ধারায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন শায়খ আল-জুরজানী। তাঁর অনবদ্য অবদান 'দালাইলুল ই'জায'। এই অভিমতের জোর সমর্থন জানায় যে, ই'জায শাস্ত্রের অধ্যয়ন থেকে অলংকার শাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। আল-জুরজানীর দ্বিতীয় অবদান 'আসরারুল বালাগাহ্' (The Secrets of Rhetoric)-ও এই উক্তির জোর সমর্থন যুগিয়েছে। মোটকথা, এই অমর গ্রন্থরাজিতে তিনি বালাগাত শাস্ত্র, গ্রামার ও বাকধারার সমস্যাগুলোকে বিশেষভাবে পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এই সমস্ত বিদ্যার বিপুল পারদর্শিতা লাভ করতে

না পারলে কুরআনের ই'জায ও তার আভ্যন্তরীণ উৎকর্ষকে অনুধাবন করা কখনো কারো পক্ষে সম্ভবপর নয়।

এই সময়ে 'মানাসিসুস শাযেঈয়াহ' ও 'বাহরুল মুযাহাব' নামক পুস্তকদ্বয়ের লেখক আবুল মহাসিন আর-রুয়ানী আশ-শাফেয়ী (মৃত্যু ৫০৬ হিজরী) এবং ইবনুল বাককালী (মৃত্যু ৫৬২ হিঃ—১১৬৬ খৃঃ) উক্ত বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে কতিপয় সুন্দর ও সার্থক কিতাব রচনা করেছেন।[১]

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (মৃত্যু ৬০৬ হিঃ—১২০৯ খৃঃ) তাঁর 'নিহায়াতুল ই'জায ফী দিরায়াতিল ই'জায' (The Epitome of the Study of Miracle) নামক অমর গ্রন্থে বেশ নিয়মতান্ত্রিকতার সঙ্গে আল-জুরজানীর সাহিত্যকর্মের সারসংক্ষেপ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর তাফসীরুল কুরআন 'মাআ'লিম ফী উসুলিদ্দীন' (The Outlines of the Principles of the Faith) এবং 'মুহাসসালু আফকারিল মু-তাকাদ্দী' (The Summery of the Views of Predecessors) নামক গ্রন্থসমূহে ই'জাযের প্রশ্ন নিয়ে বেশ সুন্দর আলোচনা করেছেন। অধিকন্তু তিনি আল-জুরজানীর মতবাদকে তাঁর উপরিউক্ত পুস্তকসমূহে বেশ পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। যাই হোক, আর-রাযী কিন্তু এ সম্পর্কে কোন নতুন মতবাদ বা অভিনব ধরনের কিছু আনয়ন করেন নি।

ইবনু আবিল ইসবা

শায়খ আল-জুরজানীর ভাবধারাকে অবলম্বন করে ই'জায শাস্ত্রের উপর তারপর কামিয়াব লেখক হচ্ছেন ইবনু আবিল ইসবা আল-কাইরোয়ানী

১. কাশফুয্-যুনুন : হাজী খলীফা এবং আল ফিহরিস্তঃ ইবনু নাদীম Edited by G, Fluegel হাজী খলীফা প্রথমোক্ত মনীষীর নাম এভাবে লিখেছেন—আবদুল ওয়াহিদ-বিন-ইসমাইল আর-রুয়ানী (মৃত্যু ৫০২ হিঃ—১১০৮ খৃষ্টাব্দ)।

(মৃত্যু ৬৫৪ হিঃ—১২৫৬ খৃঃ)। তাঁর লিখিত কিতাবের নাম 'বায়ানুল বুরহান ফী ই'জাযিল কুরআন'। (The Statement of the Evidence on the Miracle of the Quran)। আবদুল ওয়াহিদ, আয-যামালিকী (মৃত্যু ৬৫১ হিঃ—১২৫৩ খৃঃ) কৃত 'আত-তিবিয়ান ফী ইলমিল মুতাআল্লিক আ'লা ই'জাযিল কুরআন" ইবনুল আসীর আল-জাযারী (মৃত্যু ৬৩০ হিঃ—১২৩৪ খৃঃ) কৃত 'আল-মাসালুস সায়ের' এবং 'আল-অশিউল মারকুম' হাযিম বিন-মুহাম্মদ 'আল-কারতাজানী (মৃত্যু ৬৮৪ হিঃ—১২৮৫ খৃঃ) কৃত 'মিনহাজুল বুলাগা'। কথিত আছে যে, আল-কারতাজানী তাঁর এই গ্রন্থে 'ই'জায' সম্পর্কে অতি সুন্দর ও সার্থক আলোচনা করেছেন। উক্ত বিষয়কেই কেন্দ্র করে তাঁর 'আল-বুরহানুল কাশিফ আল-ই'জাযিল কুরআন' নামে আর একটি কিতাব মদীনা মুনাওয়ারায় এখনও বিদ্যমান রয়েছে। ইবনুল আবিদীদ এবং আলী আল-হাসান বিন আলী নসর কৃত 'কিতাবু মাজ-মিল কুরআন'-ও এ সময়ে লেখা হয়। ইবনু আবিল ইসবা 'বাদীউল কুরআন' নামে 'ই'জায' ও অলংকার সম্বন্ধে আর একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। জনাব হাফনী শারফ-এর ভ্রম সংশোধন ও টীকা-টিপ্পনীসহ অতি যত্ন সহকারে সম্পাদনা করে একে প্রকাশ করেন। এখানে একটি আকর্ষণীয় বস্তু হচ্ছে এই যে, পরবর্তী যুগে এই 'ই'জায' শব্দটি পরিভাষায় বালাগাত বা অলংকার শাস্ত্রেরই একটা প্রতিশব্দ হয়ে দাঁড়ায় এবং ই'জাযের সাথে জড়িত এর প্রথম অর্থটি যেন চিরতরে অবলুপ্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তী যুগের লেখকদের সাহিত্যকর্ম ও এর নামকরণ থেকে একথা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে—হিজরী দশম শতকে গিয়াসুদ্দীন [illegible] হিঃ—১৬৪৩ খৃঃ) অলংকারশাস্ত্র 'আল-ই'জায ফী ইসমিল ই'জায' (Miracle in the Science of Brevity) অথচ বইটি সম্পূর্ণ অলংকার সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

ইবনু হাদীদ বলেনঃ কুরআনের ই'জায তথা বাক্যছটার আলংকারিক সৌন্দর্য ও লালিত্য সম্যক উপলব্ধি করতে হলে তার উপযুক্ত সাহিত্যিক অভিরুচি থাকা একান্ত আবশ্যক। এই অভিরুচি অর্জন করা যে নিতান্ত

সহজলভ্য তা নয়। এর পশ্চাতে থাকা চাই অক্লান্ত পরিশ্রম ও একনিষ্ঠ সাধনা। অভিরুচি শুধুমাত্র ইলমে নাহাভ, লুগাত, ফিকহ্ ইত্যাদির ব্যুৎপত্তি দ্বারাই অর্জিত হয় না; বরং এ হাসিল হয় ইল্মে বায়ান, বাদীয়, দ্ব্যর্থ বাক্য, রূপক ও ছান্দিক অলংকার, বাকপটুতা ইত্যাদিতে রীতিমত ব্যুৎপত্তি ও পূর্ণ নৈপুণ্য অর্জন করার পর।[১]

চতুর্থ শতক হিজরীতে এই ই'জায শাস্ত্রকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত লেখক লেখনী ধরেছেন তাঁরা এ বিষয়ে তেমন কোন অভিনব বস্তু সৃজন করতে পারেন নি। মনে হয়, সে যুগে বেশীর ভাগ মুফাস্সির ও মুতাকাল্লিমই শুধু এই ই'জায সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতেন। এই বিষয়বস্তুর উপর তাই আত-তাবারী আলোচনা ও অভিমত এত সরল ও বাগাড়ম্বরহীন, অথচ আল-কুম্মী ইল্মে কালাম দ্বারা প্রভাবান্বিত মুফাস্সিরদের অনুসৃত নীতি ও ভাবধারাকেই অবলম্বন করেছেন। কিন্তু তবুও এই শতকে ই'জায সাহিত্যের এমন কতকগুলো নতুন দিক ও অভিনব ভাবধারা আমরা দেখতে পাই, যা সাধারণত হিজরী তৃতীয় অথবা খ্রীস্টীয় নবম শতকে পরিদৃষ্ট হয়নি। কারণ আল-ওয়াসেতী, আর-রুম্মানী, আল-খাত্তাবী প্রমুখ মনীষী ইল্মে কালাম দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে 'ই'জায ও অলঙ্কার শাস্ত্রের উপর সেই সময়ে বিশিষ্ট ধরনের কাজ শুরু করে দেন; আবু হিলাল 'আসকারী ই'জায শাস্ত্রের উপর লেখনী ধরলেও তিনি স্বীয় যুগে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন একজন অন্যতম সাহিত্যিক হিসেবে। অনুরূপভাবে আল-জাহিযও ছিলেন তৃতীয় শতক হিজরীর একজন খাঁটি মু'তাযিলা-ভাবাপন্ন সাহিত্যিক। এদিকে ইমাম আশ'আরী, আবু হাইয়ান তাওহিদী, বিনদার আল ফারেসী প্রমুখ মুতাকাল্লিম ই'জায সাহিত্য সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি হাসিল করার জন্য তাঁদের হৃদয়-মন প্রাণকে উৎসর্গ করেছিলেন সম্পূর্ণভাবে। কিন্তু আল-মুতান্নবী প্রমুখ অন্যান্য ব্যক্তি ছিলেন তথাকথিত স্বাধীন মতবাদ ও আপন খোশখেয়ালে সম্পূর্ণ অভ্যস্ত। এরা শুধু যে কুরআনের ই'জাযকে প্রত্যয় করতে পারেন নি তা নয়, বরং এর তীব্র সমালোচনা করে তারা নবুওতের দাবী করেছেন

১. আল-ইতকাল : ২য় খণ্ড।

এবং কুরআনের অনুরূপ সূরা তৈরী করতে গিয়ে নিজেদের সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করেছেন। অবশ্য এজন্য তাঁদের কম প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়নি।

পঞ্চম শতক হিজরী সনেই—খৃস্টীয় একাদশ শতকে ই'জাযের ক্রমবিকাশ ঘটে। ই'জায শাস্ত্রের উপর অগণিত লেখক ও মুতাকাল্লিমের আধিক্য ও প্রাবল্যই হচ্ছে এই শতকের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এমন কি ই'জায সাহিত্যের জন্য একে স্বর্ণযুগ বললেও আদৌ অত্যুক্তি হয় না। কারণ আধ্যাত্মিক বলুন অথবা বুদ্ধিবৃত্তি—সকল প্রকার ইনকিলাবের জন্য সকলের জীবনে তখন ই'জাযের প্রশ্নটাই ছিল মুখ্য এবং অবিচ্ছিন্ন। দর্শন শাস্ত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্রগুলোও এ যুগে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। অনুবাদ শিল্প তাঁদের মাঝে দ্বিতীয় পর্যায়রূপে স্থান লাভ করেছিল, তাছাড়া মৌলিক সাহিত্য রচনা ও শিল্পকলায় আরব মুসলিমরা ছিলেন অতিমাত্রায় সিদ্ধহস্ত এবং অত্যন্ত নিপুণ।

ই'জাযুল কুরআনের বিরোধিতার জন্য এ যুগের যে সমস্ত স্বনামখ্যাত পণ্ডিত অভিযুক্ত, তাঁদের নাম হচ্ছে যথাক্রমে—বনু যীয়াদ গোত্রের আমীর এবং তাবারিস্তানের শাসনকর্তা কাবুস-বিন-অশামকির, প্রখ্যাত দার্শনিক ইবনু সীনা এবং প্রসিদ্ধ কবি ও সাহিত্যিক আবু-'আলা-আল-মা'আররী। এ যুগের আরও দু'জন প্রখ্যাত শিয়া মুতাকাল্লিম যারা ই'জায সাহিত্যকে অধ্যয়ন করে যোগ্যতা অর্জন করেন, তাঁদের নাম হচ্ছে যথাক্রমে শারীফ-আল-মুরতাযা এবং আবু নাসর-হিবাতুল্লাহ্ আস-সিরাজ।[১]

এ প্রসঙ্গে আরও তিনজন সুপ্রসিদ্ধ সুন্নী উলামার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যেমন ঃ

১. মাশহুর ও মারুফ সাহিত্যিক আবু-বাকর-আল-বাকিল্লানী।
২. ইবনু সুরাকাহ্
৩. ইবনু হাযাম-আল-আন্দালুসী

আরও দু'জন সুবিখ্যাত সাহিত্যিকের নাম এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যাঁরা এ বিষয়ে যথেষ্ট নৈপুণ্য ও সুনাম অর্জন করেছেন, তাঁরা

১. তিনি 'দাঈউদ দুআ' নামে প্রসিদ্ধ।

হচ্ছেন ইবনু সিনান খাককাজী এবং শায়খ আবদুল কাহির আল-জুরজানী। এই পরবর্তী সাহিত্যিক একজন উঁচুদরের মুতাকাল্লিমও ছিলেন। এক্ষণে আমরা এই পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে এদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত ও সংক্ষিপ্ত সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

ক্বাবুস বিন-অশামকির

ক্বাবূস বিন্ অশামকির (মৃত্যু ৪০৩ হিজরী—১০১১ খৃঃ) পবিত্র কুর-আনের বিরোধিতা করেন। মনীষী আবদুল আলীম বলেন ঃ "অতি আশ্চর্যের বিষয় যে, একজন সুপণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও ক্বাবূস কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছেন।" আর-রাফেয়ী ক্বাবূস-বিন অশামকিরের উল্লেখ করেছেন এবং কুরআনের বিরোধিতা সম্পর্কে তাঁর দোষ খণ্ডন করতেও বেশ মেহনত করেছেন। তিনি বলেন ঃ অবিশ্বাসীরা এই বলে দোষারোপ করে যে, অশামকিরের উপমা, গল্প, সব কিছুই তার কুরআন বিরোধিতার পরিচায়ক। এতদ্বারা তারা একথাই বলতে চায় যে, যার মধ্যে রয়েছে সাহিত্য, ইতিহাস, বাগ্মিতা, গল্প ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সেটাই কুরআন বিরোধী। তবে তো সাহিত্যের উৎকর্ষের দিক দিয়ে সাবাউল মুআল্লাক্বাত' বা সপ্ত-ঝুলন্ত কাব্যকেও কুরআন বিরোধী বলতে হয়। কিন্তু এর পিছনে কোন দলীল প্রমাণ আছে কি ?[১]

ইবনু সীনা

আবু আলী হুসেন ইবনু সীনা (মৃত্যু ৪২৮ হিঃ—১০৩৬ খৃঃ)-কেও কুর-আন বিরোধীদের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়। কারণ একটা বিশিষ্ট ধর্মীয় মতবাদে তাঁর আস্থা বা আকীদা ছিল না। তিনি কবর থেকে মানুষের শারীরিক পুনরুত্থানে আদৌ বিশ্বাস করতেন না এবং সেই সঙ্গে কুরআনের

১. The history of the idea of the miracle By Mr. N'aim Al-Humsi, Islamic Review January, 1966. P. 33.

যে সব আয়াতে বেহেশতে শারীরিক আনন্দ উপভোগের কিংবা দোযখে অনন্ত শাস্তির বিশদ বর্ননা আছে, সে সবেও তিনি বিশ্বাস করতেন না। আর-রাফেয়ী বলেন: 'ইবনু সীনাকে কুরআন বিরোধী বলে যে অপবাদ দেয়া হয়, তা শুধু এ কথার উপর নির্ভর করে যে, তিনি ছিলেন একজন যিনদীক মুলহিদ। কতিপয় আলিম ও তাঁর ব্যক্তিগত শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে কুফরীর অভিযোগ আনলে তিনি রুদ্ররোষে তাঁদের অভিযোগ খণ্ডন করে ইসলামের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য জানিয়েছিলেন।[১] তিনি তাফসীরুল المعوذتين 'মুওয়াউওযাতাইন' নামে কুরআনের সর্বশেষ সূরাদ্বয়ের ভাষ্য লিখেন। এ ছাড়াও তাঁর তাফসীরে সূরা ইখলাস প্রসিদ্ধ।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া

তাকীউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনু আবদুল হালীম ইবনু তাই-মিয়া (ওফাত: ৭২৮ হিঃ—১৩২৪ ঈসায়ী) সিরিয়া প্রদেশের হুররান নামক স্থানে ৬৬১ হিজরীতে পয়দা হন। শৈশবেই কুরআন মজীদ হিফজ করার পর হাদীসশাস্ত্র, আরবী সাহিত্য, ব্যাকরণ ইত্যাদিতে বিপুল পার-দর্শিতা হাসিল করে তাঁর অনন্যসুলভ শাণিত বুদ্ধি ও অসাধারণ মেধাশক্তি দ্বারা উস্তাদগণের তাক লাগিয়ে দেন। ৬৮১ হিজরীতে পিতার ইন্তিকালের পর তিনি পৈতৃক শূন্য পদে অধ্যাপনা শুরু করেন এবং কুরআনের তাফসীর করে ভাষণ দিতে থাকেন। কুরআনী আয়াত ও হাদীসকে নিজের খেয়াল খুশীমত অনাবশ্যক তাভীল করে কোন বিশেষ মাযহাবের মাসআলার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ করার তিনি আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। কার্যরোতে অবস্থানকালীন আল্লাহ্ তা'আলার গুণ সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীসগুলোর মুতাকাল্লেমদের মত মনগড়া ব্যাখ্যা না করার অপরাধে ইমাম ইবনু তাই-মিয়াকে তাঁর দুই ভ্রাতাসহ পার্বত্য দুর্গে বন্দী করা হয়।[২]

---

১. See Prof. R. A. Nicholson's 'A Literary History of the Arabs,' P. 360-61.

২. সুবকী; তাবাকাত: ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪০।

দেড় বছর পর মুক্তি দিয়ে সুলতান মাস্‌বিজী অন্য এক অপরাধে আবার তাঁকে দিমাশকের দুর্গে বন্দী করেন। একাধিকবার বন্দী থাকা অবস্থায় তিনি কারাগারকে একটা তাবলীগ কেন্দ্রে পরিণত করেন এবং কয়েদীদের সামনে ইসলামের শাশ্বত নীতি ও আদর্শের অকুণ্ঠ প্রচার কার্য চালাতে থাকেন। দিমাশকের এই জেলখানায় বসেই তিনি ছোট বড় বহু গ্রন্থ রচনা করেন এবং চল্লিশ খণ্ড বিশিষ্ট 'আল বাহরুল মুহীত' নামক এক বিরাট তাফসীর গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে, বন্দীখানার মযলা বাধও এই জ্ঞান সমুদ্রের ব্যাপক বিদ্যা স্রোতকে একটুও বাধা দিতে পারেনি।

এভাবেই তিনি তাঁর জ্ঞানের প্রবল জলপ্রপাতে দুশমনদের ভাসিয়ে দিয়ে কাগজের পৃষ্ঠায় বিদ্যার প্রবাহ বহাতে লাগলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, ইবনু তাইমিয়ার এই অতুল সম্পদ—তথা অমূল্য তাফসীরটি আজ পর্যন্তও উদ্ধার হয়নি। সম্ভবত দুশমনদের হস্তগত হয়েই তা বিনষ্ট হয়ে গেছে। তাঁর লিখিত কতিপয় সূরার তাফসীর এবং বহু আয়াতের বিস্তৃত ব্যাখ্যা আমাদের হস্তগত হয়েছে। কিন্তু এ দ্বারা তাফসীর বিজ্ঞান সম্পর্কে একটা সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম মূল্য নির্ণয় করা অথবা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া মুশকিল। কিন্তু এ কথা সত্য যে, আগের তাফসীরকার ও নাহুভীদের মতামতকে তিনি পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেন নি। এমনকি বিশ্ববিশ্রুত বৈয়াকরণ সিবওয়াইহ সম্পর্কেও ইবনু তাইমিয়া তাঁর 'বাহরুল মুহীত' নামক তাফসীরের মাধ্যমে তীব্র সমালোচনা করতে ছাড়েন নি। পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য অর্থ এবং আহাদীসে রসূল (সঃ)-এর উপর ভিত্তি করে তিনিই তাফসীর লিখতেন। এই হাদীসশাস্ত্রে তাঁর পারদর্শিতা ছিল এত বেশী যে, আল্লামা যাহবী (৬৭৩—৭৪৮ হিঃ) তাঁর সম্পর্কে 'তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ' গ্রন্থে বলেনঃ যে হাদীস সম্পর্কে ইবনু তাইমিয়ার ইল্‌ম নেই, সেটা হাদীসই নয়।

ইমাম ইবনু তাইমিয়ার দুশমনরা যখন জানতে পারল যে, তিনি বন্দীকারায় বসে বসে সংকলন, প্রণয়ন তথা ধর্মীয় সাহিত্যের নীরব খেদমতে

আত্মনিয়োগ করছেন, তখন এটাকেও তারা বরদাশত করতে পারল না। তাই তাঁর লিখিত গ্রন্থমালাকে ছলে-বলে ও কৌশলে তারা হস্তগত করল। শুধু তাই নয়, তাঁর হাত থেকে কাগজ, মসী ও লেখনী অতি নির্মমভাবে ছিনিয়ে নেয়া হয়। এ ছিল তাঁর প্রতি চরম আঘাত। কিন্তু তবুও এই অন্তঃসলিলা ফল্গুধারায় এতটুকুও ভাটা পড়লো না। তিনি কয়লা দিয়ে সেই বন্দীখানার প্রাচীরগাত্রে লিখে যেন উলুবনে মুক্তা ছড়াতে লাগলেন! দুশমনরা তাঁর চৌদ্দটি বস্তায় পরিপূর্ণ যে অমূল্য পাণ্ডুলিপিগুলো হস্তগত করেছিলো সেগুলো তিনি লিখেছিলেন মাত্র চৌদ্দ মাসে। এরই মধ্যে ছিল কুরআনের কঠিন আয়াতগুলোর তাফসীর।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রঃ) জনৈক প্রশ্নকারীর জওয়াবে জুহর থেকে আসরের মধ্যে মাত্র তিন সাড়ে তিন ঘন্টার অবসরক্ষণে ৫৬ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা লিখেছেন। অনুরূপভাবে 'কুরআন নশ্বর না অবিনশ্বর' এই প্রশ্নের জবাবে তিনি একই বৈঠকে ৫৪ পৃষ্ঠাব্যাপী এক ফতওয়া লিপিবদ্ধ করেন। সুতরাং এখন স্পষ্ট দিবালোকের ন্যায় আমাদের কাছে একথা প্রতিভাত হয় যে, দ্রুত রচনা লিখন ও গ্রন্থ প্রণয়ন ব্যাপারে ইমাম সাহেব ছিলেন দুনিয়ার অতুলনীয় এক শ্রেষ্ঠ প্রতিভা।

ইবনু তাইমিয়ার হাতের কাছ থেকে কয়লা ফুরিয়ে গেলে তিনি সেই শয়তানরূপী কয়েদীদের মধ্যে তাবলীগ করতে শুরু করেন। অল্প দিনেই সকল কয়েদী সব দুষ্কার্য ও দুর্নীতি ভুলে গিয়ে ফিরিশতা সিফাত সংগ্রামী মানুষে পরিণত হয়েছিল। একেই বলে খাঁটি দর্শন ও ইজতিহাদ এবং সংস্কার ও পুনর্জাগরণের পূর্ণ অর্থ। এভাবে তাবলীগ, নামায ও কুরআন তিলাওয়াত দ্বারা তিনি কিছুটা শান্তি লাভের চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর জেলখানার সঙ্গী অপর ভ্রাতৃদ্বয়ও ছিলেন কুরআনে হাফিজ। তাই এখন তিন ভাই মিলে পরস্পর কুরআন শুনতেন ও শোনাতেন। এরূপে আশিবার কুরআন শোনাশুনির পর একাশি বারের বেলায় যখন সাতাশ পারার সুরা আল-কামারের শেষ দু'টি আয়াত তিলাওয়াত করলেন তখন তাঁর প্রাণবায়ু এই জড়দেহ থেকে নির্গত হয়ে অবিনশ্বর লোকে

অনন্ত জীবন পথে যাত্রা শুরু করে। (ইন্না লিল্লাহ......)। ২০শে যুলকাদ তাঁর ইন্তিকালের খবর প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোক সরকারী অনুমতি নিয়ে জানাযা পড়ার জন্য জেলখানার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ইমামুল মুহাদ্দিসীন ইউসুফ আলী মিযযী প্রমুখ হাদীসশাস্ত্রবিশারদ তাঁকে গোসল দেন। ফুলপাতা মিশ্রিত গোসলের অবশিষ্ট পানি নিয়ে লোকদের মাঝে রীতিমত কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। তাঁর মাথার টুপি পাঁচশো দিরহামে বিক্রি হয়। বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্র—এমন কি সুদূর চীন দেশেও তাঁর গায়েবানা জানাযা পড়া হয়। দিমাশক নগরীর সমস্ত দোকান পাট বন্ধ থাকে। জানাযায় প্রায় দু'লক্ষ পুরুষ এবং ১৫ হাজার স্ত্রীলোক শরীক হন।

ইমাম ইবনু যাহাবী (৬৭৩—৭৪৮ হিঃ) ইবনু সায়্যিদিন নাস (৬৭১—৭৩৪ হিঃ) এবং কামালুদ্দীন আবুল মা'আলী (৬৭৭—৭২৭ হিঃ) প্রমুখ সমসাময়িক মনীষী মুক্ত কণ্ঠে ইবনু তাইমিয়ার বহুমুখী গুণগানের কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন।[১]

ইবনু তাইমিয়ার অগ্নিময় লেখনীপ্রসূত গ্রন্থাবলীর প্রভাব তাঁর জীবনকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সমভাবে প্রবহমান। তিনি পাঁচশোর অধিক গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন বলে ইবনু হাজার 'আসকালানী তাঁর 'দুরারুল কামিনা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে নওয়াব ছিদ্দিক হাসান খান (ওফাত ১৩০২ হিঃ) তাঁর অমর অবদান 'ইতহাফুন্ নুবালায়' ইবনু তাইমিয়ার ৪৮০ খানা কিতাবের নামোল্লেখ করেছেন।[২] তন্মধ্যে ১৫৯ খানা কিতাবের অস্তিত্বের খবর পাওয়া যায়। তাঁর বহু অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রয়েছে এবং সম্প্রতি কিছু কিছু প্রকাশিতও হচ্ছে। আনন্দের বিষয় যে, তাঁর 'মাজমু'আতুল ফাতাওয়া' ৩৪ খণ্ডে সউদী সরকারের সৌজন্যে এবং রাবিতায়ে আলমে আল-ইসলামীর উদ্যোগে প্রকাশ পেয়েছে।

---

১. শাজারাতুয-যাহাব; ইবনু ইমাদ ঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮২—৯০।

২. উর্দু ইনসাইক্লোপ্যাডিয়া ঃ ১ম খণ্ড; পৃষ্ঠা ৪৫৪—৪৫৯।

পাক-ভারতের সুধী সমাজের কাছে তাঁকে সর্বপ্রথম পরিচিত করে তোলেন মওলানা আবুল কালাম আযাদ এবং তাঁর প্রিয় শাগরিদ আবদুর রায্যাক মালীহাবাদী। এই উভয় মনীষীর উদ্যোগ ও উদ্দীপনায় ইমাম ইবনু তাইমিয়ার প্রায় পঞ্চাশ-ষাটখানা কিতাবের উর্দু তরজমা প্রকাশ পায়। এতে করে উদারচেতা ও রওশন খেয়াল তাবকার মাঝে ইবনু তাইমিয়ার অমূল্য গ্রন্থাবলী অধ্যয়নের জন্য একটা বিপুল উৎসাহের সাড়া পড়ে যায়। এভাবে আমাদের অবাঙালী ভাইয়েরা বিশ্বজাহানের এই অতুল প্রতিভাবান মনীষীর অমূল্য চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভংগী সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়ে যথেষ্ট লাভবান ও উপকৃত হয়েছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, বাংলা ভাষাভাষীরা আজও এই অমূল্য সম্পদ থেকে মাহরূম রয়ে গেছেন।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া কৃত সূরা নূর এবং 'তাফসীরে আয়াতে কারীমা' নামক ভাষাদ্বয়ের উর্দু তরজমা ১৯১৫ সালে লাহোর থেকে প্রকাশ পায়। সম্ভবত তিনি এগুলোর মাধ্যমে ই'জায শাস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁর 'উসূলে তাফসীর' নামক অমূল্য পুস্তকটি মাওলানা খালেদ সাহেব সর্বপ্রথম উর্দুতে ভাষান্তরিত করে ভূপাল থেকে প্রকাশ করেন। অতঃপর হিন্দে জাদীদের সম্পাদক মাওলানা আবদুর রায্যাক মালীহাবাদী দ্বিতীয়বার এর উর্দু তরজমা করে প্রকাশ করেন। সম্প্রতি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মওলানা আতাউল্লাহ হানীফ সাহেব একে অতি সুন্দরভাবে সম্পাদনা করে মাকতাবায়ে সালফিয়া, শিশমহাল রোড, লাহোর থেকে প্রকাশ করেছেন। ইমাম ইবনু তাইমিয়ার 'আন-নুবুওয়াত' নামক অনুপম গ্রন্থটিও বর্তমান কাহিরা থেকে প্রকাশ পেয়েছে। এতে নুবুওতের শ্রেষ্ঠতম মর্যাদা এবং তাঁর অমর 'মু'জিযা কুরআন মজীদ সম্পর্কেও তিনি বেশ সুন্দরভাবে আলোচনা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার সকল ব্যাধি এবং তার লক্ষণ উপকরণ ও পরিণতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, বিভিন্ন বয়স ও সকল প্রকার মেজাযেরও তিনি ই'লাজ করেন; হাতযশ, অভিজ্ঞতা এবং তাঁর ডাক্তারী অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা শুধুমাত্র রোগীর মুখ দেখলে অথবা নাড়ী টিপলেই সব কিছু উপলব্ধি করতে পারেন। ঠিক তদ্রূপ কওম ও

মিল্লাতের নতুন ও পুরাতন, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য—সকল প্রকার ব্যাধিকে এক-পলকে অন্তর্দৃষ্টিতে উপলব্ধি করা, অতঃপর তার অবস্থা, সামর্থ্য ও চাহিদা অনুযায়ী নিয়মিত ই'লাজ করা এবং প্রতিটি রোগীকে তার অবস্থা হিসেবে ব্যবস্থা বা প্রেসক্রিপশন দেয়া নুবুওতের প্রধান অংগ এবং বিশিষ্টতম কর্মের মধ্যে গণ্য। কারণ নবী ও রসূলদের মাধ্যমেই উম্মতদের বিশুদ্ধ, বিধৌত ও পূত পবিত্র করা হয়।

আল্লামা নাজিমুদ্দীন ইসহাক এক সুদীর্ঘ কবিতায় ইবনু তাইমিয়া সম্বন্ধে বলেন: ধর্মের মধ্যে দুর্নীতি ও বিভিন্ন কুসংস্কার থেকে আল্লাহুর দীনকে রক্ষা করার জন্য তিনি স্বীয় জান, মাল ও পরিবার-পরিজনসহ আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছেন। এটাই হচ্ছে নায়েবে নবী ও রসূলের ওয়ারিশ হওয়ার পূর্ণ মর্যাদা। নবীদের পর এই উচ্চতম পূত মর্যাদার হক-দার হয়ে থাকেন ঐ সমস্ত বিশিষ্ট আত্মা, যাঁরা উসওয়ায়ে হাসানার পূর্ণ প্রতিফলন করেন স্বীয় জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে। বস্তুত ইমাম ইবনু তাইমিয়া ছিলেন সব রকমের অন্তরব্যাধির পারদর্শী একজন অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ ডাক্তার। তাই শুধু কালি-কলমই নয়, অধ্যাপনা, বক্তৃতা এবং বাহাস-মুবাহাসা দ্বারা তিনি সমসাময়িক ব্যাধিগ্রস্তদের ই'লাজ করতে চেয়েছেন নিজের জীবনকে বিপন্ন করে। তিনি চেয়েছেন শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কারের আবর্জনা থেকে তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে।

হাফেয যাহাবী ইবনু তাইমিয়ার জীবনীতে বলেন: তাবেঈনদের পর সুন্নতের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। তাই খাঁটি ও নির্ভেজাল সুন্নতের রক্ষণাবেক্ষণ করে তাকে আবার জীবন্ত ও প্রাণবন্ত করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। সত্যকথা বলতে কি, নবী-চরিত্রের পূর্ণ অনুকরণ এবং খাঁটি সুন্নতের স্বচ্ছ ও নিষ্কলংক অনুসরণই তাঁকে নুবুওতী কার্যের প্রকৃত ওয়ারিশ ও যথার্থ উত্তরাধিকারীর সুমহান ও সমুন্নত আসনে অধিষ্ঠিত করে-ছিল।

হাফেজ ইবনুল কাইয়েম

তাঁর পুরো নাম আবু আবদুল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আবু বকর বিন আইউব বিন সা'দ। সবার কাছে তিনি ইবনুল কাইয়েম জাওযীয়াহ নামে প্রসিদ্ধ। কারণ তাঁর পিতা আবু বাকর জাওযীহ মাদ্রাসার কাইয়েম বা সেক্রেটারী ছিলেন। ইবনুল কাইয়েম মানে সেক্রেটারী বা তত্ত্বাবধায়কের ছেলে। তিনি দিমাশ্‌কের এক উচ্চ শিক্ষিত প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারে ৬৯১ হিজরী মুতাবিক ১২৯২ ঈসায়ীতে পয়দা হন এবং ৭৫১ হিজরী মুতাবিক ১৩৫৬ ঈসায়ীতে ইন্‌তিকাল করেন। তিনি ইবনু তাইমিয়ার শুধু প্রিয়তম শাগরিদই ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন তাঁর কারাগারের নির্জন সঙ্গী এবং আজীবন তাঁর জীবনাদর্শের অকুণ্ঠ প্রচারক। পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি জওযীয়াহ মাদ্রাসার ইমামতি এবং সাদরিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপনা শুরু করেন।[১]

এ কথা বলাই বাহুল্য যে উসতায ইবনু তাইমিয়ার ন্যায় তাঁর প্রিয় শাগরিদ ইবনুল কাইয়েমও ছিলেন অষ্টম শতক হিজরীতে মুসলিম জাতীয় জীবনের গভীর অমানিশার মধ্যে আলোকবর্তিকাধারী অগ্রদূত এবং যুগ প্রবর্তক মনীষী। কিন্তু মনে হয় এটা জগতেরই একটা চিরন্তন নীতি যে, এই যুগ-প্রবর্তক মনীষীরা প্রচলিত কুসংস্কার এবং স্তূপীকৃত শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে যখনই রুখে দাঁড়ান, অমনি চারদিক থেকে তাঁর প্রতি লোমহর্ষক ও নির্মম অত্যাচারের পালা শুরু হয়। ইবনুল কাইয়েমের বেলায়ও এই চিরন্তন নীতির একটুও ব্যতিক্রম ঘটেনি।

একবার তিনি ফতওয়া দিলেন, বুযুর্গ কবর যিয়ারতের জন্য বেশ ধুমধাম ও জাঁকজমকের সাথে যাত্রা শুরু করার কোনই প্রয়োজন নেই। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতাসীন শাসনকর্তা দ্বারা তাঁকে একান্ত অপমানজনকভাবে উটের পিঠে উল্টো করে বসিয়ে চাবুক মারা হয়। শুধু তাই নয়, স্বীয় উসতাদ ইবনু তাইমিয়ার সাথে একই বন্দীখানায় তাঁকে আলাদাভাবে নিক্ষেপ করা হলো।

১. তাবাকাতুল হানাবিলা; ইবনু রাজাব: পৃষ্ঠা ৫৯৩।

কারাগার থেকে যখন তিনি মুক্তি পেলেন তখন তাঁর প্রাণপ্রিয় ওস্তাদ এই চিরদুঃখময় নশ্বর জগতের সাথে সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে অবিনশ্বর লোকের সেই অনন্ত যাত্রাপথে পাড়ি জমিয়েছেন (ইন্না লিল্লাহি...)। তাই প্রাণের উৎসারিত স্তূপীকৃত গোপন ব্যথা তাঁর অন্তরকোণেই গুমরে গুমরে মরতে লাগলো। কেউ তা জানতে পারলো না। এত যে বেদনা আর এত যে দুঃখ-কষ্ট তবুও তাঁর নিরলস বন্দিগী, কুরআনখানি ও লেখনী চালনায় একটুও ভাটা পড়েনি।[১]

এ সম্পর্কে কারো দ্বিমত নেই যে, ইমাম ইবনু তাইমিয়া ও হাফেজ ইবনুল কাইয়েম—উভয়েই ছিলেন স্বীয় যুগের মুজাদ্দিদ (Reformer, Renovator)। কেউ কেউ দোষারোপ করেন, এ'রা নাকি সুফী সাধকদের বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু এই ইলযাম সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ, এ'রা নিজেই ব্যক্তিগত জীবনে এই জড়জগতের ভোগবিলাসে আদৌ আসক্ত না হয়ে আজীবন যুহ্দ তাসাউফ (abstemiousness, asceticism) বা অনাসক্তির নিরলস অনুশীলন এবং কৃচ্ছ্র সাধনা করে গেছেন। ইবনুল কাইয়েম স্বয়ং শায়খ হারাভীর 'মানাযিলুস সায়েরীন' নামক তাসাউফ গ্রন্থের বিরাট ভাষ্য লিপিবদ্ধ করেন। এই সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যটির নাম 'মাদারিজুস সালেকীন'। এই শারাহ্‌র মাধ্যমে তিনি ইলমে তাসাউফের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলোকে সার্থক ও চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। ইলমে তাসাউফের বিভিন্নমুখী সর্বাঙ্গ সুন্দর আলোচনা হিসেবে গ্রন্থটিকে সত্যই সার্থক বলতে হয়। সাইয়েদ রশীদ রিযা মরহুম একে মাকতুবায়ে মানার থেকে নিখুঁতভাবে প্রকাশ করেন। এছাড়াও রশীদ রিযা সাহেব ইমাম ইবনু তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়েম লিখিত আরও অনেক অমূল্য গ্রন্থ সুলতান ইবনু সউদের অর্থানুকূল্যে আল-মানার প্রেস থেকে অতি যত্ন সহকারে প্রকাশ করেছেন।

---

১. আল-ফরুসীয়া তুস্ শারয়ীয়া; ইবনুল কাইয়েম : পৃষ্ঠা ৩১।

এখন আমরা অতীত সম্বন্ধে একথা উপলব্ধি করতে পারছি যে, মা'রিফত ও রূহানিয়্যতে অতি উচ্চ আসনে সমাসীন ছিলেন ইমাম ইবনুল কাইয়েম। পবিত্র কুরআনের অলৌকিকতা বা ই'জায শাস্ত্র সম্বন্ধেও তাঁর অভিমত এবং ধ্যান-ধারণা ছিল অতি সুস্পষ্ট। এ সম্পর্কে তাই তিনি একাধিক অমূল্য গ্রন্থ প্রণয়ন করে গেছেন। তাঁর এই গ্রন্থাবলী বেশ কামিয়াব, সার্থক ও সর্বাংগ সুন্দর। সম্ভবত এ প্রসঙ্গে তাঁর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও কামিয়াব পুস্তক 'আল বাদাইউল ফাওয়াইদ'। আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশমীরি এবং মওলানা ইউসুফ সাহেব বিন্নোরী 'মুশকিলাতুল কুরআন' নামক গ্রন্থে এর প্রশংসা করেছেন। এতে ই'জায শাস্ত্র ছাড়াও তাফসীর বিজ্ঞানের অন্যান্য আনুসংগিক আলোচনাও অতি সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত আছে। এছাড়া তাঁর 'কিতাবুল ই'জায ফিল মাজায' নামক গ্রন্থেও কুরআনের ই'জায এবং তার অবিচ্ছেদ্য অংশ অলংকার শাস্ত্র সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনুল কাইয়েমের তৃতীয় গ্রন্থের নাম 'কিতাবুল ফাওয়াইদিল মুশাউ ভিক ইলা উলূমিল কুরআন ওয়া ইলমিল বায়ান'। এটি সর্বপ্রথম মাতবায়ে সাআদাৎ, মিসর থেকে ১৩২৭ হিজরীতে প্রকাশ পেয়েছিল। এতে পবিত্র কুরআনের যাবতীয় ইলম ও তার প্রকার-পদ্ধতি এবং তৎসঙ্গে ই'জাযুল কুরআনের অবিচ্ছেদ্য অংশ অলংকার শাস্ত্রেরও সমাবেশ রয়েছে। মুহাম্মদ বদরুদ্দীন নাসসানী নামক জনৈক আ'লিম এই গ্রন্থটিকে বহু যত্ন ও সংশোধন সহকারে প্রকাশ করেন।[১] এছাড়া তাঁর 'তাফসীরুল মুওয়াযাতাইন' নামক গ্রন্থটিও একবার 'আল-বাদাইউল ফাওয়াইদ'-এর সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছিল। এই তাফসীরুল মুওয়াযাতাইনকে উর্দুতে ভাষান্তরিত করেন মওলানা আবদুর রহীম সাহেব। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩২। পবিত্র কুরআন সম্পর্কে ইমাম ইবনুল কাইয়েমের আরও দু'টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের নাম যথাক্রমে 'আত্ তিব্‌আন ফী আকসামিল কুরআন' এবং 'আমসালুল কুরআন'। প্রথমটি লিপিবদ্ধ হয় কুরআনের প্রকার-পদ্ধতি ও বিভাগ ইত্যাদিকে

১. দেখুন: কাহিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুল আযীম শারফুদ্দীন এম. এ. কৃত হায়াতু ইবনুল কাইয়েম।

কেন্দ্র করে এবং দ্বিতীয়টি কুরআন মজীদের দৃষ্টান্ত, উপমা এবং বিভিন্নমুখী উদাহরণ সম্পর্কে। তাঁর এই কিতাবগুলো প্রামাণ্য, গবেষণামূলক এবং ধর্মভিত্তিক। এগুলোর যথাযথ মূল্য ও গুরুত্ব শুধু যে মুসলমানদের মধ্যেই সীমিত তা নয়, বরং বিশ্বজাহানের কুরআন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছেও অপরিমেয়।

'আত তিবআন ফী আক্‌সামিল কুরআন' নামক কুরআনের শ্রেণীবিভাগ ও প্রকার-প্রণালী সম্পর্কে ইবনুল কাইয়েমের গুরুত্বপূর্ণ ও অনুপম গ্রন্থটি সর্বপ্রথম মক্কা মুয়াজ্জমায় ১৩২১ হিজরীতে প্রকাশ পেয়েছিল। অতঃপর ১৩৫২ হিজরীতে মিসরের তিজারিয়া প্রেসে এর পুনঃমুদ্রণ হয়।

এ প্রসঙ্গে 'তাফসীরুল কাইয়েম' এবং 'তাফসীরুল কাইয়েম' নামক চমৎকার গ্রন্থদ্বয়ও পবিত্র কুরআনের অনন্য খিদমত হিসেবে ইবনুল কাইয়েমের অতি উল্লেখযোগ্য মূল্যবান সংযোজন। দুঃখের বিষয় যে, তাঁর বহু মূল্যবান গ্রন্থ আজ আমাদের নাগালের বাইরে। নতুবা নিঃসন্দেহে আরও সুন্দরভাবে আলোচনা করা সম্ভব হত।

পবিত্র কুরআন ও তার ইলম শাস্ত্র সম্পর্কিত উপরিউক্ত গ্রন্থমালা ছাড়াও তাঁর আরও অসংখ্য বই-পুস্তকের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু কত অমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের অস্তিত্বই জগতের বুক থেকে একেবারে অবলুপ্ত হয়েছে, সেগুলোর নাম কোথাও এখন উল্লিখিতভাবে পাওয়া যায় না। উপরিউক্ত গ্রন্থরাজি ছাড়াও তাঁর নিম্নলিখিত কিতাবগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১. ইজতিমাউল জুয়ূশিল ইসলামিয়া আলা গাযভিল মুয়াত্তালা। পাক ভারতের অমৃতসর জিলার কুরআন ওয়াস-সুন্নাহ প্রেস থেকে জনাব আবদুল গফুর গযনভীর সৌজন্যে ১৩১৪ হিজরীতে প্রকাশ পায়। আমার নিজস্ব লাইব্রেরীতে এটিই মওজুদ রয়েছে। পাক-ভারত থেকে ১৩০৪ হিজরীতেও সম্ভবত এটি একবার মুদ্রিত হয়েছিল। অতঃপর ১৩৫০ হিজরীতেও মিসর থেকে এর পুনঃমুদ্রণ হয়।

২. 'ই'লামুল মুআ'ক্কেয়ীন' ফিকাহ শাস্ত্রে ইহা তাঁর অনবদ্য অবদান। মিসর এবং পাক—ভারত উভয় দেশ থেকেই ইহা প্রকাশ পেয়েছে। আমার শ্বশুর মরহুম মওলানা মুহাম্মদ সাহেব জুনাগাড়ী সর্বপ্রথম এর উর্দু তরজমা করে 'দ্বীনে মুহাম্মদী' নামে ৭ খণ্ডে প্রকাশ করেন। অতঃপর মওলানা ওবায়দুল্লাহ ইমাদী মরহুমও এর আংশিক তরজমা করে প্রকাশ করেন। এর নাম 'সাদ্দু বাবি যারিয়াহ'।

৩. 'ইগাসাতুল লাহফান আলা মাসাইদিস শয়তান' মিসরের মুস্তফা বাবী প্রেস থেকে প্রথমে ১৩২১ সালে প্রকাশ পায়। অতঃপর ১৩৫৭ হিজরী মুতাবিক ১৯৩৯ ঈসায়ীতে শায়খ মুহাম্মদ হামেদ ফিকী আযহারী সাহেব বহু যত্নসহকারে টীকা-টিপ্পনীসহ একে দ্বিতীয়বার প্রকাশ করেন। তিনি এর শুরুতে একবার মূল্যবান মুখবন্ধও সংযোজন করেন।

৪. 'বায়ানুদ দলীল আলা ইসতিগনায়িল মুসাবাকাতি আনিল্-তাহলীল'। ইহা ঘোড় দৌড় (Horse race) সম্বন্ধে লিখিত। এর ফতওয়ার সাথে ইমাম সুবকীর মতানৈক্য ঘটলে তাঁকে বন্দীখানায় প্রেরণ করা হয়।

৫. 'তাহযীবুল মুখতাসার সুনানু আবি দাউদ'। এর মাধ্যমে সিহাহ্ সিত্তার মাশহুর হাদীস গ্রন্থ আবু দাউদের কঠিন কঠিন স্থানকে সহজ ও সরল ব্যাখ্যাসহ পেশ করা হয়েছে। এর পাণ্ডুলিপি মদীনা মুন-ওয়ারাতে এখনও সংরক্ষিত আছে।

৬. 'আল জওয়াবুস শাফী লিমান সুইলা আল দাওয়াইস সাফী'।[১]

৭. 'হাদীউল আরওয়াহ ইলা বিলাদিল আফরাহ'। এতে রয়েছে বেহেশতের বিচিত্র বৈশিষ্ট্য ও অবস্থার কথা। একবার 'ই'লামুল মুয়াক্কেয়ীনে'র হাশিয়ায় ইহা ছাপা হয়েছিল।

---

১. কুতুবখানা আসাফীয়ার ক্যাট্যালগ দ্রষ্টব্য—হায়দরাবাদ ডেক্যান্স : তৃতীয় খণ্ড; পৃষ্ঠা ৪২৮।

৮. 'যাদুল মা'আদ ফী হাদিয়ে খাইরিল 'ইবাদ'। এতে রয়েছে নির্ভরযোগ্য হাদীস ও বিশ্বস্ত রেওয়ায়েতের পরিপ্রেক্ষিতে রসূলে পাকের (সঃ) সুন্দর সীরাত। ইহা চার খণ্ডে সমাপ্ত। আমার কাছে ইহার দু'কপি রয়েছে। উভয় নুসখাই মিসরের ছাপা। একটি 'মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়ার হাশিয়ায় আর অপরটি সীরাতে ইবনু হিশামের সাথে মুদ্রিত হয়েছে। বস্তুত এই অনবদ্য গ্রন্থটি সমস্ত ইসলামী শিক্ষার উৎস। একে উর্দুতে ভাষান্তরিত করেছেন লাহোরের প্রখ্যাত সাহিত্যিক রাঈস আহমদ জাফরী। নাফীস একাডেমী, করাচী থেকে ইহা প্রকাশ পেয়েছে।

এভাবে ইমাম ইবনুল কাইয়েমের অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থরাজি আজ উর্দু ভাষাবিদ ও সাহিত্যিকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় উর্দুতে অনূদিত হয়েছে। এতদিন যা আরবী ভাষার মণিকোঠায় আবদ্ধ ছিল, আজ এই গবেষণামূলক ধর্মভিত্তিক গ্রন্থসমূহের আদর্শকে সামনে রেখে উর্দু ভাষাভাষীরা মৌলিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হচ্ছেন। কিন্তু আমরা বাঙালীরা আজও সেই তিমিরের সেই তিমিরেই রয়ে গেছি। এগুলোর তাই বাংলা তরজমার রয়েছে আশু প্রয়োজন।

মিসরের প্রখ্যাত পণ্ডিত কাহিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জনাব আব্দুল আযীম শরফুদ্দীন ১৯৫৫ ঈসায়ীতে ইমাম ইবনুল কাইয়েমের বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ লিখে প্রকাশ করেন। ১৯৬৩ ঈসায়ীতে এর উর্দু তরজমা করে প্রকাশ করেন করাচী ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক জনাব রশীদ আহমদ এম. এ.—আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ। ডঃ মালিক জুলফিকার সাহেবও লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. ডিগ্রী নেয়ার প্রাক্কালে 'হাফেজ ইবনু কাইয়েম' এই শিরোনামে একটা বিস্তারিত 'মাকালা' লিখেন। বর্তমানে ইহা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত আছে।

আবুল 'আলা আল-মা'আররী

কতিপয় লোক অভিযোগ করেছেন যে, সংশয়বাদী ও যুক্তিবাদী দার্শনিক কবি আবুল আলা 'আল-মা'আররী তাঁর 'আল ফুসূল ওয়াল গায়াত ফী

মুজারাতিস্ সুওয়ারি ওয়াল আয়াত" Chapters on Imitating the suras and verse of the Quran) নামক কাব্যগ্রন্থে কুরআনের বিরোধিতা করেছেন।[১] কথিত আছে যে, উক্ত কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে কতকগুলো লোক বলেছিল: "বইটির বিষয়বস্তু মন্দ নয়; কিন্তু তাই বলে কুরআনের মুকাবিলা এ কস্মিনকালেও করতে পারে না।" এর উত্তরে সেই অন্ধ নাস্তিক কবি মা'আররী বলেছিলেন: "কুরআনের ন্যায় মানুষ যদি প্রতিটি মসজিদ, মাহফিল ও জনসভায় চার শো বছর ধরে আমার কাব্যের পুনরাবৃত্তি করে, তাহলে এর অবস্থাও কুরআনের ঠিক অনুরূপ হয়ে দাঁড়াবে।" মাশহুর ইরানী কবি ও ভূপর্যটক নাসির খসরু (মৃত্যু ১০৬৪ খৃস্টাব্দ) স্বীয় সফরনামায় আল মা'আররী সম্বন্ধে লিখেছেন: "কাব্য ও সাহিত্য সৃষ্টিতে সে যুগে সিরিয়া, ইরাক তথা মাগরিব বা নিকটপ্রাচ্যে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। তিনি আল কুসুল ওয়াল গায়াত' নামক একটি সুমধুর ও আশ্চর্য শব্দ-সম্বলিত কাব্য রচনা করেন এবং তার মধ্যে এ রকম দুর্জ্ঞেয় কূট প্রশ্নাদি ও উপমাও লিপিবদ্ধ করেন যা মানুষের ধারণাতীত ছিল। কিন্তু লোকে এই কাব্য-রচনার জন্য তাঁর দোষারোপ করে থাকে এবং প্রচার করে যে, তিনি এই কাব্যের দ্বারা কুরআনকে উপহাস করতে চেয়েছেন।"

আর-রাফেয়ী মা'আররীর বিরুদ্ধে এই অপবাদকে অস্বীকার করতে গিয়ে বলেন: "একজন উচ্চশিক্ষিত সুধী হিসেবে আল-মা'আররী তাঁর স্বরচিত কাব্যের সাথে কুরআনকে তুলনা করে দেখলে নিশ্চয়ই এর উচ্চতর গুণাবলীকে অনুধাবন করতে পারতেন। আল-মা'আররী নিজেই তাঁর অক্ষমতা সম্বন্ধে ছিলেন অনেকটা সচেতন; তিনি কঠিন ও আশ্চর্য ধরনের শব্দ ব্যবহার করতেন বলে তাঁর রচনারীতি ছিল অনেকটা জটিল ও হেঁয়ালীপূর্ণ। তাই কুরআনের মুকাবিলায় তাঁর সাহিত্যকর্মকে পেশ করার ধৃষ্টতা হয়তো কোনদিনই তিনি প্রদর্শন করতে পারতেন না।

ইবনু রাওয়ান্দীর সাহিত্যকর্মের উপর সমালোচনা করতে গিয়ে মা'আররী নিজেই তাঁর মতবাদের আইডিয়া আমাদের দিয়ে গেছেন। এ

প্রসঙ্গে তিনি বলেছেনঃ "ধর্মদ্রোহী, অগ্নিউপাসক ও সাবেয়ী—সবাই এ বিষয়ে একমত যে, নবী মুস্তফার উপর প্রত্যাদিষ্ট এই পবিত্র গ্রন্থ নিঃসন্দেহরূপে একটা প্রত্যক্ষ মু'জিযা। প্রবল শত্রুদের দ্বারাও এর মুকাবিলা করা কোন দিন সম্ভবপর হয়নি। কারণ এর মনোহর ভাষাশৈলী ও রচনারীতি সুগভীর তাৎপর্যপূর্ণ ভাব, শিক্ষাপ্রদ উপমা ও সুন্দর উপদেশাবলীর অনুকরণ বা সৃজন কোন যুগেই কেউ করতে পারেনি, পারবে না।'

মুস্তফা আর-রাফেয়ী বলেন:) পবিত্র কুরআনের অনুকূলে এক সুন্দরতম উক্তির জন্য মা'আররীকে কেউ কোনদিন বলপ্রয়োগ দ্বারা বাধ্য করেনি এবং তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস এবং অন্তর্নিহিত ভাবটাই এখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকাশ লাভ করেছে। অবশ্য একথা অস্বীকার করা চলে না যে, ধর্ম সম্বন্ধে মা'আররীর আইডিয়া ছিল অতি উদ্ভট, কিন্তু তাই বলে কি কুরআনে করীমের আলঙ্কারিক গুণাবলীর মূল্য রূপায়ণে তাঁর সাধুতা, সততা ও চরিত্রের মাধুর্যকে অস্বীকার করা চলে? যাই হোক, তিনি যে ই'জায শাস্ত্রকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন—আর-রাফেয়ী একথার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। এ সম্পর্কে ইবনু রাওয়ানদীর সাথেও মা'আররীর বেশ গরম গরম প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা-পর্যালোচনা হয়েছিল। আমার মনে হয় আল মা'আররীর প্রাথমিক ধ্যান-ধারণা কুরআনের বিপক্ষেই ছিল; কিন্তু পরে অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিংবা অন্য কোন কারণেই হোক তাঁর মতের আমূল পরিবর্তন ঘটে। মা'আররীর জন্য এটা আশ্চর্য বা অভিনব কিছুই নয়। একটা ধর্মীয় ব্যাপার বা দার্শনিক সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করা এবং রং বদলানো—এটা ছিল তাঁর জীবনের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর সম্পূর্ণ একটা মজ্জাগত ব্যাপার। একজন পুরোপুরি নৈরাশ্যবাদী অন্ধ যিনদীক হিসাবে তিনি প্রতিটি কাজেই তাঁর সঠিক মতামত ব্যক্ত করতে খুব ইতস্তত করতেন। সারা জীবন কাব্যে তিনি ছিলেন বিবর্তনধারায় বিশ্বাসী। 'লুযুমিয়াত' নামক কাব্যগ্রন্থে তিনি কা'বা শরীফ প্রদক্ষিণ, কালো পাথর চুম্বন, সাফা-মারওয়া পাহাড়ে সায়ী, মিনায় প্রস্তর নিক্ষেপ প্রভৃতির বর্ণনা করে হজ্জ ব্রত উদযাপন

করাকে একটা নিছক 'পৌত্তলিক ভ্রমণ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং মুসলমানদের তা থেকে বারণ করেছেন। লোকাচারের ইসলাম সম্পর্কে তিনি বলেন :

হানাফীরা খাচ্ছে হোঁচট, ঈসায়ীরা পথ ভোলে,
ইয়াহুদীরা মরছে ঘুরে, অগ্নিপূজক দোলায় দোলে।

(মুসলিম মনীষা)

কবি তার 'রিসালাতুল গুফরান' (Message of Forgiveness) নামক কাব্যে মুসলমানদের চিরাকাঙ্ক্ষিত জান্নাতকে পৌত্তলিক যুগের কবি ও দার্শনিকের প্রমোদাগার হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এর দ্বিতীয়ভাগে রয়েছে যিনদীক ও মুসলিম স্বাধীন চিন্তানায়কদের বিস্তৃত আলোচনা। আধুনিক পণ্ডিতরা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, ইটালীয় মহাকবি দান্তে (মৃত্যু ১৩২১) তাঁর সুপ্রসিদ্ধ কাব্য 'Divine comedy'র রচনায় মা'আররীর রিসালা থেকেই প্রাথমিক প্রেরণা লাভ করেছিলেন। তার বলিষ্ঠ স্বকীয়তা পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়েছে 'লুযুমিয়াত' নামক কাব্যে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কতদূর প্রগতিমূলক ও আধুনিক ছিলো এতে তার পরিচয় মেলে। বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত ভন ক্রেমার তাঁর 'লুযুমিয়াত' কাব্যেই তাকে সকল যুগের একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ও নীতিবিদ হিসেবে আবিষ্কার করেন; এবং তাঁর অসাধারণ প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তার আধুনিক যুগোপযোগী পরিচ্ছন্ন দৃষ্ট ও জ্ঞানদীপ্ত মনের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আবুল আলা 'আল-মা'আররীর পত্রাবলীও বহু উচ্চাঙ্গের ভাবধারায় সমৃদ্ধ। অধুনা সেগুলো Professor D. S. Margoliouth-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। একথা অনস্বীকার্য যে, কবি ওমর খৈয়ামের উপর আল-মা'আররীর প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। তাঁর একশো নয়টি রুবাইয়াত ইংরেজীতে 'The Diwan of Abul Ala' নামে প্রাচ্যের জ্ঞানভাণ্ডার সিরিজে (Wisdom of the East Series) প্রকাশিত হয়েছে। অধুনা মিসরের স্বাধীন অন্ধ লেখক ডঃ তাহা হুসেন আল-মা'আররীর জীবন বৃত্তান্ত ও মতবাদের উপর আলোকপাত করে একখানা সুন্দর গবেষণামূলক বই লিখেছেন। কিন্তু এই বইয়ের

মাধ্যমে মা'আররীর আসল স্বরূপ ও মনের মানুষটিকে ধরা যাবে না। কারণ অন্ধ লেখক ডঃ তাহা হুসেন হচ্ছেন অন্ধ মা'আররীর পুরোপুরি অন্ধ ভক্ত।

وعين الرضاء عن كل عين كليلة

كما ان عين السخط تبدى المساوى -

অন্তরঙ্গতার চক্ষু প্রতিটি দোষ থেকেই অন্ধ, যেমন অস্বস্তির চক্ষু দোষ প্রকাশেই সন্তুষ্ট।

আবুল 'আলা আল-মা'আররী সম্বন্ধে নিরঙ্কুশ অবগতির জন্য তাই করাচীর আবদুল আযীয মাইমান কৃত ابو العلاء ماله وما عليه এবং মিসরের ডঃ আহমদ আমীনের লেখাগুলোই সবচাইতে উৎকৃষ্ট ও নির্ভর-যোগ্য মনে করি।

শারীফ আল-মুরতাযা

শারীফ আল-মুরতাযা (মৃত্যু ৪০৬ হিঃ—১০৪৪ খ্রীঃ) ই'জায শাস্ত্রের উপর একখানা সুন্দর গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন তা ধরাপৃষ্ঠ থেকে অবলুপ্তপ্রায়। পণ্ডিত আবদুল আলীম বলেন : বইটি হারিয়ে যাওয়া মুসলিম জাতীয় জীবনে একটা চরম দুর্ভাগ্য বলতে হবে। কারণ শারীফ মুরতাযা ছিলেন অগাধ পাণ্ডিত্যের মালিক, তাই কুরআনের ই'জায সম্পর্কে তাঁর মতামত অবহিত হওয়ার যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল।[১] আন-নাযযামের সাথে তাঁর মতামতের কিছুটা তুলনা করা যেতে পারে। অন্যান্য পণ্ডিতের মাধ্যমেও তার কিছু কিছু মতামত প্রকাশ পেয়েছে এবং বিভিন্ন সূত্র ধরে তাঁর সাহিত্যকর্মের কিয়দংশ এখন পাওয়া যায়। ধর্ম ও ইসলাম সম্পর্কে যে সমস্ত প্রশ্ন তাকে করা হতো সেগুলোর তিনি লিখিত উত্তর

১. See the article on the ijajul Quran by Abdul Alim in the Islamic culture, Hyderabad. Deccan nos. 1 and 2, 32nd year.

দিতে অভ্যস্ত ছিলেন। এই লিখিত পত্রোত্তরের কিয়দংশ এখনও বার্লিনে মওজুদ রয়েছে।[১] এর দুটো পত্রে তিনি ই'জায সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং এই বিষয়বস্তুর উপর তিনি স্বীয় মতামতও সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন।[২] পণ্ডিত আবদুল আলীম বলেন ঃ "আল-মুরতাযাও নাকি সারফা মতবাদের নেতৃত্ব হাতে নিয়েছিলেন এবং তিনিই হচ্ছেন এই অভিমত পোষণকারী সর্বশেষ পণ্ডিত। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, মূল গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্যতা হেতু আল-মুরতাযার মতামতের উপর বৈজ্ঞানিক উপায়ে সমালোচনা করা এখানে আদৌ সম্ভবপর হচ্ছে না।

আর-রাফেয়ী স্বীয় ই'জাযুল কুরআনে শারীফ আল-মুরতাযার বরাতে বলেন ঃ "সারাফা মতবাদের অর্থ হচ্ছে এই যে, কুরআনের মুকাবিলার জন্য যে সুগভীর জ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন ছিল, আল্লাহ্ সে জ্ঞান থেকেই তাদেরকে বঞ্চিত করে রেখেছেন। যাই হোক, আর-রাফেয়ী তার ই'জাযুল কুরআনে শিয়া মতাবলম্বী আল মুরতাযার যে সমস্ত মতামত ব্যক্ত করেছেন তা' অনেকটা জটিল ও হেঁয়ালীপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে।[৩]

এখানে আন-নায্যাম ও মুরতাযা—এই উভয় মনীষীর 'সারাফা' মতবাদে বেশ কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কারণ আন-নায্যামের মতে সারাফার অর্থ এই যে, কুরআনের মুকাবিলা করার পূর্ণ সামর্থ্য ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আরবরা তা' পারে না, কিন্তু আল-মুরতাযার মতে এর অর্থ হচ্ছে এই যে, মুকাবিলার জন্য যা কিছু সম্ভব এবং যে জ্ঞান-গরিমা ও যোগ্যতা প্রয়োজন তা' পূর্ণমাত্রায়ই ছিল তাদের মাঝে, কিন্তু পরে তা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। আবদুল আলীম বলেন ঃ যারা সারাফা মতবাদের মাধ্যমে কুরআনের ই'জাযকে স্বীকার করতে চেয়েছেন তাদের মধ্যে শারীফ মুরতাযাই সম্ভবত সর্বশেষ। কিন্তু তার উক্তি ঠিক নয়। কারণ তাঁর পণ্ডিত ইবনু সিনান আল-খাফফাজী ও সারাফাকে ই'জাযের একমাত্র প্রমাণ হিসেবে বিশ্বাস করতেন।

১. Ms. Berlin Ret. 40.
২. Ms. Berlin Ret 39, Fol 4a—56, 94a.
৩. ই'জাযুল কুরআন, মুসতাফা আর-রাফেয়ী ঃ পৃষ্ঠা ১৪০।

হিবাতুল্লাহ্ আশ-শিরাজী

আবু নাসর হিবাতুল্লাহ্ আশ-শিরাজী (দায়ীউদ দু'আ' নামে পরিচিত) ছিলেন সংশয়বাদী কবি আবুল 'আলা আল-মা'আররীর সমসাময়িক। রাওয়ানদীর পক্ষ থেকে যে সমস্ত অভিমত পেশ করা হয়েছিল, তিনি সেগুলোর বেশ সুন্দর ও সার্থক জবাব দিয়েছিলেন। রাওয়ানদীর মতে কুরআনের মুকাবিলার জন্য নবীয়ে আকরামের (সঃ) চ্যালেঞ্জে আরবরা যে সাড়া দিতে পারেনি—এটা কুরআনের ই'জাযের জন্য যথেষ্ট প্রমাণ নয়, হতে পারে না। আর তাছাড়া আরবদের জন্য তা' ক্ষণিকের তরে ই'জাযের প্রমাণস্বরূপ মেনে নিলেও অনারবদের জন্য তা' কখনো মেনে নেয়া যেতে পারে না। Prof. Paul Kraus হিবাতুল্লাহ শিরাজী সম্বন্ধে বলেন যে, তিনি নাকি একবার রাওয়ানদীর প্রশ্নের জবাব এই মর্মে দিয়েছিলেন: "প্রতিটি শব্দ প্রকাশ করে তার বিশিষ্ট অর্থ, তাই শব্দগুলো যেন একটা অঙ্গ বিশেষ আর অর্থ হচ্ছে তার রূহ বা আত্মা।"[১] একথাও হয়তো কারও অবিদিত নয় যে, শারীরিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তেমন একটা পার্থক্য নেই, আর থাকলেও সেটা ধরার বিষয় কিছু নয়। কিন্তু যে রূহ বলতে বুঝায় শব্দের অর্থকে, সেই রূহের বেলায় ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যরূপ।

তাই বিশেষ বিশেষ রূহ জগতের বুকে এমন গুরুত্বপূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করে এবং এই মাটির পৃথিবীতে এরূপ নজীর পেশ করে যা নিখিল ধরণীর মানবকুলও পারে না। তখন সেই একটি রূহের ওজন বা পরিমাণ হয়ে দাঁড়ায় সারা দুনিয়ার মানবমণ্ডলীর চাইতেও বেশী। অতএব পবিত্র কুরআনের শব্দসমূহ হচ্ছে এর শরীর আর অর্থ হচ্ছে এর রূহ এবং এই অর্থের সঙ্গেই আল্লাহ্ পাক অশেষ জ্ঞানভাণ্ডারকে সংযোজিত করে রেখেছেন এই স্বর্গীয় গ্রন্থের প্রতিটি রচনাপদ্ধতিতে। তাই হে আমার প্রতিপক্ষ! তুমি যখন বলো যে, "কুরআনের শব্দসম্ভারে মু'জিযা রয়েছে শুধুমাত্র আরবদের জন্য, অনারবদের জন্য নয়, আমি তার এই উত্তর দিই যে, কুরআনের

---

১. The history of the idea of the Ijaz of the Quran : Mr. Naim al-Himsi, Islamic Review, February-June 1366, P. 27.

শব্দসমূহের মাঝে যে বিশিষ্ট অর্থ ও অশেষ জ্ঞানরাশি নিহিত রয়েছে এটাই হচ্ছে এর মু'জিযা আরব অনারব সকল ভাষাভাষীর কাছে।"[১]

এক্ষণে তাই স্পষ্টতই একথা প্রতীয়মান হয় যে, আশ-শিরাজীর মতে কুরআনের ই'জায শুধুমাত্র এর শব্দসম্ভারের মধ্যেই নয়, বরং অর্থের মাঝেও নিহিত রয়েছে। শব্দসমূহের অর্থকে তিনি আত্মা বা জ্ঞান সিন্ধুরূপে মনে করেন। একজন আরবের কাছে কুরআন যদি এর শব্দের দিক দিয়ে মু'জিযা হতে পারে, তবে অনারবের কাছে এর অর্থ মু'জিযা হতে পারবে না কেন? এই প্রমাণপঞ্জীর মাধ্যমেই তিনি রাওয়ানদীর ই'জায সংক্রান্ত বিরূপ সমালোচনার উত্তর দিয়েছিলেন।

কাযী আবু বাকর আল-বাকিল্লানী

ই'জাযুল কুরআনের বিরুদ্ধে সে যুগে যে ব্যাপকভাবে হামলা শুরু হয়েছিল, তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছিলেন মুহাম্মদ বিন তাইয়েব বিন জাফর বিন কাসিম আল-বাকিল্লানী আল-বাসরি (মৃত্যু ৪০৩ হিজরী ঃ ১০১২ খৃঃ)। তিনি সাধারণত কাযী আবু বাকর হিসেবেই পরিচিত। তিনি অধিবাসী ছিলেন বসরার, কিন্তু তার কর্মবহুল জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়েছে বাগদাদ নগরীতে এবং তার এই নশ্বর জীবনের অবসানও ঘটে সেখানে। তার কর্মবহুল জীবনের বিস্তৃত ইতিহাস জানা যায় না, তবে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, এক সময়ে তিনি উকবারাহ এবং বাগদাদে মালিকী মযহাবের কাযী ছিলেন এবং অন্য এক সময়ে কনস্টান্টিনোপলের রাষ্ট্রদূতের কাজ করেন।[২]

---

১. বাইরূত থেকে প্রকাশিত আরবী পত্রিকা 'আল আদীব' ১৯৪৩—৪৪ খৃস্টাব্দ ঃ পৃষ্ঠা ৩২।

২. ইয়াকূত রূমী কৃত 'ইরশাদুল আদীব ফী মা'রিফাতিল আদীব' ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৫ Ed, S D, Margoliouth, 2nd edition, : 1923-31.

ধর্মতত্ত্ব—বিশেষত বিতর্কমূলক বিষয়াদির উপর লিখতে তিনি ভালোবাসতেন। নিম্নলিখিত ফিরিস্তি থেকেই আমরা তার সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা লাভ করতে পারি।

১. কিতাবুল ইবানাহ আন্ ইবতালে মাযহাবে আহলিল কুফরি ওয়ায্ যালালাহ।

২. কিতাবুল ইসতিহাদ।

৩. শারাহ আদাবুল জাদাল (এ্যান এক্সপ্লানেশান অব দি আর্ট অব আরগুমেন্ট)।

৪. আল্ ইমামাতুল কবিরাহ্।

৫. আল্ উসূলুল কবীর ফিল ফিকহি।

৬. আল্ মাসাইল ওয়াল মুজালাসাত (কোশ্চেন্স এন্ড ডিবেট)।

৭. কিতাব আলাল মুতানাসিখীন।

৮. কিতাব আলাল মুতাযিলাহ ফী তাভীলিল কুরআন।

৯. হিদায়াতুল মুসতারশিদীন (গাইডেন্স ফর দোজ হু সিক গাইডেন্স)।

১০. আল-ইরশাদ ফী উসূলিল ফিকহি (গাইডেন্স ইন্ দি প্রিন্সিপাল অব ফিক্হ)।

১১. আল্ ইনতিসার ফিল কুরআন (ভিক্টোরথ্রু আল-কুরআন)।

১২. দাকাইকুল কালাম।

১৩. কিতাবুদ দিমাউল্লাতী জারাত বাইনাস সাহাবা।

১৪. কিতাবুল বায়ান আন ফারাইযিদ দ্বীন ওয়া শারিআতিল ইসলাম।

১৫. কিতাবু মানাকিবিল আইম্মা (The book of the merits of the Imams)।

১৬. কিতাবুত্ তাবসিরাহ্।

১৭. কাশফুল আসরার ফী আর-রাদ্দি আলাল বাতানিয়াহ্।

১৮. কিতাবুল ইন্সাফ ফী আসবাবিল খিলাফ।

১৯. কিতাবুল ই'জায।

২০. কিতাবুল হিয়াল ওয়াল মাখারিক (A book on the real subterfuges & tricks)।

এতগুলো বইয়ের মধ্যে মাত্র ছয়খানা পুস্তক কালের বহু আবর্তন বিবর্তনের সংগে সংঘর্ষ করে আমাদের নিকট পৌঁছতে পেরেছে। সেগুলোর নাম হচ্ছে যথাক্রমে ঃ

১. আল্ ইনসাফ

২. ই'জাযুল কুরআন

৩. কিতাবু মানাকিবুল আইম্মা

৪. আল-ইনতিসার ফী আল-কুরআন

৫. আল মু'জিযাত

৬. আত্তাম্হীদ

এবং মাত্র চারখানা পুস্তক প্রকাশিত হয়ে বহির্জগতের আলো দেখতে পেরেছে। এই চারখানার নাম হচ্ছে ঃ

১. ই'জাযুল কুরআন

২. আত্-তামহীদ

৩. আল-মু'জিযাত (The miracles)

৪. আল্-ইনসাফ (The Iquity)

এর চাইতে পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে যে, আল-বাকিল্লানীর অধিকাংশ কিতাবই আজ ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন। তাই তাঁর ন্যায় সুধী সজ্জনের বিদ্যাবত্তা ও অশেষ জ্ঞান-গরিমাপূর্ণ উপদেশাবলী এবং মতামত

থেকেও আজ আমরা বঞ্চিত। কিন্তু সৌভাগ্যবশত তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান ই'জাযুল কুরআন আজ সর্বত্র পাওয়া যায় এবং এই সমস্যার উপর পূর্বসূরিদের চাইতে তাঁর আলোচনাই অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত ও ধারাবাহিক বলে মনে হয়। আল্-বাকিল্লানী বারবার জোর দিয়ে বলেছেন যে, কোন মানুষের পক্ষেই কুরআনের অনুপম ভাষা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

আল-বাকিল্লানী ছিলেন আবুল হাসান আল-আশ'আরীর বিশিষ্ট অনুগামী এবং আব্বাস বিন্ মুজাহিদ আত্-তাইর শাগরিদ। তিনি সে যুগে ধর্মসাহিত্য ও তাওহীদের একজন নেতৃস্থানীয় পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাই দশম ও একাদশ শতাব্দীর পণ্ডিতদের মাঝে এই ই'জায শাস্ত্র সম্পর্কে কিছুমাত্র ত্রুটি-বিচ্যুতি বা ন্যূনতা থাকলে তিনি সেই বাকী অভাবকে পূর্ণ মাত্রায় মোচন করতে পেরেছিলেন তাঁর অমর গ্রন্থ ই'জাযুল কুরআনের মাধ্যমে।

আরবী সমালোচনা সাহিত্যের স্থান নির্ণয়ে আল-বাকিল্লানীর স্থান সত্যিই অনুপম। বিশেষ বিশেষ কবিতা বা তার অংশবিশেষের গুণাগুণ সম্পর্কিত বহু আলোচনামূলক নিবন্ধ এমন কি পূর্ণ গ্রন্থও আরবী সাহিত্যে পাওয়া যায়। কিন্তু ইমরাউল কাইস এবং বুহ্তারীর সুদীর্ঘ দুটি কবিতার অপেক্ষাকৃত সুন্দর অংশ নির্ণয় করতে গিয়ে বাকিল্লানী যে চমৎকার আলোচনা করেছেন তার কোন তুলনা আরবীর সমালোচনা সাহিত্যের আর কোথাও নেই। তাছাড়া উদ্দেশ্য ও বিন্যাসের দিক দিয়ে বাকরীতির উপর লিখিত পরিচ্ছেদটি এত অনু-পম এবং অভিনব যে, মনে হয় যেন এ ধরনের লেখা এই সর্বপ্রথম। অলংকার শাস্ত্রবিদদের মতে আল্-বাকিল্লানী অলঙ্কার শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ নন। তাঁর দৃষ্টি-ভংগী কতকটা শিক্ষিত আনাড়ির দৃষ্টিভংগীর ন্যায়। তথাপি তিনি তাঁর আলোচনায় ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করেছেন, আধুনিক কালেও তার নজীর সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। তখন পর্যন্ত ই'জায শাস্ত্রের উপর যতগুলো মতবাদ পেশ করা হয়েছিলো, তিনি সেগুলোকে নিয়ে আবার নতুনভাবে বিস্তারিত আলো-চনা পর্যালোচনা করেন। ধর্মীয় ব্যাপারে সে যুগের সাধারণ প্রচলিত মনো-ভাবকে তিনি অকপটে ব্যক্ত করেন। বিশেষ করে ই'জাযুল কুরআনের প্রশ্নকে

কেন্দ্র করে তিনি ঐ সমস্ত লোকের বিপক্ষে একান্ত সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন। যাঁরা ধর্ম-কর্ম ও ঈমানের ব্যাপারেও দোদুল্যমান অবস্থায় থেকে একান্ত দ্বৈত-ভাবে পোষণ করে। ই'জাযের ক্রমবর্ধমান ইতিহাসে কাযী আল-বাকিল্লানীর এই অমর গ্রন্থটির স্থান অতি উচ্চ এবং প্রভাব অনন্য ও অতুল। তাই নেহায়েত অপ্রাসংগিক হবে না যদি এই বিষয়বস্তুর উপর তাঁর প্রধান ধারণাগুলো সম্পর্কে এখানে কিছুটা আলোচনা করা যায়। আল-বাকিল্লানীর চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভংগীর সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ দেয়া যেতে পারে :

১. পবিত্র কুরআন স্বয়ং নবী মুস্তফা (সঃ)-এর নুবুওতের জ্বলন্ত প্রমাণ। তাই তাঁর আসল মু'জিযাই হচ্ছে আল-কুরআন। এই শাশ্বত সত্যকে কোনক্রমেই সন্দেহ করা চলে না। কারণ ইহা ঠিক স্পষ্ট দিবালোকের মতই স্বচ্ছ ও সনাতন। আল-বাকিল্লানীর এঁহেন উক্তির অনুকূলে ও সমর্থনে স্বয়ং কুরআনে হাকীমের আয়াতসমূহের বহু উদ্ধৃতি রয়েছে। হ্যাঁ, এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আল-বাকিল্লানী যে পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাকে একান্ত অভিনব বলা চলে না। কারণ তাঁর পূর্বসূরিগণও ঠিক এই নীতি অবলম্বন করেছিলেন।

২. ই'জায শাস্ত্রের উপর এই বই লিখতে যাওয়ার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, কতিপয় লোক কুরআনের প্রামাণিকতায় ঘোর আপত্তি জানায়। শুধু তাই নয়, তারা পবিত্র কুরআনকে আরবী কবিতার সাথে তুলনা করতেও এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করেনি। দুঃখের বিষয় যে, আলিম সম্প্রদায় যথাযথরূপে এর প্রতিবাদ জানাতে পারেন নি। পরিণামে বহু মুসলমানের অন্তরে কুরআনের বিরূপ সমালোচনার স্পৃহা জেগেছে এবং তাঁদের মনে নানা সন্দেহের উদ্রেকও হয়েছে।

৩. কুরআনের ই'জায সম্পর্কে আল-জাহিযও গ্রন্থ লিখেছেন, কিন্তু তা যথেষ্ট ছিল না। কারণ তিনি এই বিষয়বস্তুর উপর শুধুমাত্র মুতাকাল্লিমদের রচনা পদ্ধতিরই পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। আল-বাকিল্লানী এ প্রসঙ্গে তাঁর পূর্বসূরী আল ওয়াসেতী, রুম্মানী ও খাত্তাবীর কোন নামোল্লেখই করেন নি।

৪. সে যুগের প্রচলিত একটা মতবাদ ছিল এই যে, কুরআন শুধুমাত্র বা নবী মুস্তফা (সঃ)-এর সমসাময়িক আরবদের জন্যই ছিল মু'জিযা। অন্য যুগে অন্যদের জন্য কখনোই ছিল না। কিন্তু আল-বাকিল্লানী জোর গলায় একথা প্রতিপন্ন করে দিয়েছেন যে, শুধু সে যুগের আরবদের জন্য নয়, বরং সকল সময়ে, সকল যুগে, সকল আরব ও অনারবদের জন্যই ইহা চিরন্তন মু'জিযা। অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে তুলনা করে দেখলেই এ উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন হয় সর্বতোভাবে।[১]

৫. কুরআন তিলাওয়াত বা শ্রবণ করার প্রতিক্রিয়া বা ফলাফলের প্রতি বেশ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি কুরআনের কতিপয় আয়াত উদ্ধৃতি করে তা সপ্রমাণ করতে চেয়েছেন। তিনি এ কথাও প্রতিপাদন করেছেন যে, কুরআন মু'জিযা না হওয়ার জন্য এ পর্যন্ত কোনই প্রমাণপঞ্জী পেশ করা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। পক্ষান্তরে কুরআনুল করীম আরবদের একাধিকবার বজ্রনিনাদে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছে এর মুকাবিলার জন্য—সে মুকাবিলা যে কোন প্রকারেই হোক না কেন।[২]

৬. কুরআন এমনই এক অনুপম গ্রন্থ যে, অন্যান্য আসমানী কিতাবের সাথে তুলনা করলেই এর মু'জিযাকে সম্যক উপলব্ধি করা যায়। বিশেষ করে এর সাহিত্যিক মান ও রচনাশৈলী তো একেবারেই অনন্য ও অতুলনীয়।

৭. যদি এ প্রমাণ হয় যে, কুরআন একটা অমর মু'জিযা এবং নিখিল বিশ্বের মানবকুল এর মুকাবিলায় সম্পূর্ণ অক্ষম, তবে এটা কেন প্রমাণ হবে না যে, কস্মিনকালেও ইহা মনুষ্যসৃষ্ট বা কোন কবির কল্পনাপ্রসূত নয়?

৮. আরবরা একবারও যদি কুরআনের চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করতে সাহস করত, তবে সে কথা আজ কারো কাছে অবিদিত রইত না। আর এ কথারও কোন সাক্ষী-সাবুত নেই যে, নবী মুহাম্মদ (সঃ) যখন তাদের কাছে চ্যালেঞ্জ

---

১. ই'জাযুল কুরআন : আল-বাকিল্লানী : পৃষ্ঠা ৩—৫।

২. ই'জাযুল কুরআন : আল-বাকিল্লানী : পৃষ্ঠা ৬।

পেশ করলেন তখন তারা কেউ এটা জানতে পারেনি কিংবা আঁ হযরত (সঃ) স্বয়ং চ্যালেঞ্জের সেই আয়াতগুলোকে দাবিয়ে রেখেছিলেন। আল-বাকিল্লানী প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, চ্যালেঞ্জ সম্বলিত আয়াতগুলো অবিলম্বে প্রচারিত হয়েছিল অতি ব্যাপকভাবে। তাছাড়া কুরআনকে মনগড়া বলেও তারা আপ্রাণ চেষ্টা নিয়েছিল এর মুকাবিলা করতে।

৯. পবিত্র কুরআনের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে যারা এর বিরুদ্ধে সমালোচনা করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছে তাদের সেই সমালোচনা ও ইল-যামগুলোকে শুমার করে আল-বাকিল্লানী তৎসম্পর্কে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

(ই'জাযুল কুরআন; কাযী আল-বাকিল্লানী। পৃঃ ১১)

১০. আল-বাকিল্লানী এই অভিমত পোষণ করেন যে, কুরআনের রচনায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষমতা থাকলে আরবরা তা' করতে কোনদিনই পশ্চাদ-পদ হতো না; বরং এ পথে তাদের সার্বিক ও সম্ভাব্য শক্তিকে তারা নিয়োজিত করতো এবং এ করতে গিয়ে নিশ্চয়ই তারা সে যুগের উত্তম কাব্য কলা ও শ্রেষ্ঠ গদ্য সাহিত্যের সাহায্য গ্রহণ করতো। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব ও মনুষ্যশক্তির বহির্ভূত জেনেই তারা এই দুর্গম যদ্ধের পথে পা বাড়াতে দুঃসাহস করেনি।

১১. আল-বাকিল্লানী বলেন: কুরআনের ই'জাযকে শুধু তাঁরাই সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারেন, যাঁদের মাঝে পূর্ণমাত্রায় সাহিত্যিক, কাব্যিক ও আলংকারিক প্রবণতা এবং অভিরুচি রয়েছে। নবী করীম (সঃ) যখন সূরা আস্-সাজদাহ্ তিলাওয়াত করছিলেন আর উৎবা বিন রাবীয়াহ্ যবনিকার অন্তরাল থেকে তা' মন্ত্রমুগ্ধবৎ শ্রবণ করছিল; অনুরূপভাবে আবু সুফিয়ান তাঁর ইসলামে দীক্ষার কথা ঘোষণা করে আঁ হযরতের (সঃ) সমীপে হাযির হয়েছিলেন—ই'জাযের আনুকূল্য এ সমস্ত ঘটনা অতি সুন্দর-ভাবে বর্ণনা দিয়েছেন আল-বাকিল্লানী তাঁর এই অনুপম গ্রন্থে।

১২. পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে যে সমস্ত সমালোচনা করা হয়েছে এবং আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতীর 'আল ইতকান' গ্রন্থে যেগুলোর উল্লেখ

রয়েছে—আল-বাকিল্লানী তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, মানবীয় বাণী কোনদিনই ঐশী বাণীর সমকক্ষ হতে পারে না।

(ই'জাযুল কুরআন; আল-বাকিল্লানী : পৃঃ ১৭)

১৩. আল-বাকিল্লানী বলেন : ইবনুল মুকাফ্‌ফা নাকি কুরআনের মুকাবিলা করেছেন বলে কতিপয় লোক অভিযোগ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন : 'দুররাতুল ইয়াতিমাহ' ইবনুল মুকাফ্‌ফার আদি সাহিত্য-কর্ম নয়; বরং এর উপমাগুলো অন্যের কাছ থেকে ধার নেয়া হয়েছে। আল-বাকিল্লানী বলেন যে, ইবনুল মুকাফ্‌ফা স্বয়ং নাকি তাঁর জীবন সায়াহ্নে একথা স্বীকার করে গেছেন মুক্তকণ্ঠে।[১]

১৪. আল-বাকিল্লানী বলেন : আরবী ভাষায় শব্দসমূহ যেরূপ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়েছে, ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে কুরআনের ই'জাযও তদ্রূপ বিভিন্নরূপে প্রকটিত হয়েছে।

১৫. আল-বাকিল্লানী বলেন : কতকগুলো লোক পবিত্র কুরআনকে কবিতা বলে ঘোষণা করেছেন, আবার কেউ বলেছেন যে, কুরআন প্রকৃত প্রস্তাবে বিভিন্ন বাকভঙ্গীর বিভিন্ন বিন্যাস ও শিল্পকুশলতা দ্বারা শুধু সুবিন্যস্ত। কিন্তু আল-বাকিল্লানী পরিশেষে মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, পবিত্র কুরআনকে যে কোন প্রকারের প্রচলিত রচনারীতির সংগে তুলনা করা একান্ত ধৃষ্টতা।

১৬. আল-বাকিল্লানী বলেন : যাঁরা কুরআনকে মু'জিযা বলে স্বীকার করেন নি, তাঁদের মধ্যে আন নায্‌যাম, আব্বাদ বিন সুলায়মান এবং হিশাম আল-কিবরবীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২]

প্রকৃত প্রস্তাবে এরা কুরআনের ই'জাযকে ইনকার করেন নি, বরং 'সারাফা' মতবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন মাত্র।

---

১. ই'জাযুল কুরআন; কাযী আল-বাকিল্লানী ; পৃষ্ঠা ১৭।
২. ই'জাযুল কুরআন; আবূ বাকর আল-বাকিল্লানী : পৃষ্ঠা ১৬।

১৭. শুধুমাত্র রচনারীতির উৎকর্ষতা ও সৌন্দর্যকে ই'জাযের মাপকাঠি হিসাবে গণ্য করলে আদৌ সমীচীন হবে না; কারণ সে যুগের বহু আরবী কবিতা ও গদ্য সাহিত্য অতুলনীয় সৌন্দর্যের প্রতীক ছিল।

১৮. আরবরা কুরআনের রচনায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে কোনদিন যে সক্ষম হয়নি—এই সত্য থেকেই অনারবরা এর ই'জাযকে অতি সহজেই উপলব্ধি করতে পারে সম্যকরূপে। আল-বাকিল্লানী কুরআনের বিষয়-বস্তুকে অতি সূক্ষ্মভাবে আদ্যোপান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর আরবী ভাষায় লিখিত অপরাপর গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সাথে এর তুলনা করেন। এতে করে উভয়ের মাঝে যেন সপ্তসিন্ধুর ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আরবী ভাষায় যারা একেবারেই অজ্ঞ অথবা এ ভাষার অন্তর্নিহিত ভাবধারা ও সৌন্দর্যকে অনুধাবন করার মত যোগ্যতা যাদের নেই, এ ব্যাপারে তাদের অন্যের মতামতের উপর নির্ভর করা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। আল-বাকিল্লানী কুরআন ছাড়া আর সমস্ত আরবী সাহিত্যিক কুরআনের তুলনায় অনেক নিম্নস্তরের বলে প্রতিপন্ন করার অনেক জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এজন্য তিনি তাঁর পুস্তকে সম্পূর্ণ নতুন তিনটি বিভাগের অবতারণা করেন। প্রথম খণ্ডে তিনি কুরআনে আরব কবিদের দ্বারা ব্যবহৃত বাকরীতি ও রচনারীতির ব্যবহার প্রদর্শন করেছেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ডে তিনি উদাহরণ হিসেবে ইমরাউল কায়সের মু'আল্লাকা এবং আল-বুহ্‌তারীর বিখ্যাত কবিতাটি উপস্থিত করে কুরআনের ভাষাশৈলীর তুলনায় সেগুলোর ভাষা-শৈলী যে কত দুর্বল এবং অসম্পূর্ণ তা প্রমাণ করেন। পবিত্র কুরআনের সাথে মু'আল্লাকার তুলনা করতে গিয়ে প্রথমে তিনি উভয়ের উৎকর্ষতা ও সৌন্দর্যকে প্রকাশ করেন। অতঃপর তিনি মুআল্লাকার অপধৃষ্টতাকে লোক-চক্ষুর সম্মুখে তুলে ধরে বলেন: ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্য সম্পর্কে যাদের একটুও ধারণা রয়েছে তারা নিঃসংকোচে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে যে, কুরআন ও মুআল্লাকার মাঝে রয়েছে আসমান-যমীন তফাত। তিনি আরও বলেন: যে ব্যক্তি ইমরাউল কায়সের কবিতার সঙ্গে কুরআনের

তুলনা করে সে দলচ্যুত গর্দভ অপেক্ষাও অধিকতর বিপথগামী হয় এবং হাবান্নাকা অপেক্ষা অধিকতর মূঢ়তার পরিচয় দেয়।[১]

অতঃপর আল্-বুহ্তারী সম্বন্ধে তিনি বলেন : 'অন্যান্য সমসাময়িকদের তুলনায় সাধারণত আমরা কাব্যিক অলংকারের জন্য আল-বুহ্তারীকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি এবং প্রকাশপদ্ধতির সৌন্দর্য, শব্দমাধুর্য, ভাষার সাবলীলতা এবং তাঁর উক্তির কদাচিত দুর্বোধ্যতার জন্য আমরা তাঁকে সকলের উর্ধ্বে স্থান দিয়ে থাকি। কারণ ভাষার বিশুদ্ধতা ও বক্তব্যের শিল্পচাতুর্যকে কাব্যিক প্রচেষ্টার কাঠামোতে গ্রথিত করতে তিনি অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেন; কিন্তু তবুও আমাদের একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, কবিতা মানবীয় শক্তির আয়ত্তাধীন, উন্নতি ও সম্ভাবনাধীন এবং মানবীয় প্রকৃতির মূলীভূত বস্তু। পক্ষান্তরে কুরআনের রচনা মানবীয় কল্পনা ও চিন্তার অতীত এবং সর্বজন নির্বিশেষে অশিক্ষণীয় এবং অসাধ্য এক ভাষা। দিবস এবং রাত্রির মধ্যে অন্তঃশূন্য অহংকার এবং সত্যের মধ্যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরের বাণী ও মানুষের ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য বুহ্তারীর কবিতা ও কুরআনের মধ্যে ততোধিক দিগন্তপ্রসারী ব্যবধান বিদ্যমান'।[২]

১৯. আল-বাকিল্লানী 'সারাফা' মতবাদকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেন এবং এর বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদও জানান। তাঁর মতে কুরআনের ই'জায দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট। এর কারণ হচ্ছে তিনটি :

(ক) এ কথা অনস্বীকার্য যে, কুরআনে রয়েছে এমন কতগুলো ভবিষ্য-দ্বাণী—যা সম্পূর্ণরূপে মানবীয় নাগালের বাইরে।

(খ) একথাও নিঃসন্দেহ যে, নবী মুস্তফা (সঃ) ছিলেন উম্মী বা নিরক্ষর। শুধু তাই নয়, লোক পরম্পরায় কোন পুরানো কাহিনী শ্রবণ

১. G. W. Freytag, Arabum Proverbia, 1838 'আহমাকু মিন হাবান্নাকা'।

২. ফজলুর রহমান অনূদিত ই'জাযুল কুরআন : পৃষ্ঠা ১৬৮।

অথবা পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহের অধ্যয়ন—এ কাজও তিনি করেন নি কোনদিন। অথচ কুরআনে রয়েছে হযরত আদমের জন্মবৃত্তান্ত থেকে শুরু করে পুরাকালে সংঘটিত বহু ঘটনার অপূর্ব সমাবেশ। অতএব এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই যে, আঁ হযরত (সঃ) 'ওহীয়ে জালী' অর্থাৎ প্রকাশ্য ঐশী বাণীর মাধ্যমেই সমুদয় জ্ঞান হাসিল করেছিলেন।

(গ) ভাষাশৈলী, রচনা ও সাহিত্যরীতি এবং ফাসাহাত-বালাগাতের দিক দিয়েও কুরআন সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যশক্তির নাগালের বাইরে।

অবশ্য আল-বাকিল্লানীর পূর্বসূরিগণও এ ধরনের প্রমাণপঞ্জী পেশ করতে কসুর করেন নি, কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেগুলোকে এনালাইসিস ও সুবিন্যস্ত করার যে কৃতিত্ব, সেটা একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য এবং তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

ইবনু সুরাকাহ্

ইবনু সুরাকাহ (মৃত্যু ৪১০ হিঃ—১০১৯ খৃঃ) ই'জায শাস্ত্রের একজন মৌলিক গ্রন্থকার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে তাঁর সেই মূল্যবান গ্রন্থটির কোন সন্ধানই মেলে না। কাশফুজ জুনূনের লেখক হাজী খলীফা (১৬০৮—৭০ খৃঃ) ইবনু সুরাকাহ্‌র গ্রন্থের হাওয়ালা দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, ইবনু সুরাকাহ্ তদীয় গ্রন্থে ই'জায সম্পর্কে এক থেকে নিয়ে প্রায় এক হাজার পয়েন্টের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত এই হাওয়ালার বিশেষ কোন নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারেনি। মুসতাফা সাদিক আর-রাফেয়ীও এর অর্থ সম্বন্ধে বেশ চিন্তা-ভাবনা এবং সাধ্যসাধনা করেছেন, কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি।

আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (মৃত্যু ১৫০৫ খৃঃ) ই'জায সম্পর্কে ইবনু সুরাকাহ্‌র অভিমতকে ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন: ইবনু সুরাকাহ বহু

সুধী সজ্জনের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা কুরআনের বিভিন্নমুখী অলৌকিক প্রকৃতিকে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। ইবনে সুরাকাহ্ বলেন: জগতের জ্ঞানী-গুণীরা ই'জাযের বিভিন্ন দিক আলোচনা-পর্যালোচনা করতে গিয়ে এর বিভিন্ন সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন এবং তারা কুরআনের অলৌকিকতার প্রতিও অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে তৎপ্রতি আলোকপাত করতে আপ্রাণ চেষ্টা নিয়েছেন; তথাপি তাঁরা এই ই'জাযের দশমাংশের একাংশ পর্যন্তও উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাই এর অনন্ত প্রকার প্রণালীর অসংখ্য শাখা-প্রশাখা কোনদিনই শেষ হবার নয়, বরং কালের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন তথ্য ও প্রণালী পরিবেশিত এবং আবিষ্কৃত হতে থাকবে যা পূর্বে যুগে হয়নি।[১]

ই'জাযের প্রশ্নে বিভিন্ন মনীষীর যে সমস্ত অভিমত ও প্রমাণপঞ্জী রয়েছে, ইবনে সুরাকাহ্ তার একটা লম্বা ফিরিস্তি প্রদান করেন। বিশেষ করে কুর-আনের অলংকারশাস্ত্রের প্রশ্ন, এর সাহিত্যরীতি এবং অজ্ঞাত অদৃশ্য তথ্য পরিবেশন—এ সবের প্রতিও তিনি অতি সুন্দর আলোকপাত করেন।

কুরআনের অলৌকিক নেচারের অনুকূলে যে সমস্ত অভিমত পেশ করা হয়েছে সেগুলোর সাথেও ইবনে সুরাকাহ সম্পূর্ণ একমত বলে মনে হচ্ছে। কুরআনের শাব্দিক ই'জায এবং 'সারাফাহ' প্রভৃতি পরস্পরবিরোধী মতবাদকে নিয়েও তিনি কোন বিরূপ সমালোচনা করেন নি।

ইবনে হাযম আল-আন্দালুসী

আবু মুহাম্মদ আলী বিন আহমদ বিন সাঈদ ইবনে হাযম আল আন্দা-লুসীর (জন্ম ৩৮৩ হিজরী—৯৯৪ খৃঃ; মৃত্যু ৪৫৬ হিজরী—১০৬৪ খৃঃ)

১. দেখুন আত্-তানভীর ফী উসুলিত-তাফসীর': পৃষ্ঠা ১৭; আল্লামা সুয়ূতীর 'আল্-ইত-কান ফী উসূলিল কুরআন', ২য় খণ্ড: পৃষ্ঠা ১২৭-২৮ এবং শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ কৃত 'আল-ফাওযুল কাবীর': পৃষ্ঠা ৭২-৭৩।

সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল-ফিসাল ফীল-মিলাল ওয়াল আহওয়ায়ি ওয়ান্ নিহাল' বা ধর্মসমূহ ও সম্প্রদায়গুলোর পরিচয় গ্রন্থ। এখানির অংশমাত্র কায়রোতে বর্তমানে পাঁচ খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে। এ গ্রন্থখানাই ইবনু হাযমকে ধর্মমতবাদ গুলোর তুলনামূলক সমালোচনার প্রথম পথ প্রদর্শকের সম্মান দান করেছে। এতে রয়েছে য়াহূদী, ঈসায়ী, মাজুসী, জেরোয়াস্তার, নক্ষত্রপূজক প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মমতের বিজ্ঞানসম্মত উচ্চাংগের অপূর্ব বিশ্লেষণ। এতে আরও আছে ইসলামের জাহেরী বা আনুষ্ঠানিক ও বাতেনী বা আধ্যাত্মিক রূপের তুলনামূলক সমালোচনা। "ইসলামের চার মযহাবের উৎপত্তির কারণ ও তদ্দ্বারা ধর্মের মাঝে একটা ভাংগন সৃজন এবং মু'তাযিলা, খারিজী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের শিক্ষা ওবৈশিষ্ট্যের বিস্তৃত আলোচনা।" উক্ত গ্রন্থের মাধ্যমে ইবনু হাযম এ কথা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, তাওহীদের ধর্ম ইসলামে বিভিন্ন মযহাব ও মতবাদের উৎপত্তির জন্য ইরানীরাই বহুল পরিমাণে দায়ী এবং তারাই জাতিগতভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলামের বিজয় অভিযানকে অনেকখানি সংযত ও ব্যাহত করেছিল। সুখের বিষয় ইবনু হাযমের এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটিকে উর্দুতে ভাষান্তরিত করেছেন মৌলানা আবদুল্লাহ ইমাদী সাহেব। হায়দরাবাদের উসমানিয়া ইউনিভার্সিটির সৌজন্যে ১৯৪৫ সালে এই উর্দু সংস্করণটি অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

এই অমর গ্রন্থের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়ে ইমাম ইবনু হাযম কুরআনের ই'জায ও তার ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং এই বিষয়-বস্তুর উপর ইতিপূর্বে যে সব অভিমত পোষণ করা হয়েছে, সেগুলোর তিনি একটা সুন্দর সার-সংক্ষেপও দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, পূর্ববর্তী অভিমত-গুলোর উপর তিনি একটা কামিয়াব সমালোচনাও করেন। তার প্রবন্ধের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ দেয়া যেতে পারে।

১. এ প্রসঙ্গে ইমাম আল-আশ'আরীর অভিমত তিনি এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, মু'জিযা শুধুমাত্র আল্লাহ্ পাকেরই আয়ত্তাধীন এবং আমরা সে সম্বন্ধে কতকটা অবহিত হতে পারি একমাত্র তারই মাধ্যমে। ইমাম ইবনু হাযম আন্দালুসী এই অভিমতের প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন: মানুষ যদি ই'জায ও

তার গুণাবলী সম্বন্ধে কিছুমাত্রও অবহিত না হতে পারে, তবে তার সার্থকতাই এমন কি ছিল এবং এই মু'জিযার প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মানুষকে চ্যালেঞ্জই বা কেন দেয়া হয়েছিল ? অবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মু'জিযা এমনই এক বস্তু, শুধুমাত্র যার অংশ বিশেষ মানবের অপরিজ্ঞাত।

২. ইমাম ইবনে হাযম অতঃপর এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেন যে, কুরআনের মু'জিযা কি সকল সময়ের জন্য না শুধু আঁ হযরতের (সঃ) জীবনকাল পর্যন্তই তা সীমাবদ্ধ? কতিপয় মুতাকাল্লিম (Dialectician) এই পরের অভিমতটিকেই পোষণ করেছেন। তাঁরা বলেন যে, কুরআনের রচনায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আরবদের যে চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছিলো, তা শুধু হুযুরে আকরাম (সঃ)-এর জীবদ্দশা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। মনে হয় ব্যক্তিগতভাবে ইবনে হাযম এই মতামত পোষণ করতেন যে, কুরআনের মু'জিযা সকল যুগে, সকল সময়ে, সকল লোকের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য এবং কোনকালেই আরব কিংবা অনারবের দ্বারা কুরআন রচনায় মুকাবিলা সম্ভব হয়নি—হবেও না।

৩. কুরআনের মু'জিযার বিভিন্ন দিক ও অবস্থার একটা লম্বা ফিরিস্তি প্রণয়ন করে তিনি বলেন যে, কতকগুলো লোক ই'জাযকেই কুরআনের স্টাইল বলে মনে করেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, কুরআন যে সমস্ত ভূত-ভবিষ্যতের অজ্ঞাত অদৃশ্য সংবাদ পরিবেশন করে—সেটাই তার অনন্য মু'জিযা। ইবনে হাযমের মতে এই উভয় দিককেই কুরআনের ই'জায বলে মনে করতে হবে।

৪. কুরআনের প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি দু'টো মতবাদের উল্লেখ করেন। একটা হচ্ছে কুরআনের অতুলনীয় সাহিত্যিক অবদান। আর অপরটা হচ্ছে এই যে, ইহা 'সারাফা' মতবাদেরই একটা লাযেমী পরিমাণ। প্রথম মতবাদটির তিনি এভাবে প্রতিবাদ করেন যে, কুরআনের ই'জায সম্পূর্ণভাবে তার সাহিত্যিক মানের উপরই নির্ভরশীল এবং সাহিত্যিক স্তরেই নিহিত

থাকে, তবে মানবীয় শক্তি দ্বারা এর মুকাবিলায় অংশ গ্রহণ করা অসম্ভব হয় না। কুরআনের শুধুমাত্র কতিপয় বিশিষ্ট আয়াত যে এর মু'জিযার প্রতীক—এই মতবাদেরও তিনি স্পষ্ট মুখালিফাত করেন। তিনি বলেন: সমগ্র কুরআন ব্যতিরেকে যদি এর কোন বিশিষ্ট বিশিষ্ট অংশ কাকে মু'জিযা হিসাবে ধরে নেয়া হয়, তবে এর বাকী অংশটুকু কুরআন ও তার বিশিষ্ট গুণাবলী থেকে খারিজ করে নিতে হবে।[১]

মোটকথা, 'আল-ফিসাল ফীল-মিলালি ওয়াল আহওয়াই ওয়ান নিহাল' নামক অমর গ্রন্থখানা ইবনু হাযমের সুগভীর চিন্তাধারা ও সুদূরপ্রসারী জ্ঞান-গরিমার জ্বলন্ত প্রতীক। আল্লামা শিবলী নু'মানী (১৩৩২ হিঃ) বলেন: ইবনু হাযম তাঁর উপরিউক্ত গ্রন্থে গ্রীক দার্শনিকদের বহু মতবাদ ও সিদ্ধান্তের খণ্ডন করে গেছেন।[২]

বস্তুত কল্পনার প্রসারে গভীর রসানুভূতির সূক্ষ্মতায়, দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি ও চিন্তাশক্তির বিশালতায়, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও প্রগাঢ় ধর্মানুভূতিতে ইবনু-হাযমের সমকক্ষ সে যুগে সমগ্র পৃথিবীতে দ্বিতীয় কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ। সমকালীন মুসলিম অনুশীলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় তাঁর সুগভীর জ্ঞানের পরিচয় এ থেকেই পাওয়া যায় যে, তাঁর পুত্র তাঁর লিখিত প্রায় চারশত গ্রন্থের অধিকারী ছিলেন। এসব গ্রন্থের পত্রসংখ্যা ছিল প্রায় আশি হাজার এবং এ সমস্তই ইবনু হাযমের নিজস্ব মৌলিক রচনা। ইয়াকূত রুমী বলেন: "এরূপ অপূর্ব ব্যাপার ইসলামের ইতিহাসে ইবনু জারীর তাবারী (মৃত্যু ৩১০ হিজরী) ছাড়া অন্য কারও দ্বারা সংঘটিত হয় নি।[৩]

---

১. See—Shorter Encyclopaedia of Islam, Leiden, 1953, P. 148.
আরও দেখুন আল্লামা সুয়ূতী কৃত 'আল-ইতকান' ২য় খণ্ড: পৃষ্ঠা ১১৮—১২২।

২. মাকালাতে শিবলী: পৃষ্ঠা ৮৪।

৩. ইয়াকূত রুমী, ৫ম খণ্ড: পৃষ্ঠা ৮৮।

নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, কূপমণ্ডূক পরশ্রীকাতরদের দুশমনীর দরুন তাঁর গ্রন্থমালার অধিকাংশই ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। নিম্নে আমরা তাঁর অমূল্য গ্রন্থাবলীর একটা অসম্পূর্ণ তালিকা সংকলিত করছি।

১. আল-মুহাল্লা (১১ খণ্ডে সমাপ্ত এবং কোন কোন খণ্ডের পৃষ্ঠা ৫ শতেরও অধিক)।

২. আল-ইসাল ইলা ফাহমী কিতাবিল খিসাল (২৪ খণ্ডে সমাপ্ত)।[১]

৩. আল-মুজাল্লা (৮ খণ্ডে পরিসমাপ্ত)।

৪. শারহু আহাদীসিল মুয়াত্তা।

৫. আত তালখীস ওয়াত তাখসীস।

৬. মুনতাকাল ইজমা।

৭. কাশফুল ইলতিবাস।

৮. আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম (৮ খণ্ডে সমাপ্ত)।

৯. মারাতিবুল 'উলূম বা বিদ্যার মান ও পরিচিতি।

১০. সীরাতে নববীয়া বা আঁ হযরতের (সঃ) জীবন কথা।

১১. ইযহার-উ-তাবদীল বা তাওরাত ইনজীলের পরিবর্তনের বিশদ বর্ণনা।

১২. আত-তাকরীব লি-হাদ্দিল মানতিক (ন্যায়শাস্ত্রগ্রন্থ)।

১৩. মুদাওয়াতুন-নুফুস—আধ্যাত্মিক ব্যাধির চিকিৎসা। মিসরের আল্লামা কাসেম আমীন বেকের সম্পাদনায় এক শত পৃষ্ঠায় মুদ্রিত।

১৪. আল-ইমামাহ্ ওয়াস সিয়াসাহ্ বা নেতৃত্ব ও ইসলামী শাসন প্রণালী।

১৫. মাসাইলু উসূলিল ফিকহি—উসূলে ফিক্‌হ সম্পর্কিত কতিপয় সন্দর্ভ।

১৬. আল-আখলাক ওয়াস-সিয়ার বা চরিত্র গঠন ও নীতি শিক্ষা।

১৭. নুকাতুল উরূস (অতি দুর্লভ ও বিস্ময়কর তথ্যে পরিপূর্ণ)।

---

১. ইয়াকুত রূমী; ৫ম খণ্ড ঃ পৃঃ ৯১।

১৮. 'তাওকুল হামামাহ্' বা কপোতির কণ্ঠহার। এই অনবদ্য প্রেমমূলক কাব্যে তিনি নিষ্কাম ইশকে ইলাহীর মহিমা কীর্তন করেছেন। ১৯৫০ পৃষ্ঠায় লীডনে মুদ্রিত হয়েছে।[১]

ইবনু হাযমের এই কাব্যখানি পরমারতির বিচিত্র অভিব্যক্তির বর্ণনার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। দুঃখের বিষয় সেভীলের গোঁড়া আলিম সমাজের হিংসাৎ-সাবৃত্তি ও প্ররোচনার দরুন ইবনু হাযমের গ্রন্থসমূহের পঠন ও পাঠন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হয়; ফকীহ্‌গণের কূপমণ্ডুকতার ফলে আলমোতামিদের তাঁর রচিত বহু অমূল্য গ্রন্থ ছিঁড়ে ফেলা হয় এবং প্রকাশ্যভাবে ভস্মীভূত করা হয়। চোখের সামনে স্বীয় গ্রন্থরাজি দগ্ধীভূত হতে দেখে তিনি সখেদে বলেছিলেন :

وان تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذى

تضمنه القرطاس بل هو فى صدرى —

তোমরা পোড়াও কাগজ শুধু,
অবিনশ্বর আমার বাণী।
কেমন করে পোড়াবে তাদের ?
বুকের মাঝে যাদের স্থান।
যেথায় যাবো, সেথায় যাবে
হবে সেথায় জানাজানি,
মৃত্যুশেষে কবর মাঝে
আমার সাথে হবে শয়ান।
(মুসলিম মনীষা)

আল-খাফাজী

ই'জাযের মতবাদকে কেন্দ্র করে যে পরবর্তী প্রথিতযশা লেখক কলম

১. বিস্তারিতের জন্য দেখুন : যাহবী, ৩য় খণ্ড : পৃষ্ঠা ৩২২—৩২৬; আতহাফুন-নুবালা : পৃষ্ঠা ৩২০; Bibliographic Arabe : P. 85-86

হাতে নিয়েছেন, তিনি হচ্ছেন আলেপ্পোর অধিবাসী ইবনু সিনান আল-খাফাজী (ওফাত ৪৬৬ হিজরী—১০৭৩ খৃঃ)। আল-খাফাজীকৃত সিররুল ফাসহা (The Secret of Eloquence) নামক অনুপম গ্রন্থে ই'জায সম্পর্কে তাঁর মতামতগুলো অতি সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। তিনি এই মত পোষণ করেন যে, অলংকার শাস্ত্রে সম্যক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে না পারলে কারুর পক্ষেই একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক হওয়া সম্ভব নয় এবং নিজেকে সার্থক ও সুন্দররূপে কেউ বিকশিত করতে পারে না।[১]

তিনি একথার প্রতিও জোর গলায় সমর্থন জানিয়েছেন যে, ধর্ম-বিজ্ঞানে পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করতে হ'লে ফাসাহাত শাস্ত্রের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। তিনি আরও বলেন যে, নবুওতে মুহাম্মদীর (সঃ) জ্বলন্ত প্রমাণ নিহিত রয়েছে কুরআনের এই অলংকার শাস্ত্রের মধ্যেই এবং এ প্রসঙ্গে ই'জায মতবাদকে কেন্দ্র করে যে দু'টো মুখ্য অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে, তৎপ্রতি অন্যের শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করতেও তিনি আদৌ কসুর করেন নি।

প্রথম অভিমত হচ্ছে এই যে, কুরআন ফাসাহাত-বালাগাতের এমন এক উচ্চতম শিখায় পদার্পণ করেছে যা তৎপূর্বে মানবের কল্পনারও বহির্ভূত ছিল। তাই এ সত্যকে সম্যক অনুধাবন করার জন্য অলংকার শাস্ত্রে বিপুল পারদর্শিতা ও ব্যুৎপত্তি অর্জনের রয়েছে একটা আশু প্রয়োজন। আর দ্বিতীয় অভিমত হচ্ছে এই যে, কুরআনের চিরন্তন মু'জিযা সাব্যস্ত হয়েছে এই সত্যের উপর ভিত্তি করে যে, আরবরা সারাফা বা প্রতিসরণ হেতু মুকাবিলা করতে অপারগ হয়েছিল। তিনি বলেন যে, মুসায়লামা রচিত জাল-কুরআন এই প্রকৃত কুরআনের ত্রিসীমানায়ও কোনদিন পদার্পণ করতে পারেনি, পারবেও না এবং নিঃসন্দেহরূপে অলংকার শিল্পের দৈন্যই যেন সেই ভণ্ড নবীর জাল কুর-আনের মুখোশ উন্মোচন করেছিল অনেকখানি।

ইতিপূর্বে আল্লামা রুম্মানী লেখার প্রকার-পদ্ধতিকে তিনভাগে বিভক্ত করে-ছিলেন। যেমন: মুতানাফির (Contradictory), মুতালাইম ফী আত্তাবাকাতিল

১. সিররুল ফাসাহা: পৃষ্ঠা ৩—৪।

উস্তা (Harmonions in the intermediate degree), মুতালাইম ফী আত্তাবাকাতিল উলিয়া (Harmoniens in the upper degree)। আল্-খাক্কাজী এই তিন প্রকারের লেখাকে উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্তু পরে তিনি এই বিন্যাস ও বিভক্তিকরণকে অস্বীকার করেন এবং মাত্র দুটো ভাগে তিনি একে বিভক্ত করেন; যথা মুতানাফির বা পরস্পর বিরোধী এবং মুতালাইম বা ঐক্যতান বিশিষ্ট। তিনি বলেন যে, কুরআনের অংশগুলোকে বিভিন্ন ঐক্যতান বিশিষ্ট পর্যায়ে স্থাপন করা যেতে পারে। কিন্তু এ মতবাদের তিনি আদৌ পক্ষপাতী নন যে, কুরআন ঐক্যতান বিশিষ্ট উচ্চতম সোপানে অধিষ্ঠিত আর আরবদের অন্যান্য আলংকারিক সাহিত্যকর্ম মাধ্যমিক পর্যায়ে অবস্থিত। খাক্কাজী তাঁর পুস্তকের মাধ্যমে আল্লামা রুম্মানীর এই প্রমাণকেও অস্বীকার করেছেন যে, অলংকারের উৎকর্ষ দ্বারাই কুরআনের ই'জায সাব্যস্ত হয়ে থাকে। তাঁর মতে ই'জাযের অন্যতম প্রমাণই হচ্ছে 'সারাফা'। এ সম্পর্কে তিনি আরও বলেন: 'গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করলে আমরা অতি সহজেই উপলব্ধি করতে পারি যে, কুরআনের মুকাবিলা থেকে আরবদের প্রতিসংবরণ করা হয়েছিল।" এই 'সারাফা' মতবাদ সম্পর্কে সারীফ মুরতাযাও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেছেন, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

আল্-খাক্কাজী তৎপর রুম্মানীর অভিমতের তাসদীক ও তাবসিরাহ করতে গিয়ে বলেন যে, কুরআন এমন কতকগুলো টারমিনোলজি বা পরে ভাষা দিয়ে গঠিত, যা আধুনিক যুগেও আরবদের কাছে দস্তুরমত সমভাবে ও সর্বতোভাবে প্রজোয্য। রুম্মানীর মতে কুরআনের শব্দসম্ভারের বৈশিষ্ট্যে যে ঐক্য বিরাজ করে—আল্-খাক্কাজী এই অভিমত আদৌ পোষণ করেন না। পবিত্র কুরআনের টারমিনোলজি বা পরিভাষা কোন কোন ক্ষেত্রে যে পরস্পরবিরোধী—এই উক্তির তিনি কতকগুলো উপমাও দিয়েছেন।

আল-খাক্কাজী এ কথার তীব্র প্রতিবাদ জানান যে, কুরআনের সবটুকু অংশ একই পর্যায়ভুক্ত। তাছাড়া কুরআনের এক অংশ অন্য অংশের চাইতে যে অধিকতর বাগ্মিতা ও অলংকারপূর্ণ—এ কথাও তিনি জোরগলায় সমর্থন করেন। অতঃপর তিনি এই উক্তির প্রতিপাদনকল্পে বেশ সুবিজ্ঞের মত

কতকগুলো দৃষ্টান্ত পরিবেশন করতে গিয়ে বলেন: 'যদি এটা গ্রহণযোগ্য হয় যে, মহান আল্লাহ্ বিশেষ কতকগুলো মুখমণ্ডলকে অন্যান্য মুখাবয়ব থেকে অপেক্ষাকৃত সুন্দর, সুষ্ঠু ও উৎকৃষ্টতর করে সৃষ্টি করেছেন, তবে একথা কেন গ্রহণযোগ্য হবে না যে, মহান আল্লাহ্ পাক তাঁর একই কালামে পাককে দু'রকমের সৃষ্টি করেছেন। একটি হচ্ছে অতি আড়ম্বর অলংকার ও বাগ্মিতা-পূর্ণ আর অপরটি তার চাইতে নিকৃষ্টতর।

ইবনু সীনান আল-খাফ্‌ফাজীর মতে কুরআনের অংশবিশেষ এর অলংকার ও উচ্চ পর্যায়ের দিক দিয়ে যে বিভিন্ন ধরনের, একথা আমরা উপলব্ধি করতে পারছি অতি সহজে এবং দ্বিধাহীনচিত্তে। আল-খাফ্‌ফাজী এই স্বীকারোক্তিকে কোনরূপ আপত্তিজনক বলে মনে করেন না। কারণ তিনি একথাও দলীল-দস্তাবেজ সহকারে পেশ করতে চেয়েছেন যে, বাইবেল, ইঞ্জিল প্রভৃতি আল্লাহ্ প্রদত্ত আসমানী কিতাবগুলো তাদের ভাষায় উৎকর্ষতা ও অলংকারের দিক দিয়ে আদৌ মু'জিযার বাহক বা ধারক নয়। কিন্তু তবুও এদের বিশেষ বিশেষ অংশ অপর অংশের চাইতে উৎকৃষ্টতর। অবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, কুরআনের ই'জায প্রধানত 'সারাফা' মতবাদের উপরই নির্ভরশীল। অর্থাৎ তাঁর মতে পবিত্র কুরআনের মুকাবিলা থেকে তদানীন্তন আরবদের বাধা প্রদান করা হয়েছিল। তাঁর মতে মানবীয় শক্তি-সামর্থ্যের দ্বারা কুরআনের আলংকারিক উৎকর্ষতা বা সৌন্দর্যকে অর্জন করা অসম্ভব কিছুই নয়। এদিক দিয়ে আমরা দেখতে পাই যে, আল-খাফ্‌ফাজীর অভিমত এবং পেশকৃত দলিল প্রমাণ ঠিক যেন আল-মুরতাযার অভিমত ও দলীল-প্রমাণের মতই।

শায়খ আল-জুরজানী

আবু বাকর আবদুল কাহির বিন আবদুর রহমান আল-জুরজানী (ওফাত ৪৭৪ হিঃ—১০৭৮ খৃঃ) জোর গলায় এ কথার সমর্থন জানান যে, পবিত্র কুরআনের বাক-রীতি ও রচনাশৈলীই হচ্ছে এর ই'জাযের একমাত্র

প্রতীক। কুরআনের সাহিত্যিক মানকে যথাযথরূপে নির্ণয় করা এবং এর পশ্চাতে যে সুগভীর তাৎপর্য নিহিত রয়েছে, তা লোকচক্ষুর সামনে উদ-ঘাটিত করার জন্য তিনি যথাসাধ্য সাধনা করেছেন। যেহেতু তিনি ছিলেন সে যুগের একজন প্রথিতযশা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, তাই এই প্রশংসনীয় সাধনার জন্য তিনিই ছিলেন অন্যতম যোগ্য পুরুষ। সুধীমহলের প্রায় সবাই একথাও একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, কুরআনের অলংকারকে অবলম্বন করে এই শাস্ত্রের উপর তিনিই সর্বপ্রথম নিয়মতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে অকুণ্ঠ লেখনী চালিয়েছেন। তাঁর অনবদ্য অবদান 'দালাইলুল ই'জায' অতি জোর গলায় একথা প্রতিপন্ন করে যে, পবিত্র কুরআনের অধ্যয়ন থেকেই অলং-কার শাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। শায়খ আল-জুরজানী একটা বিশিষ্ট ধর্মীয় উদ্দেশ্য নিয়ে কুরআনের ই'জাযকে প্রতিপাদন করেই তাঁর অমর পুস্তকটি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এতে আরবী ব্যাকরণ ও অলংকারশাস্ত্রের অনেক-গুলো দফার প্রতি অতি বিস্তৃতভাবে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, অলংকার শাস্ত্রের বিভিন্ন দিকের ব্যবধান সম্পর্কে সম্যক অভি-জ্ঞতা হাসিল না করতে পারলে কুরআনের ই'জাযকে কেউ কোনদিন যথার্থ-ভাবে উপলব্ধি করতে পারবে না। শায়খ আল-জুরজানী এই অলংকার শাস্ত্রকে কেন্দ্র করে আরও একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এর নাম হচ্ছে, 'আসরারুল বালাগা'। তাঁর এই অবদানও পূর্ববর্তী অবদানের চাইতে কোনক্রমেই কম নয়। এতে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী গ্রন্থ দালাইলুল ই'জাযের প্রধান বিষয়বস্তুগুলোকে নিয়েই আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন অতি বিশদ-ভাবে। মুহাম্মদ বিন-ইয়াযিদ আল-ওয়াসেতী (ওফাত ৩০৬ হিঃ—৯১৮ খৃষ্টাব্দ) ই'জাযের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে 'ই'জাযুল কুরআন ফী নাযমিহি ওয়া তালিফিহি' নামক যে পুস্তক প্রণয়ন করেন দুর্ভাগ্যক্রমে তা কালের আবর্তনের সাথে সাথে জগতের বুক থেকে দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায়। কিন্তু এটা আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আজ আমরা সেই হারানো মানিক বা দুষ্প্রাপ্য বইয়ের আভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সম্যক অবহিত। এটা সম্ভব হয়েছে একমাত্র শায়খ আল্-জুরজানীরই বদৌলতে। কারণ তিনি শায়খ ওয়াসেতীর

পূর্বোক্ত বইয়ের দু-দুটো শারাহ লিখেছেন। তন্মধ্যে যে শারাহটি অত্যন্ত বিশদ ও বিস্তারিত, তার নাম হচ্ছে 'আল-মুক্তাযিদ'। বলা বাহুল্য শায়খ আল-জুরজানীর এই অনুপম শারাহদ্বয়ের মাধ্যমেই আমরা শায়খ ওয়াসেতীর বইয়ের সূচীপত্র ও বিষয়বস্তু (Contents) এবং তাঁর ই'জাযে সম্বন্ধীয় পুঙ্খানুপুঙ্খ মতামত সম্পর্কে সম্যক অবহিত হতে পারি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, শায়খ আল-জুরজানী এতগুলো লিখার পরও এগুলোকে যথেষ্ট মনে করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারেন নি। তাই এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত এবং আরও ব্যাপক আলোচনার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে তিনি ইল্‌মে বায়ানকে কেন্দ্র করে 'আস্‌রারুল বালাগা' এবং 'ইলমে মাআগনী' সম্বন্ধে 'দালাইলুল ই'জায' নামক অনবদ্য পুস্তকদ্বয়ের অবতারণা করেন। সত্য বলতে কি, এ দুটো তাঁর নশ্বর জীবনে অমরতার জ্বলন্ত স্বাক্ষর।

এতেও সন্তুষ্ট না হতে পেরে তিনি 'ই'জাযুল কুরআন' নামক আরো একটি বই লিখেন।

তাঁর এই পুস্তকগুলো পাক-ভারত উপমহাদেশে এবং মিসর থেকে বহুবার মুদ্রিত হয়েছে। এই অমর অবদানসমূহের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের অলংকার ও বাকধারার আধ্যাত্মিক গুণাবলী এবং যে ধারাকে অবলম্বন ও যে উপায়কে উদ্ভাবন করে কুরআনের অব্যর্থ বাণী ও অমোঘ উদাত্ত পয়গাম প্রেরণ করা হয়েছে—তৎপ্রতিও বিশেষভাবে সবার শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন শায়খ আল-জুরজানী।

তাঁর 'দালাইলুল ই'জায' মিসর থেকে প্রকাশিত সংস্করণটি আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুহু (ওফাত ১৯০৫ খৃঃ) ও আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ মাহমুদ শান্‌কিতির তত্ত্বাবধানে ফতুহে আদাবিয়া প্রেস থেকে ১৩৩১ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মুদ্রিত হয়েছে। 'আস্‌রারুল বালাগা' নামক তাঁর অপর অবদানটি ১৩২০ সালে মিসরের তারাক্কী প্রেসে মুদ্রিত হয়েছিলো।

ই'জায ও অলংকার শাস্ত্র ছাড়া শায়খ আল-জুরজানী আরও বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। যেমন—

১. 'মিআতুল আমিল' (আরবী ব্যাকরণ সম্পর্কে আরবী ভাষায় চমৎকার বই)।

২. 'কিতাবুল জুমাল' (ফারসী ভাষায় লিখিত)।

৩. 'তালখীস' (উপরিউক্ত কিতাবের শরাহ) 'ইযাহ' নামক পুস্তকের তিনি দুটো 'শরাহ' লিখেছেন। একটির নাম—

(ক) 'আল মুগনী' (তিন খন্ডে সমাপ্ত) অপরটির নাম (খ) 'আল-মুকতাসিদ' (এটি সংক্ষিপ্ত শরাহ তবুও তিন খন্ডে সমাপ্ত)। আরবী ব্যাকরণ সম্পর্কে তাঁর লিখিত 'মিআতুল আমিল' নামক পুস্তকটি এত সুন্দর ও সার্থক যে, এর শরাহ বা বিশদ ব্যাখ্যা লিখতে অনেকেই প্রচেষ্টা নিয়েছেন। এমন কি ইংরেজ লেখকরাও এর English edition with exhaustive লিখেছেন। ১৮০৩ খৃীস্টাব্দে কলকাতা থেকে Baillie; ১৮১৪ খৃীস্টাব্দে Lockett এবং ১৮১৭ খৃীস্টাব্দে লেইডেন থেকে সম্পাদনা করেছেন Expenius.১

ই'জায শাস্ত্র সম্পর্কে শায়খ আল্-জুরজানীর মতামতের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ দেওয়া যেতে পারে:

১। কুরআনের ই'জায সম্পূর্ণরূপে যে এর সাহিত্যিক মানের (literary aspect) ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অথবা এর পরিভাষার সাধারণ বা মামুলী সাহিত্যিক গুণাগুণের উপর নির্ভরশীল. তা ঠিক বলা চলে না। অতএব, কুরআনের শব্দসমূহের ই'জায শুধুমাত্র এর সাধারণ অর্থের মাঝেই নিহিত নয়; বরং তা নিহিত রয়েছে এর শব্দের মাধ্যমে বর্ণিত মনোরম চিত্রে, এর সুগভীর গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যে এবং এর সুষমামণ্ডিত কাব্যিক গতিছন্দে। নিখিল বিশ্বব্যাপী একমাত্র কুরআনই এমন এক স্বর্গীয় গ্রন্থ, যা অনন্য ও

১. দেখুন তারীখে ইয়াফেয়ী, মিরাতুল জিনান এবং Encyclopaedia of Britanica, Vol. 13, P, 206.

অনুকরণীয়। এর মু'জিযাও তাই অতুলনীয়। শায়খ আল্-জুরজানী এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন এতো বিস্তৃত ও বিশদভাবে যে, তার সম্পর্কে সমালোচনা করা হয়েছে—তিনি নাকি কুরআনের অপূর্ব সুরলহরী ও ধ্বনিতত্ত্ব বা বাকরীতি ও শাব্দিক সৌন্দর্যের প্রতি কতকটা অবহেলা প্রদর্শন করেছেন। সম্ভবত এ পন্থাকে অবলম্বন করে তিনি তাঁর ঐ সমস্ত সমালোচকদের জবাব দিয়েছেন যারা শুধুমাত্র কুরআনের শাব্দিক ও বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রতিই গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন।

২। শায়খ আবদুল কাহির জুরজানী বলেন: নবী মুস্তফা (সঃ) আরবদের চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন একাধিকবার এবং আরবরাও এই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক চ্যালেঞ্জের উদ্দেশ্যকে সম্যক উপলব্ধি করা সত্ত্বেও কোনদিন এ দুর্গম ময়দানে অবতরণ করার সৎসাহস করেন নি।......

৩। কুরআনের ই'জায শুধু যে বিশেষ বিশেষ শব্দের অর্থের মধ্যে নিহিত রয়েছে তা নয়, এর সমুদয় শব্দের সমাবেশ এবং সমষ্টিগত ভাব ও তাৎপর্যের মাঝেই নিহিত রয়েছে এই ই'জায বা অলৌকিকতা। সুতরাং কুরআনের একটা পৃথক শব্দকে নিয়ে অন্যান্য সাহিত্যের যে কোন শব্দের সাথে এই তুলনা বা পবিত্র কুরআনের কোন একটা বিশেষ আলাদা শব্দকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাও সমীচীন হবে না এবং তদ্দ্বারা তাঁর অলৌকিকতাকে অনুধাবন করাও সম্ভবপর হবে না। এজন্যই মুসায়লামা কায্যাব কৃত কুরআন তুলনার জন্য কোনদিনই ব্যবহৃত হয় না।

৪। কুরআনেই ই'জায-এর ছন্দ ও ছেদ চিহ্নের মধ্যে যে সীমাবদ্ধ রয়েছে তাও নয়, কারণ কবিতার ছন্দের ন্যায় এ তো আর তেমন কোন কঠিন কাজ নয়। এই ছন্দ প্রকরণ ও ছেদ চিহ্নের সাথে খাপ খাইয়ে আরবদের মাঝেও কেউ কেউ কুরআনের ন্যায় সাহিত্যকর্ম সৃষ্টির চেষ্টা নিয়েছিল। সম্ভবত তিনি এতদ্দ্বারা আল্ মাআররীর (ওফাত ১০৫৭ খৃঃ) প্রতিই ইংগিত করতে চেয়েছেন।[১]

১. দালাইলুল ই'জায: পৃষ্ঠা ২৯৭ (২)।

৫। শায়খ আল-জুরজানী এ প্রসঙ্গে আল্-জাহিযের মতামতের কথাও উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন: আরবরা এই সত্যকে সর্বতোভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলো যে, কুরআন একটা শাশ্বত মু'জিযা। এজন্যই তারা এর মুকাবিলাকে সম্পূর্ণ অসম্ভব বলে স্বীকৃতি দান করেছিলো। আল-জুরজানী আরও বলেন: আরবরা একথা মনে করে না যে, কুরআনের ই'জায শুধুমাত্র এর ছেদ চিহ্ন বা ছন্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে, বরং তৎসংলগ্ন আরও অনেক কিছুর মাঝেও নিহিত রয়েছে কুরআনের চিরন্তন মু'জিযা (দালাইলুল ই'জায, পৃষ্ঠা ২৯৮)। এভাবে যখন তারা কুরআনের আয়াত বিশেষের অর্থের প্রতি চিন্তা করলো তখন তাদের ঈমান আরও মজবুত হলো এবং পরিভাষার পরিবর্তে এর সুগভীর তাৎপর্যের দ্বারা তারা বহুল পরিমাণে প্রভাবান্বিত হলো। কুরআন মজীদের এই বিশিষ্ট আয়াতটি হচ্ছে এই:

"এবং (হে সুধীবৃন্দ) তোমাদের জন্য শাস্তির মধ্যে রয়েছে (এক সুন্দর) জীবন, যেন তোমরা পরস্পরকে পরস্পরের হাত থেকে রক্ষা করতে পারো।"
(সূরা আলে-ইমরান: ১৭৯ আয়াত)

৬। যাঁরা 'সারাফা' মতবাদকে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন এবং তা মনে-প্রাণে বিশ্বাসও করেছেন, শায়খ আল্-জুরজানী তাঁদের অতি তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। (দালাইলুল ই'জায: পৃষ্ঠা ২৯৯)

৭। কুরআনের ই'জায শুধু যে এর আলংকারিক গুণাবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয় এবং কুরআনে ব্যবহৃত যে সব বিশেষ বিশেষ পরিভাষাকে পৃথকভাবে গ্রহণ করা হয় সেগুলো প্রকৃতপক্ষে কোন পৃথক বৈশিষ্ট্যের প্রতীক নয়। আল-জুরজানী এদিক দিয়ে আল-বাকিল্লানীর অভিমতেরই ধারক বলে মনে হয়।

৮। ই'জায সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শায়খ আল-জুরজানী তাঁর পূর্ববর্তী বহু মনীষীর অভিমতেরও খণ্ডন করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, কুরআনের ই'জায কোন অপরিচিত শ্রুতিকটু শব্দ অথবা একেবারেই কোন সরল সোজা ও অনাড়ম্বর শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।[১]

১. দালাইলুল ই'জায: পৃষ্ঠা ৩—৪।

তিনি আরও বলেন ঃ "পবিত্র' কুরআনে অলংকারের অনুপমত্বই হচ্ছে নবী মুস্তফা (সঃ)-এর অমর মু'জিযা। এটাও সত্য যে, নবী (সঃ)-এর মু'জিযা অতি সঙ্গতভাবেই এমন ধরনের হওয়া চাই, যা আপামর সকলেই অনুধাবন করতে পারে অতি সহজে এবং যার প্রতিক্রিয়া গভীরভাবে দাগ আঁকিতে পারে সবারই মনের কোণে। বানদার আল-ফারেসী প্রমুখ মনীষী ই'জায শাস্ত্রের দলীল-দস্তাবিজ এভাবে পেশ করতে প্রয়াস পেয়েছেন যে, যেহেতু ইহা আল্লাহ্‌র পাক কালাম, তাই ইহা মু'জিযা। কিন্তু শায়খ আল-জুরজানী তাঁর দালাইলুল ই'জাযে এই দলীল প্রমাণের খণ্ডন এবং তা অস্বীকার করেছেন। (দালাইলুল ই'জায ঃ পৃষ্ঠা ৩৬৫— ৮১)

১। অবশ্য তিনি একথাও ইনকার করেন না যে, শব্দের সরলতা এবং উচ্চারণের আরাম-আয়েশময় ভঙ্গিও একটা অনুপম সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথা স্পষ্টতই অস্বীকার করেন যে, পবিত্র কুর-আন প্রধানত এই উক্ত বিষয়বস্তুর উপরেই প্রতিষ্ঠিত। শায়খ আল-জুর-জানী একথার প্রতিও পূর্ণ সমর্থন যোগান যে, কুরআনের আলংকারিক সৌন্দর্য আর সুগভীর তাৎপর্যপূর্ণ অর্থকে সম্যক অনুধাবন করতে হলে আরবদের সাহিত্যকর্ম ও সাহিত্যিক প্রতিভা সম্পর্কে অগাধ জ্ঞানের অধি-কারী হওয়া আবশ্যক। (দেখুন ঃ দালাইলুল ই'জায, পৃষ্ঠা ৪০১— ৪)

প্রখ্যাতনামা মনীষীবৃন্দের প্রায় সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, শায়খ আবদুল কাহির তাঁর 'দালাইলুল ই'জায' ও 'আসরারুল বালাগা' নামক অমর গ্রন্থদ্বয়ের মাধ্যমে পরবর্তী লেখকদের লেখনীর ধারাকে এ বিষয়বস্তুর দিকে বহুল পরিমাণে আকৃষ্ট করে তুলেছেন। তাঁর এই বিদ্বানসুলভ অভি-মতের প্রতি প্রায় সকল জ্ঞানী ব্যক্তিই যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেছেন। কুরআনের ই'জাযকে কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে অনুভব করা চলে না বা কোন নির্ভুল নিয়মতান্ত্রিক শেকেল-সুরতেও পেশ করা যেতে পারে না; এবং এর মূল্যকে উপলব্ধি করার জন্য যে উপযুক্ত সাহিত্যিক ও আলং-কারিক অভিরুচির প্রয়োজন—শায়খ আবদুল কাহির জুরজানীর পেশকৃত এই অভিমত কিন্তু অনেকেরই সাহিত্যকর্মের ভিতর দিয়ে বাস্তবে রূপায়িত

হতে পারেনি; আর অনেকেই তা মেনে নিতেও পারেনি। তাই পূর্ববর্তী মনীষীদের অনমনীয় রক্ষণশীলতা ও কাঠিন্যই যেন ই'জাযের এই চিন্তাধারাকে অনেকটা ব্যাহত ও অধোগামী করে রেখেছিল। শুরু থেকেই পবিত্র কুরআন সম্পর্কে যারা ছিলো পূর্ণ আস্থাবান, তাদেরকে এটা সাহায্য করেছিল; আর যারা কুরআনের প্রতি ছিল অবিশ্বাসী, তাদের হৃদয়ের গোপন কন্দরে এতটুকুও দাগ কাটতে পারেনি। অবশ্য পবিত্র কুরআনের সাথে মানুষের পূর্ণ সহযোগিতা ও সহানুভূতি না থাকলে ই'জাযুল কুরআনের এই দিকটা ঠিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয় না। অমুসলিম বা ইসলামের প্রবল শত্রুদের মাঝে এই সহানুভূতি ও সহযোগিতার একান্ত অভাব থাকার কারণ হয়তো এই হতে পারে যে, তাদের ধর্মীয় গ্রন্থের দৃষ্টান্তগুলো কুরআনের ই'জাযের মতো এত শুষ্ক নয়, বরং বোধগম্যের দিক দিয়ে অনেক পরিমাণে সহজ ও সরস। গুণাগুণ ও সৌন্দর্য বিচারের এই যে একটা অনুপম অভিরুচি—এতে সকলেই নির্দিষ্ট ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারে না। তাই এই গুণাগুণ বিচারের পরও এর ফয়সালা বা স্থিরসিদ্ধান্ত এতদূর দুরূহ হয়ে পড়ে যে, এই ফয়সালা সবার পক্ষ থেকে এক ধরনের হয় না। তাছাড়া পার্থক্য অনেক সময় প্রকট হয়ে দেখা দেয় স্থান-কাল-পাত্রভেদে। এজন্য বোধ করি কুরআনের ই'জায সম্পর্কে শায়খ আল-জুরজানীর অভিমত বিশেষ কোন স্থির সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয় না। কিন্তু একথা সত্যি যে, এ সম্পর্কে তাঁর সব অভিমতই মৌলিক। তিনি সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন যে, কুরআনের ই'জায শুধুমাত্র এর শব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং তা নিহিত রয়েছে এর সুগভীর তাৎপর্যের ভিতরেও। অলংকার শাস্ত্রের উপর তাঁর এই অমূল্য আলোচনা পবিত্র কুরআনের অন্তর্নিহিত ভাবধারাকে অনুধাবন করার জন্য অত্যন্ত সহায়ক বলে মনে হয়। কুরআনের অলংকার বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত আধুনিক বইপত্রের উদ্ভব হয়েছে, তন্মধ্যে শায়খ আবদুল কাহিরের সাহিত্যকর্মকে মূল উৎস হিসেবে ধরা হয়ে থাকে।

শায়খ আবদুল কাহির জুরজানী ছিলেন শাফেয়ী মতাবলম্বী এবং ইমাম আবুল হাসান আল্-আশ্'আরীর একজন ভক্ত ও অনুরক্ত অনুসারী।

আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনুল ফারসীর কাছে তিনি শিক্ষা নিয়েছিলেন। কথিত আছে যে, তাঁর ওস্তাদদের হালকা ততটা প্রশস্ত ছিল না। কারণ তিনি নাকি ইলম হাসিল করার জন্য জুরজান নগরের গণ্ডি পেরিয়ে কোনদিন বাইরে পা বাড়ান নি। আলী বিন আবী যায়দ আযীমি ছিলেন তাঁর অতি প্রিয় শাগরিদ। ইয়াকুত হামুভী (ওফাত ৬১৬ হিঃ—১২২৯ খৃষ্টাব্দ) তাঁর 'মুজামুল বুলদান' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে বলেন: এই 'জুর-জান' নগরীর নামটা নাকি আরবী নয়, একে আরবী বানিয়ে নেয়া হয়েছে। আসলে এটা ছিলো গুরগাঞ্জ[১]। এটা জাইহুন নদীর তীরে অবস্থিত। 'তাফসীর জুরজানী' নামে শায়খ আবদুল কাহিরের একটা 'তাফসীর' এবং 'তাফসীরে ফাতিহা' নামে একটা পৃথক তাফসীর রয়েছে। এতেও ই'জায সম্পর্কে তাঁর মতামত পাওয়া যেতে পারে। এই তো গেলো পঞ্চম শতাব্দী হিজরীর কথা।

হিজরী ছয় শতকে ই'জায শাস্ত্র

এবার আমরা নেমে আসছি ষষ্ঠ শতাব্দীতে। এই শতাব্দীতে এসে সর্বপ্রথম আমাদের মনে পড়ে ইমাম গাযযালী ও কাযী আইয়ায নামের দু'জন স্বনামধন্য মুতাকাল্লিমের কথা। এদের প্রথমোক্ত লেখক ছিলেন একজন প্রথিতযশা দার্শনিক আর দ্বিতীয়জন ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ সীরাত

১. এই গুরগাঞ্জ বা জুরজান নগর বহু স্বনামধন্য মনীষীকে তার উর্বর মাটিতে জন্ম দিয়েছে। তন্মধ্যে সাইয়েদুস সাদাদ আবুল হাসান মীর সাইয়েদ শরীফ জুরজানী অন্যতম। তাঁর জন্ম হয়েছিলো ৭৪০ হিজরীর শাবান মাসে। তাঁর বিদ্যাবত্তা ও মেধাশক্তির সর্বতোমুখী প্রতিভার কথা ছাত্রজীবন থেকেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ই'জায শাস্ত্র সম্পর্কে যদিও তিনি লেখনী হাতে নেন নি, তবুও নামের সুসংগতি দেখে আমরা এখানে তাঁর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করলাম মাত্র। তাঁর লিখিত বইয়ের মধ্যে নাহাভমীর, শারাফমীর, শারীফিয়াহ, হিকমাতুল আইন, হাশিয়া

নেগার। আল্লামা যামাখশারী ও ইবনু আতিয়াহ গারনাতী নামক আরও দু'জন ক্ষণজন্মা মুফাসসির এ যুগে জন্ম নিয়েছিলেন। ছ'রা সবাই ই'জায শাস্ত্রের সুবিস্তৃত ময়দানে অবতরণ করে অবিশ্রান্ত গতিতে চালিয়ে গেছেন তাঁদের ক্ষুরধার লেখনী। এই সঙ্গে ইবনে রুশদের কথাও আমাদের মনে পড়ে, যিনি গ্রীক দর্শন ও ইসলামের ধর্মীয় নীতির মধ্যে একটা ঐক্য ও সামঞ্জস্য আনয়ন করার চেষ্টা করেছিলেন। এক্ষণে আমরা এদের সবার সম্বন্ধে পৃথকভাবে কিছুটা আলোচনা করতে চাই। এই শতকে উক্ত বিষয়বস্তুকে নিয়ে সর্বপ্রথম কলম ধরেছেন শায়খ হাসান বিন ফাতাহ বিন হামযা হামাদানী (ওফাত ৫০১ হিঃ)। তাঁর লিখিত বইয়ের নাম 'আল্-বাদী ওয়াল বায়ান'।

আল-গাযযালী

আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন আহমদ আল-গাযযালী (ওফাত ৫০৫ হিঃ—১১১১ খৃীঃ)-এর এ সম্পর্কে অভিমত হচ্ছে এই যে, পবিত্র কুরআনের একটা অনন্য ও একক লক্ষ্য রয়েছে। সেটা হচ্ছে এই যে, পাক কুরআন মানুষকে সব সময় প্রেরণা যোগায় তার সৃষ্টিকর্তার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করার জন্য, আর অনুপ্রেরণা দান করে এই জড় জগতের প্রতিটি বস্তুর উপর আধ্যাত্মিক ও পরজগতের প্রাধান্য দেওয়ার জন্য।[১]

ইমাম গাযযালীর মতে কুরআন করীমে রয়েছে সমস্ত জ্ঞানেরই অপূর্ব সমাবেশ। সে জ্ঞান আধ্যাত্মিক জগতেরই হোক আর জড় জগতেরই হোক।

মুতাউয়াল, হাশিয়াই তালখীস, হাশিয়া হিদায়া, হাশিয়া বায়যাভী, শারাহ মিফতাহ, শারাহ চাগমানী, শারাহ ইশারাত, হাশিয়া মিশকাত শরীফ ইত্যাদি সমধিক প্রসিদ্ধ। শিরাজ নগরীতে ৮৩৮ হিজরীতে তিনি পরলোকগমন করেন। অলংকারশাস্ত্রের বইগুলোর তিনি হাশিয়া (Foot-note) লিখেছেন।

১. আল্ ইত্কান সুয়ূতী : ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৮।

কিন্তু একটি কথা এই যে, এ জ্ঞান এত সূক্ষ্মভাবে লুক্কায়িত রয়েছে যে, অতি গুপ্তধনকে আবিষ্কার করার একান্ত অভিজ্ঞতা না থাকলে একে খুঁজে বের করা মুশকিল। বস্তুত এটাকেই তিনি ই'জায শাস্ত্রের একটা অঙ্গ হিসেবে শুমার করেছেন এবং একেই পবিত্র কুরআনের মহৎ গুণের দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মিসরের প্রখ্যাত মনীষী আমীন আল খাওলী বলেনঃ ইমাম গাযযালীর মতে পবিত্র কুরআন সমস্ত আধ্যাত্মিক ও দৈহিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস। তিনি আরও বলেন যে, ইমাম গাযযালী এদিক দিয়ে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ও বিস্তৃত আলোচনার পরিচয় দিয়েছেন।[১]

ইমাম গাযযালী বলেনঃ "মানুষের যত দ্বন্দ্বমূলক সমস্যা, যত ঘটনা-প্রবাহ এবং মতবাদ রয়েছে, কুরআনে রয়েছে সে সবের পুঙ্খানুপুঙ্খ খবরা-খবর এবং নিদর্শন। সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাথমিক সূত্রটি খুঁজে পাওয়া যায় এই কুরআন পাকের মধ্যে। কারণ সে সবগুলোই নিঃসরিত হয়েছে একই উৎসমুখ থেকে। সে উৎসমুখ হচ্ছে- সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের অতল-গভীর জ্ঞান সিন্ধু।" তিনি আরও বলেন যে, কুরআন ও হাদীসের একজন বিশেষজ্ঞকে যদি কুরআনের আয়াতে কারীমাসমূহের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তারিত তালিকা দিতে বলা হয়, তবে এটা তাঁর জন্য নিঃসন্দেহে একটা দুরূহ ব্যাপার (uphill task) হয়ে দাঁড়াবে।

ইমাম গাযযালী তাঁর অমর গ্রন্থ 'ইয়াহ্ইয়াউল-উলূম'-এ লিখেছেনঃ আল্লাহ্‌র প্রতিটি সৃষ্টিই শিল্পে ভরা। কথন শিল্প তাঁর এক মহৎ গুণ। এ গুণ যেন তার অস্তিত্বের সাথে মিশে রয়েছে। চক্ষুর যেখানে কোন অনুপ্রবেশ নেই, কর্ণের যেখানে প্রবেশাধিকার নেই, কথন শক্তির সেখানেও রয়েছে অবাধ অবারিত গতি। বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই এই শক্তির অনন্ত প্রভাবে আনন্দের গিরিগাত্রে আরোহণ করতে পারে, আবার ভাবাবেগে শোক-সাগরেও ভাসতে পারে। আমাদের জিহ্বার উপর যা উদয় হয়, তা অক্ষর মাত্র। 'আগুন' শব্দটি আমরা অতি সহজেই মুখে উচ্চারণ করতে পারি। কিন্তু তার দহন শক্তিকে আমাদের রসনা কোনদিন অনুভব করতে পারে

১. ইয়াহ্ইয়াউল উলূমঃ ৪র্থ পরিচ্ছেদ; পৃঃ ২৫০—২৬৪।

কি? পবিত্র কুরআনের শব্দসম্ভার ঠিক তদ্রূপ, সবাই মুখে উচ্চারণ করতে পারে, কিন্তু সেগুলোর প্রকৃত তাৎপর্য ও অর্থপ্রকাশক দ্রব্য প্রকাশ পেলে শুধু সপ্তভূতল কেন, সপ্তগগনও তার তেজ ধারণ করতে সক্ষম নয়। আল্লাহ্ পাক তাই ফরমিয়েছেন: "হে রসূল! আমি যদি এই পবিত্র কুরআনকে পর্বতগাত্রে অবতারিত করতাম, তাহলে নিশ্চয় তুমি দেখতে পেতে যে, সে পাহাড় আল্লাহ্‌র ভয়ে ভেঙ্গে গেছে, বিক্ষিপ্ত ও অবনমিত হয়ে।

(সূরা হাশর, ২১ আয়াত)

যুগ প্রবর্তক মনীষী ইমাম গাযযালী বলেছেন যে, একজন মানুষের কথার মধ্যে বৈপরীত্য, ত্রুটি-বিচ্যুতি কিংবা পুনরাবৃত্তি ঘটা একান্ত স্বাভাবিক ও সম্ভবপর। আর তার কারণও সুস্পষ্ট। বিভিন্ন লোকের অবস্থা ও লক্ষ্য বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এই বিশ্ব জাহানে সকল লোকের ঝোঁক, লক্ষ্য ও দৃষ্টি একই বিশিষ্ট দিকে কোন দিনই নিবদ্ধ হয় না। তাই অতি স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয় অসংলগ্নতা। বিশেষত যখন এই ক্রমধারা ও পারম্পর্য বহু দিন ধরে প্রচলিত থাকে, তখন এ ধরনের ইখতিলাফ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি একান্ত সন্দেহাতীত ব্যাপার হয়ে পড়ে। তাই আল্লাহ্ পাক স্বয়ং এই মৌলিক বিষয়টা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন:

"কাফিরদের কি হয়েছে, তারা কি এটুকুও চিন্তা করে তলিয়ে দেখে না যে, কুরআন মজীদ যদি আল্লাহ্ ছাড়া কোন মানব রচিত গ্রন্থ হতো তবে তারা এর মাঝে সহস্র বৈপরীত্য ও অসংলগ্নতা দেখতে পেতো।"

ইমাম গাযযালীর কাছে উক্ত আয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তদুত্তরে তিনি বলেন: 'ইখতিলাফ' শব্দটির অর্থ এ নয় যে, কাফিরগণ পবিত্র কুরআন সম্পর্কে কোন দ্বি-মত পোষণ করে না; বরং এর প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, স্বয়ং আল্-কুরআনে হাকীমের মাঝে কোন পরস্পর বিরোধিতা বা অসংলগ্নতা মওজুদ নেই।"

ইমাম গাযযালী বলেন: মুসলমানদের উপর আল্-কুরআনের দু'টো দাবী আছে। একটি বাহ্যিক, অপরটি আভ্যন্তরীণ। প্রথমটি কুরআনের

তিলাওয়াত করা। আর দ্বিতীয়টি কুরআন মজীদের জ্ঞান সমুদ্র মন্থন করা এবং তা' জীবনের প্রতিটি স্তরে কার্যে রূপ দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করা। আল্ কুরআন সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান লাভের জন্য কুরআনী শিক্ষার পূর্ণতা লাভ করা এবং এর প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্য স্থিরচিত্তে চিন্তা গবেষণা করা দরকার। বরং কুরআনে হাকীমেও এ ধরনের চিন্তা-গবেষণাকারী পাঠককে প্রকৃত মুসলমান নামে অভিহিত করে প্রশংসা করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন্ মাসউদ (রাঃ) বলেছেন: যদি বিদ্যা চাও তবে কুরআনের প্রতি চিন্তা-গবেষণা কর; কারণ এতে রয়েছে আদি অনন্ত কালের তথ্য অনাগত দিনের সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান ও বিদ্যা-বুদ্ধি।[১]

ইমাম গায্যালীর অমর অবদান 'ইয়াহ্ইয়াউল উলুম'-এ তাওরাতে বর্ণিত আল্লাহ্ পাকের একটি বাণীর নিম্নরূপ উল্লেখ রয়েছে:

"হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের কোন প্রবাসী বন্ধুর পত্র এলে তাতে গভীর দৃষ্টি দিতে স্তব্ধ গতিতে পুনঃ পুনঃ পাঠ কর; প্রতিটি পংক্তি ও অক্ষরের মর্মানুধাবনে সচেষ্ট হও; নিজে নিরক্ষর হলেও অপরের দ্বারা মর্ম উদ্ধারের চেষ্টা কর। ঠিক তেমনি তোমাদের কাছে আমার কালাম প্রেরিত হয়েছে। উচিত ছিল, এর প্রতিটি বাক্য ও শব্দের প্রতি অতি গভীরভাবে মনোসংযোগ করা। কিন্তু এর প্রতি তোমরা সীমাহীন তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করছো।......হে আমার বান্দা! বন্ধু-বান্ধবের সাথে যখন বাক্যালাপে মগ্ন হও, তখন এক ধ্যানে একমনে ধীর-স্থিরচিত্তে তা শ্রবণ কর। এমনকি এই আলাপরত অবস্থায় অন্য কেউ এসে হাযির হলে তাকে প্রতিসরণের ইশারা কর। কিন্তু আমার পবিত্র কালামের মাধ্যমে তোমাদের সাথে আলাপ করতে চাইলে এত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য আর এত অবজ্ঞা কেন? তবে কি আমি তোমাদের বন্ধু-বান্ধবের চাইতেও নিকৃষ্ট? (ইয়াহ্ইয়াউল উলুম)

---

১. ইয়াহ্ইয়াউল উলুমুদ্দীন: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২।

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী বলেন ঃ

কুরআনের গুরুত্ব, মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য শব্দরূপ আচ্ছাদনে অতি গুপ্তভাবে ঢেকে রাখা হয়েছে। এইজন্যই আমাদের জিহবা এহেন আবৃত কুরআনকে ধারণ করতে সক্ষম হয়। আবার শব্দরূপ আবরণ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার কুরআনের গৌরব ও সৌন্দর্য মানব হৃদয়ে প্রবেশ করিয়ে দেবার উপায়ান্তর নেই। এ থেকে আর একটি বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় যে, শুধু শব্দার্থ ব্যতীতও কুরআনের আর একটি প্রভাব ও ক্রিয়া রয়েছে।

পশু-প্রাণীদেরকে আমরা সাধারণত আমাদের নিজস্ব কাজের জন্য ব্যবহার করে থাকি। আবার আমরা তাদের ভূমি কর্ষণের কাজেও লাগাই। সে জমিগুলোই যে একদিন বৃষ্টি ও রৌদের সাহায্য নিয়ে সোনার ফসল ফলাবে তা পশুরা ঘুণাক্ষরেও টের পায় না। তাই পবিত্র কুরআনের যারা শুধুমাত্র শব্দ ও অক্ষর দ্বারা বিচার করে, তারা ভুল করে।

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী ৫৫ বছর বয়স পেয়েছিলেন। তন্মধ্যে ১০ বা ১১ বছর শুধু দেশ ভ্রমণেই অতিবাহিত করেছেন তিনি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, এতগুলো গুরুদায়িত্বের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেও এই অল্পকাল অর্থাৎ মাত্র ২৪ বা ২৫ বছরের মধ্যেই তিনি ৪০০ খানা কিতাব রচনা করেছেন। সেগুলো ফিকাহ, ইলমে কালাম, বিজ্ঞান, আধ্যাত্মিক, মনস্তত্ত্ব, স্বভাব-বিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ। তাওরাত ও ইন্‌জিল সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল অত্যন্ত গভীর। এই তাওরাত ইন্‌জিলের যে বিকৃতি ও আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা এ কথার প্রতিপাদনকল্পে তাঁর লিখিত গ্রন্থটি আজও কনস্টান্টিনোপল লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রয়েছে। পবিত্র কুরআনেরও দুটো বিরাট তাফসীর গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন তিনি।

১. ইয়াকুত্ আত্-তাভীল।

২. তাফসীর জওয়াহিরুল কুরআন।

প্রথমোক্ত তাফসীরটি ৪০ খণ্ডে সমাপ্ত। ই'জায শাস্ত্র সম্পর্কেও তিনি এতে আলোচনা করেছেন।

তিনি গ্রীক দর্শন সম্বন্ধে 'মাকাসিদুল ফালাসিফাহ্' নামক যে পুস্তকটি রচনা করেন, তা' এখন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে দুষ্প্রাপ্য অথচ স্পেনের শাহী লাইব্রেরীতে এক কপি সুরক্ষিত আছে। অনুরূপভাবে 'তাহাফুতুল ফালাসিফা' (Disintegration of Philosophers) নামক তাঁর একান্ত যুক্তিপূর্ণ পুস্তকটি ইসলাম জগতে আদর না পেলেও ইউরোপে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। এটি ইব্রানী ভাষায় অনূদিত হয়ে ফ্রান্সের রাজকীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রয়েছে এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতদের চক্ষু ঝলসিয়ে দিয়েছে। পক্ষান্তরে ইমাম সাহেবের অমর গ্রন্থ 'ইয়াহ্ইয়াউল উলুম' পাশ্চাত্য ও ইসলাম জগতে সমভাবে সমাদৃত। এর বহু ভাষ্য ও সংক্ষিপ্তসার বেরিয়েছে এবং বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপে ভাষান্তরিত হয়েছে। এমনকি 'ইয়াহ্ইয়াউল উলুমের' সংক্ষিপ্তসার 'কিমিয়ায়ে সা'আদাত' নামে যে গ্রন্থ ইমাম সাহেব স্বয়ং লিখেছেন, তারও বহু ভাষ্য এবং সার-সংক্ষেপ প্রকাশিত হয়েছে এবং কঠিন কঠিন শব্দের ব্যাখ্যা করেছে মিস্টার হিটজিগ। এর মূল কপি বার্নের লাইব্রেরীতে এখনও বিদ্যমান রয়েছে। তাফসীর ছাড়াও ইমাম গাযযালীর এই অমর গ্রন্থে 'ইয়াহইয়াউল' উলুম'-এর মাঝে কুরআনের বিস্তৃত আলোচনা এবং মাঝে মাঝে ই'জায শাস্ত্র সম্পর্কেও আমরা তাঁর মতামত পেয়ে থাকি। এই 'ইয়াহ্ইয়াউল উলুমের' অতি সুন্দর ও সার্থক শরাহ লিখেছেন সাইয়েদ মুহাম্মদ মুরতাযা।

আলহাজ্ব মৌলানা ফযলুল করীম সাহেব এম. এ. বি. এল. বাংলা ভাষাভাষীদেরকে এই 'ইয়াহ্ইয়াউল উলুমের' জ্ঞানসমৃদ্ধ বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত করার মানসে বিস্তৃত ৯ খণ্ডে একে বাংলায় ভাষান্তরিত করেন। এর ১ম খণ্ড প্রকাশ পায় ১৯৬১ ঈসায়ীতে এবং ৯ম খণ্ড ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে।

ইমাম গাযযালীর অমূল্য গ্রন্থাবলীর দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে—সর্বত্রই এত সমাদৃত হওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই যে, তিনি তাকলীদ বা অন্ধ বিশ্বাসকে পশ্চাতে রেখে স্বাধীন চিন্তা, মুক্ত বুদ্ধি ও যুক্তি প্রয়োগের দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন তাঁর সমস্ত গ্রন্থমালাকে। জগৎ যেমন নিত্য নতুন সৃষ্টিতে ভরপুর, ইসলামও ঠিক তেমনি তার নিজস্ব মৌলিক সত্তা বজায় রেখে নিত্য-নতুন ব্যাখ্যাতে পরিপূর্ণ। ইমাম গাযযালী তাঁর বৈজ্ঞানিক যুক্তি-তর্কের দ্বারা যে

ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে মরণোম্মুখ ইসলাম নব প্রাণরসে সঞ্জীবিত ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে, আর জ্ঞানী শত্রুদের করাল কবল থেকেও রক্ষা পেয়েছে এই ইসলাম। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন শাফেয়ী মযহাবের অনুসারী। কিন্তু পরে এই ভুল ভাঙ্গলে তিনি তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে তাকলীদের বেড়াজালকে ডিঙ্গিয়ে স্বাধীন মুক্ত চিন্তার অনুরাগী হয়ে পড়েন। তাঁর মুক্তবুদ্ধি কিন্তু যুক্তিবাদের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত ছিল না বরং তাঁর অনুসন্ধিৎসু মনের জন্য আল্লাহ্ পাকই তাঁর জ্ঞানের দুয়ারকে অবারিত করে দিয়েছিলেন। যে জ্ঞান-সিন্ধু থেকে আকণ্ঠ পান করে তিনি পরিতৃপ্ত হতে পেরেছিলেন। 'মানখুল' নামক বইখানায় তাঁর স্বাধীন মতামতকে তিনি নির্ভীকভাবে ব্যক্ত করেছিলেন। এই অপরাধেই তাঁর এই কিতাবখানি মুসলিম জগতের বুক থেকে অগ্নিসংযোগ দ্বারা অবলুপ্ত করা হয়েছিল। তাঁর অপর গ্রন্থ 'ইয়াহ্ইয়াউল উলুমকেও' অগ্নিদগ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছিল, কিন্তু ইউরোপ তাকে পরমাদরে গ্রহণ করে আসন্ন ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করেছে।

মোটকথা, এই যুগপ্রবর্তক মনীষী আবু হামেদ আল-গাযযালী তাঁর তাফসীরুল কুরআন ও অন্যান্য গ্রন্থে ই'জায শাস্ত্র সম্পর্কে যে ইশারা ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন, পরবর্তী লেখকেরা তাকে কেন্দ্র করেই বিস্তারিত আলোচনার অবতারণা করেছেন।

কাযী আইয়ায

আবুল ফযল কাযী আইয়ায মালিকী (ওফাত ৫৪৪ হিঃ—১১৪৯ খৃীঃ) তাঁর লিখিত 'আস-শিফা ফী তা'রীফি হুকূকিল মুসতাফা' নামক অমর গ্রন্থে ই'জায শাস্ত্রকে নিয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ অতি মূল্যবান আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। কাযী আইয়ায ৪৯৬ হিজরীতে সাবতা নামক স্থানে পয়দা হয়েছিলেন বলে অনেকেই তাঁকে 'সাবতী' নামেও অভিহিত করে থাকেন। উচ্চশিক্ষার মানসে উনদুলুস গিয়ে ইবনু রুশ্দ, ইবনু হামদীন, ইবনু ওত্তাব ও আবু আলী সাদফী প্রমুখ মনীষীর কাছে তিনি কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, ফালাসাফা ইত্যাদি শিক্ষা করেন।

আল্লামা জালালউদ্দীন সুয়ুতী তাঁর 'আল-ইত্কান ফী উলূমিল কুরআন' নামক অনুপম গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ই'জায সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে স্থানে স্থানে কাযী আইয়াযের 'আস-শিফা' নামক গ্রন্থের হাওয়ালা দিয়েছেন। কাযী আইয়ায এতে পবিত্র কুরআনের অমর মু'জিযাকে একাধিক ভাগে বিভক্ত করে বলেছেন ঃ কি অক্ষরে, কি বাক্যে, অনন্য বাকধারায়, সংক্ষিপ্ত বর্ণনায়, শব্দ যোজনায়, চয়নে ও উদ্দেশ্যে, দূর ভবিষ্যতের অজ্ঞাত এবং ঐতিহাসিক সংবাদ প্রদানে সব কিছুতেই সংমিশ্রিত হয়ে রয়েছে কুরআনের অলৌকিকতা। সবচাইতে আশ্চর্যের ও দৃঢ় প্রত্যয়ের বিষয় এই যে, পবিত্র কুরআনের ধারক, বাহক ও প্রচারক নবী মুস্তফা (সঃ) যাঁর মুবারক মুখ দিয়ে নিশিদিন উচ্চারিত ও প্রচারিত হয়েছে এই অমর মু'জিযার বাণী, তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে উম্মী বা নিরক্ষর। যদি তিনি হতেন পণ্ডিত বা সর্বোচ্চ শিক্ষায় ডিগ্রীধারী, তাহলে আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে এ ধারণা করতে পারতাম যে, তিনি যে সমস্ত মু'জিযার বাণী আউড়াচ্ছেন সেগুলো হয়তো বা তিনি অন্যান্য আসমানী গ্রন্থ থেকে অধ্যয়ন করেছেন, নকল করেছেন মুখস্থ করেছেনঅথবা ধার করেছেন।[১]

যুগ যুগ ধরে পবিত্র কুরআনের অমিয় বাণী মানুষের মনে যে দাগ কেটেছে, এর সম্মোহনী শক্তি দিয়ে মানুষকে তার প্রতি আকৃষ্ট করেছে। কাযী আইয়ায তাঁর এই অমূল্য বইয়ের মাধ্যমে তৎপ্রতিও বেশ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং পাঠকের শুভ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি যুবায়র বিন মুতইমের কথাও উল্লেখ করেছেন, যিনি মাগরিবের নামাযে আঁ হযরতের (সঃ) সুললিত কণ্ঠে সূরা আত্তুর উচ্চারিত হতে শুনেই বিমুগ্ধ-চিত্তে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন। হযরত যুবায়র বিন মুতইম (রাঃ) বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়ে তখন সবেমাত্র মদীনা শরীফে এসে উপনীত হয়েছিলেন। রসূলে পাক (সঃ)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত সূরা আত্-তুরের আয়াতগুলো এই ঃ

১. আস্-শিফা বী তারীফি হুকুকিল মুসতাফা ঃ পৃষ্ঠা ২১৬-২১৭।

তাদের সৃষ্টি কি আপনা আপনি হয়ে গেছে, না নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টিকর্তা? না কি তারাই পয়দা করেছে আসমান-যমীনকে? বরং তারা আদৌ এটা প্রত্যয় করে না। না কি তাদের কাছেই গচ্ছিত আছে তোমার প্রভু পরওয়ারদিগারের ধন ও সম্পদ-সম্ভার, নাকি তারাই সর্বেসর্বা? [১]

পবিত্র কুরআনের এই সম্মোহনী বাণী শ্রবণ মাত্রই যুবায়রের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হলো। তিনি কিছুতেই আর স্থির থাকতে পারলেন না। একটা অজানা অচেনা বৈদ্যুতিক আকর্ষণ যেন তাঁর হৃদয়-মন-প্রাণকে সব সময় নিজের অজান্তে টানতে লাগলো। তাই আর কালবিলম্ব না করে জীবনের এই সর্বপ্রথম মহাস্মরণীয় দিনে, এই ঐতিহাসিক মাহেন্দ্রক্ষণে তিনি আঁ হযরতের (সঃ) হাতে হাত দিয়ে ইসলামে দীক্ষা নিলেন।

ইসলামের ইতিহাস তথা পবিত্র কুরআনের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এ ধরনের প্রচুর দৃষ্টান্তের রয়েছে অপূর্ব সমাবেশ। একমাত্র কুরআনের পূত-বাণী শ্রবণ করেই কত কাফির আর দুশমনই যে ইসলামের শান্ত শীতল ক্রোড়ে আশ্রয় নিয়েছে, সত্যিই তার ইয়ত্তা নেই।

আরব কাবিলার আসআ'দ বিন যারারাহ আঁ হযরতের (সঃ) চাচা হযরত আব্বাসের (রাঃ) কাছে উপনীত হয়ে একবার স্পষ্টাক্ষরেই একথা স্বীকার করে বললেন:

আমরা অযথাই মুহাম্মদের (সঃ) দোষারোপ করছি; আর তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটাচ্ছি। আমি নিশ্চিত-ভাবেই বলছি যে, নিঃসন্দেহেই তিনি আল্লাহ্‌র প্রেরিত মহাপুরুষ। কস্মিন-কালেও তিনি মিথ্যা নন, আর মুখনিঃসৃত এই অমিয় বাণীও তাঁর নিজস্ব নয়। বরং স্বয়ং মহান প্রভু আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আগত এই ঐশী বাণী।

বনু সোলাইম গোত্রের কায়স বিন নাসিরা হুযুরে আকরাম (সঃ)-এর সমীপে হাযির হয়ে মন্ত্রমুগ্ধবৎ কুরআনের আয়াত শোনালেন। অতঃপর

১. মোঃ আবদুস সামী সাহেব অনূদিত বুসতানুল মুহাদ্দিসীন, মূল: শাহ্ আবদুল আযীয সাহেব দিহলভী: পৃষ্ঠা ২২৪।

তিনি আঁ হযরতকে (সঃ) কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। আঁ হযরত (সঃ) সকল প্রশ্নেরই বেশ সন্তোষজনক জবাব দিলেন। ফলে অনতিবিলম্বেই তিনি মুসলমান হয়ে স্বীয় কাবিলার লোকদের গিয়ে বললেন ঃ

'ইরান ও রোমানদের কত দেশবরেণ্য কবি আর কত সেরা সাহিত্যিকের রচিত অমর কাব্য আমার দেখবার ও শোনবার সুযোগ ঘটেছে। ঋষি ও জ্যোতিষীদের কথাও আমার শুনতে বাকী নেই, এমন কি হোমারের সুপ্রসিদ্ধ রচনা শোনারও আমার সৌভাগ্য হয়েছে, কিন্তু মুহাম্মদ (সঃ)-এর মুখনিঃসৃত এই বাণীর সমতুল্য আমি আজও কোথাও শুনিনি। আমার কথা যদি তোমরা মেনে নিতে চাও তাহলে আর অযথা কালবিলম্ব নয় এক্ষণি—এই মুহূর্তেই তাঁর পদপ্রান্তে হাযির হয়ে আনুগত্য স্বীকার কর।"...

মক্কা বিজয়ের কালে তাঁরই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তাঁর কাবিলার প্রায় সহস্রাধিক লোক রসূলে মকবুল (সঃ)-এর হাতে ইসলামে দীক্ষা নিয়েছিলেন।

অনুরূপভাবে হযরত ওসমান বিন মাযউন (রাঃ) কুরআন মজীদের একটি আয়াত শ্রবণমাত্রই এতে বিস্ময় বিমুগ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ ইসলাম কবুল করেন। পবিত্র কুরআনের সেই আয়াতটি এই ঃ

> নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক ন্যায়-নীতি, সততা এবং সদ্ব্যবহারের আদেশ প্রদান করে থাকেন। আর তিনি অসৎ কর্ম, গুনাহ ও অত্যাচার করতে নিষেধ করেন। এভাবেই তিনি তোমাদের উপদেশ দান করেন যেন তোমরা তা গ্রহণ করো।

পবিত্র কুরআনের অলৌকিক আকর্ষণ ও অভূতপূর্ব প্রভাব সম্পর্কে আরও একটি দৃষ্টান্ত দিই। তখন নবুওতের একাদশ বছর সবেমাত্র শুরু হয়েছে। আউস গোত্রের নামকরা সুধী সুয়েদ বিন সামিত মদীনা নগর থেকে মক্কাধামে আগমন করলেন হজ্জব্রত উদযাপন করতে এবং তাঁর কবিত্ব প্রতিভা দ্বারা আঁ হযরতকে (সঃ) বিমোহিত করতে। সমাজের একজন বেশ

গণ্যমান্য ও নামকরা ব্যক্তি ছাড়াও বাগ্মিতা এবং বাক্‌পটুতায় তিনি এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন যে, তদানীন্তন সুধী সমাজ তাঁকে 'কামিল' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। তিনি আঁ হযরতের (সঃ) খিদমতে হাযির হয়ে বললেনঃ আমার কাছে রয়েছে অমূল্য কবিত্বপূর্ণ বাণী আর লোকমান হাকীমের হিকমাত। এই বলে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে তিনি তাঁর স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ অতি উত্তম কথা, কিন্তু আমার কাছে যা, তা' এর চাইতেও উত্তম ও হিতোপদেশপূর্ণ। অতঃপর রসূলে করীম (সঃ) কুরআন পাকের কয়েকটা আয়াত পড়ে শোনালেন। সুয়েদ বিন সামিত বিমুগ্ধচিত্তে শ্রবণ করে বললেনঃ দুনিয়া ও আখিরাতের এ অমূল্য সম্পদই বটে। বরং এ তো হিদায়তের বাস্তব নূর। অতঃপর আঁ হযরতের (সঃ) হাতে মুসলমান হয়ে যখন তিনি মদীনা পেঁছলেন, তখন আল্লাহ্‌ ও রসূলের (সঃ) প্রতি তাঁর এই ঈমান আনার অভিযোগে খাজ্‌রাষ গোত্রের লোকেরা অতি নৃশংসভাবে তাঁকে হত্যা করে ফেললো।

অলীদ বিন মুগীরা

কুরায়শ কওমের সর্দার অলীদ বিন মুগীরা ছিলেন অত্যন্ত বয়ঃবৃদ্ধ এবং বাকপটু। ইসলামের প্রতি তার বৈরীভাব ছিল অতি প্রকট। দুরাত্মা আবুজেহেলের সাথে মিলে তিনি মুসলমানদের উপর যে নির্মম ও নৃশংসভাবে আঘাতের পর আঘাত হেনেছেন তা শুনলে এখনও গা শিউরে উঠে, শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে যায়। কিন্তু পরিশেষে তিনিও ইসলামের শান্ত শীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। সে কথাই বলছিঃ

একদা তিনি সাহাবায়ে কিরামের খেদমতে হাযির হয়ে বলেনঃ আচ্ছা, আজ তোমরা আমাকে কুরআনের একটা আয়াত শোনাও তো দেখি। উত্তরে তাঁরা কুরআন পাক থেকে তিলাওয়াত করে শোনালেন। তখন

তিনি নিজের অজ্ঞাতে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন: এ বাণী কস্মিনকালেও মনুষ্যরচিত নয় কিংবা কোন কবিরও কাব্য নয়।

এ অলীদ বিন্ মুগীরা আরও একবার হযরত আবু বকরকে (রাঃ) অনুরোধ জানিয়ে তাঁর মুখ থেকে কুরবানীর আয়াত শুনেছিলেন। অতঃপর কুরায়শ কওমের কাছে গিয়ে এভাবে মন্তব্য করেছিলেন: কুরায়শগণ, তোমরা যাকে বলছো যাদুকর, আসলে তিনি যাদুকর নন। এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র শাশ্বত কালাম।

আরবদের প্রায় সবাই ছিলেন স্বভাব-কবি। তাই অলীদ বিন মুগীরার মাঝেও এই কবিত্ব প্রতিভার স্ফুরণ দেখা দিয়েছিল পূর্ণ মাত্রায়। একবার কুরায়শরা তাঁকে ধন-দৌলত, বিষয়-বৈভব ও মান-সম্মানের লোভ দেখিয়ে কুরআন পাকের অনুরূপ একটা সূরা রচনা করতে বাধ্য করলেন। কিন্তু তিনি এতে অপারগ হয়ে পবিত্র কুরআনের সত্যতা সম্পর্কে কুরায়শদেরকে এভাবে তাঁর স্বীয় অভিমত জানালেন:

হে কুরায়শগণ! এ কোন কবির কবিতা নয় যে, আমি এর মুকাবিলা করতে পারবো। আর এ কোন পাগলের প্রলাপও নয়। যাকে তোমরা পাগল বলছো, তিনি কস্মিনকালেও পাগল বা উন্মাদ নন। বরং আমাকেও তোমরা পাগল বলতে পারো। আর তোমরা নিজেদের অবস্থার কথাও একটু চিন্তা করে গভীরভাবে তলিয়ে দেখো। মুহাম্মদ (সঃ) তোমাদের কাছে একটা মহামূল্য জিনিস নিয়ে এসেছেন।

যামাদ আযদী

হযরত যামাদ আযদী বিন সা'আলাবা ছিলেন ইয়ামেনের অধিবাসী। ঝাড়ফুঁক বা মন্ত্র-তন্ত্র দ্বারা মানুষের চিকিৎসা করাই ছিল তাঁর পেশা। রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) উন্মাদনার কথা শুনে তিনি একদিন তাঁর এলাজ করার উদ্দেশ্যে মক্কাধামে আগমন করলেন। মুলাকাতের পর রসূলে আকরাম (সঃ) তাঁর সামনে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও কালেমা-ই-তাইয়েবা পাঠ করলেন।

এ শুনে তিনি পাগলপ্রায় হয়ে উঠলেন এবং এর পুনঃআবৃত্তির জন্য বারংবার সনির্বন্ধভাবে অনুরোধ জানাতে লাগলেন। অতঃপর চিৎকার করে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেনঃ আমি বহু কবির কবিতা, যাদুকরের মন্ত্র-তন্ত্র এবং কাহেনের ভবিষ্যদ্বাণী শুনেছি, কিন্তু এমনটি কোনদিনই শুনিনি এই বলে রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) হাতে হাত দিয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ ইসলামে দীক্ষা নিয়ে ফেললেন।

প্রখ্যাত মনীষী নওফাল মাসীহী আফিন্দী তাঁর 'সান্নাযাতুত্ তরাব' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে বলেনঃ

قال صاحب تذكرة الحكم فى طبقات الامم ان العرب اقامت تسجد لهذه المعلقات نحو مائة وخمسون سنة الى ان ظهر الاسلام وابطل القران بسطوة فصاحته اعتبار العرب لهذه المعلقات -

পৌত্তলিক আরবরা যেমন অন্যান্য বস্তুকে সিজদা করত ঠিক তেমনি তারা 'মুআল্লাকা' বা সপ্ত ঝুলন্ত কাব্যের উৎকর্ষতা শুনে মুগ্ধ হয়ে প্রায় দেড়শো বছর ধরে একে সাষ্ঠাঙ্গে সিজদা করেছে কিন্তু ইসলাম ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভূত হওয়ার অব্যবহিত পর পবিত্র কুরআনের অপূর্ব বাগ্মিতা ও আলংকারিক শিল্পকলার দরুন তাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসে।[১]

এই মুআল্লাকার ৪র্থ কবি লাবীদ বিন্ আবি রাবিয়াহ প্রথম জীবনে ছিলেন ইয়ামেনের একজন পৌত্তলিক বাসিন্দা। তাঁর মনীষা, কবিত্ব প্রতিভা এবং বাগ্মিতার খ্যাতি সর্বত্রই প্রসার লাভ করেছিল। স্বরচিত কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব ও বাক্‌পটুতার দরুন তিনি অন্যকে একান্ত তুচ্ছ ও হেয় মনে করতেন। একদিন তিনি তাঁর একটা কাসীদা পুণ্যধাম কা'বার পবিত্র গৃহদ্বারে মুকাবিলার জন্য ঝুলিয়ে রাখলেন। কারণ তখনকার দিনে শুধুমাত্র সকল

১. নওফাল মাসীহী আফিন্দি কৃত সান্নাযাতুত্ব-তরাব ফী তাকাদ্দমাতিল আরাব" ঃ পৃষ্ঠা ৭৯।

বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম কাসীদাকেই এভাবে মক্কা মুয়াযযমার সিংহদ্বারে ঝুলিয়ে রাখার অনুমতি দেয়া হতো। লাবীদের কবিতার উচ্চগুণ দর্শনে সমসাময়িক কবিদের মধ্যে কারো এ সৎসাহস হলো না যে, তাঁর মুকাবিলায় দাঁড়ায়। তারপর রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর উপর কুরআনী আয়াত নাযিল হলে লাবীদের এই মিথ্যা ও অলীক শ্রেষ্ঠত্বের দাবী খণ্ডনকল্পে পবিত্র কুরআনের কাউসার নামক ক্ষুদ্রতম সূরাটি লাবীদের কাসীদার পার্শ্বে টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়। খবর শুনে মদগর্বিত লাবীদ তৎক্ষণাৎ পবিত্র কা'বার দ্বারপ্রান্তে এসে হাযির হন। কিন্তু উক্ত সূরার প্রথম আয়াতটি নযরে পড়তেই তিনি হঠাৎ করে থমকে উঠেন। অতঃপর বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে মন্ত্রমুগ্ধবৎ বলে উঠেন ঃ ওহী বা প্রত্যাদেশ ছাড়া এরূপ রচনা নিঃসন্দেহে মানব সাধ্যের অতীত। বলা বাহুল্য কবিবর তখনই ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

তাফসীরুল কুরআনে সূরা কাউসারের শানে নুযূল বা ঐতিহাসিক পটভূমিতে (Historical bakground) লেখা আছে যে, উক্ত সূরাটি নাযিল হওয়ার পর আরবের স্বনামখ্যাত কবি ও বাগ্মীরা এ দেখে স্তম্ভিত ও হতচকিত হয়ে গিয়েছিল। আর দেশবরেণ্য কবি ও সেরা সাহিত্যিকরা তাঁদের নিজ নিজ কাসীদাসমূহকে তৎক্ষণাৎ কাবার দেওয়াল থেকে সরিয়ে নিয়েছিল। এমন কি জনৈক কবি কুরআনের অনুরূপ রচনাকে মানব শক্তির সাধ্যাতীত মনে করে সূরা কাউসারের প্রথম আয়াতটির নীচে নিম্নরূপ মন্তব্য লিখেছিলেন ঃ

ليس هذا كلام البشر —এ বাণী মানব রচিত নয়।

লাবীদ বিন আবি রাবিয়ার ইসলাম গ্রহণের বহু পরে ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ) একদিন তাঁকে কবিতাবৃত্তির জন্য অনুরোধ জানান। তদুত্তরে তিনি বলেন ঃ সূরাতুল বাকারা ও আলে-ইমরানের তিলাওয়াত করতে শিখে আমি কবিত্ব চর্চাকে একরূপ ছেড়েই দিয়েছি।[১] কারণ পবিত্র কুরআনের যে সাহিত্যিকমানের অপূর্ব স্বাদ আর যে রূহানী

১. ইবনু আবদিল বির কৃত 'আল ইসতিয়াব' ঃ পৃষ্ঠা ১৬৫ এবং জামহারাতু আশ'আরিল আরাব' ঃ পৃঃ ৩১।

আকর্ষণী শক্তির মোহ রয়েছে, কবিত্ব চর্চায় তার শতাংশের একাংশও নেই।[১] এ কারণেই আমি পবিত্র কুরআনকে আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করেছি।[২]

হযরত লাবীদের জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না তবে ষষ্ঠ শতক ঈসায়ীর শেষার্ধে তিনি পয়দা হয়েছিলেন এবং ৬৬১ ঈসায়ীতে আমীর মু'আবিয়ার খিলাফতের কিছুকাল পরেই অর্থাৎ সপ্তম শতক ঈসায়ীর শেষার্ধে তিনি ইন্তিকাল করেন।

নাবিগা আহজাদী আরবের প্রখ্যাতনামা কবি ও প্রবীণ সাহিত্যিক। পবিত্র কুরআনের সুবিমল বাক্যচ্ছটায় বিস্ময় বিমুগ্ধ হয়ে তিনি ইসলাম কবুল করেন। অতঃপর পবিত্র কুরআনের বাগিমতা ও আলংকারিক শিল্পকলা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেন যে, এ হচ্ছে সমুজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায়।[৩] ইসলাম গ্রহণের পর তিনি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর শানে যে কাসীদা আবৃত্তি করেন তার কিয়দংশ এই :

اتيت رسول الله اذ جاء بالهدى - ويتلو كتابا كالمجرة نيره

اقيم على الله قوى وارضى بفعلها - وكنت من النار المخوفة احذرا [৪]

পবিত্র কুরআনের মনোহর বাক্যচ্ছটায় স্তম্ভিত ও চমৎকৃত হয়ে, এর হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক উপদেশমালায় আকৃষ্ট হয়ে তৎকালীন ইসলাম বিদ্বেষী আরবরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতো : 'কুরআনের মোহিনী শক্তি মানবকে তার ধর্ম

১. তাবাকাত ইবনে সা'দ : দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১।

২. মওলানা মুফতী আবদুল লতীফ সাহেব কৃত 'তারীখুল কুরআন' : ১ম এডিশন, পৃষ্ঠা ৩১; মুনগীর রহমানীয়া প্রেস, ১৩৪৩ হিজরী।

৩. আবুল ফারাজ আল আসপাহানী কৃত কিতাবুল আগানী : ৪র্থ খণ্ড; পৃষ্ঠা ১৩০।

৪. জাওয়াহিরুল আদাব ফী আদাবিয়াতে আরাব; সাইয়েদ আহমাদ হাশেমী : দ্বিতীয় খণ্ড; পৃষ্ঠা ১৬৬।

ও আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন করে। অতএব এর মনোমুগ্ধকর বাণী যখন তোমাদের সামনে পঠিত হয়, তখন তৎপ্রতি আদৌ কর্ণপাত না করে তোমরা পরস্পর মিলে কলরব করতে থাকো, তবেই তোমরা হতে পারবে জয়যুক্ত, হবে কামিয়াব।[১]

وقال الذين كفروا لاتسمعوا لهذ القران والغوا فيه لعلكم تغلبون - (حم السجدة - ٢٦)

কাযী আইয়াযের মতে কুরআন পাকে রয়েছে এমন সব ঘটনা, খবরা-খবর এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপূর্ব সমাবেশ, যা পৃথিবীর অন্য কোন পুস্তকে নেই বা থাকা সম্ভবও নয়। তিনি 'আস্-শিফা' পুস্তকে এ সমস্ত বর্ণনা দিয়েছেন অত্যন্ত সার্থক ও সংক্ষিপ্তাকারে।

ই'জায শাস্ত্র সম্পর্কে কাযী আইয়াযের মতামত ততটা মৌলিক বা নতুন কিছু নয়। বস্তুত তিনি ইমাম বাকিল্লানীর মতামতগুলোরই একটা সার সংক্ষেপ দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। নতুন বা অভিনব বলতে তিনি শুধু এতটুকু বলেছেন যে, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত যে সমস্ত ঘটনাপ্রবাহ, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংবাদাদির সমাবেশ রয়েছে—সেগুলো এ ধরনের অন্য কোন গ্রন্থে বয়ান করা হয়নি।

কাযী আইয়ায তাঁর এই কিতাবে 'সারাফা' মতবাদ সম্বন্ধেও আলোচনা করেন। কিন্তু একে সম্পূর্ণরূপে তিনি স্বীকার করার চেষ্টা করেন নি, আবার এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাকল্পে নিজের সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করার তকলীফও তিনি করেন নি।

তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র একদিন স্বপ্নে দেখেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে কাযী আইয়ায একই স্বর্ণখচিত পালঙ্কোপরি উপবিষ্ট রয়েছেন। কাযী সাহেব এই খোয়াবের তা'বীরে বলেছিলেন: "আল্লাহ্ পাক একমাত্র 'আস্-শিফা'র বদৌলতেই আমাকে এই মহাসম্মানে ভূষিত করেছেন।" যাই হোক, এ বিষয়ে

১. তাফসীর সূরা হা-মীম, আস্-সিজদা: ২৬ আয়াত, ২৪ পারা।

কোন বাক-বিতণ্ডা বা শক্-সন্দেহের অবকাশ নেই যে নবী মুস্তফা (সঃ)-এর শানে এ পর্যন্ত যতগুলো কিতাব রচিত হয়েছে, তন্মধ্যে 'আস্-শিফা'ই হচ্ছে অন্যতম। এই অন্যতম গ্রন্থ ছাড়া কাযী আইয়ায তাঁর নিপুণ হাতে আরও বহু গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আমরা এখানে কয়েকটির নাম উল্লেখ করছি। যেমন ঃ

১. মাশারিকুল আন্ওয়ার।

২. ইকমালুল মু'আ'ল্লিম (শারাহ মুসলিম শরীফ)

৩. কিতাবুল মুস্তামবাত।

৪. কিতাবুল ইসলাম।

৫. কিতাবুল ইল্ম।

৬. তাম্বিহাত।

৭. নাযমুল বুরহান

৮. মাকাসিদুল হিসান।

৯. গুনিয়াতুল কাতিব ওয়াবুগিয়াতুত্ তা'লিব।

১০. জামে তারীখ (২)

শায়খ আহমদ আল-মুকরী তাঁর 'যাহরুর রিয়ায ফী আখ্বারি আইয়ায' নামক গ্রন্থে কাযী আইয়াযের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে গেছেন।

কাযী আইয়াযের অন্যতম অবদান 'আস-শিফা' সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করতে গিয়ে লিসানুদ্দিন আল-খাতীব তালমাসতানী কবিতা রচনা করেছেন।

কাযী আইয়াযের 'আস্-শিফা' প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত আভ্যন্তরীণ ব্যাধির প্রতিষেধক এবং তাঁর এই অবদান যে বিরাট শ্রেষ্ঠত্বের বাহক সেটা কারো অনবিদিত নহে।

এটা সৎকর্মশীল ব্যক্তির পক্ষ থেকে একটা 'তোহফা' স্বরূপ। বিপুল সুখ্যাতি ও পর্যাপ্ত পরিমাণে পারিতোষিক ছাড়া এর আর কোন প্রতিদান হতে পারে না।

"রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তিকালের পর কাযী আইয়াযই তাঁর ন্যায্য হক আদায় করেছেন এবং কারুর ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে উদাসীন থাকাটাও একটা জুলুম।"

"এই অমর গ্রন্থ যেন একটা গচ্ছিত রাশিকৃত ধন-ভান্ডারস্বরূপ, যার অফুরন্ত কল্যাণ মানবকে তার জীবদ্দশাতেই অমুখাপেক্ষী করে তোলে এবং যুগ হতে যুগান্তরের লোকের অনাবিল শান্তি নেমে আসে এই পুস্তকেরই বদৌলতে।"

আবদুল হুসাইন আবদুল্লাহ বিন্ আহমদ বিন্ আবদুল মাজীদ আজদও অনুরূপভাবে 'আস-শিফা' পুস্তকের প্রশংসাসূচক কবিতা রচনা করেছেন।

'আস্-শিফা' গ্রন্থ অন্তরসমূহের জন্য যেন একটা অমোঘ মহৌষধ। এর দলীল-প্রমাণের সূর্য ভাস্বর হয়ে দেখা দিয়েছে। মানুষ যদি এং বিষয়বস্তুকে একটু অভিনিবেশসহকারে অধ্যয়ন করে, তবে অচিরেই তার ঈমানের মূল, শিকড় হিদায়তের জন্য সুদৃঢ় ও মজবুত হয়ে পড়ে।"

"কাযী সাহেব যেন তাক্ওয়া বা ধর্মভীরুতার এমন এক উদ্যানকে পরিশোভিত করেছেন, যার শাখা-প্রশাখার প্রান্তবর্তী পুষ্পগুলো সুগন্ধে ভরপুর। তাই আল্লাহ্ পাক যেন আবুল ফযল (কাযী সাহেবের কুনিয়াত) এর মঙ্গল করেন। কারণ তাঁর অতুল ইহসানের পূর্ণ পারিতোষিক আজ বিশ্বভুবনে ছড়িয়ে পড়েছে।"

কাযী আইয়াযের এই অনুপম গ্রন্থটির বিস্তারিত আরবী শারাহ লিখেছেন আল্লামা আশ-শাহাব ও আল্লামা সুয়ুতী। এই অনুপম 'শিফা' গ্রন্থের উর্দু তরজমা লিখে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন মৌলানা হাফেজ মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব। এই উর্দু তরজমার নাম 'শামীমুর রিয়ায'। ইহা দুই খণ্ড এবং ৭৩৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়েছে। এর আর একটা আরবী শারাহর 'নাম নাসীমুর রিয়ায'।

আয্-যামাখশারী

আল্লামা আবুল কাশিম জারুল্লাহ মাহমুদ বিন্ উমর বিন্ মুহাম্মদ বিন্ আহমাদ আল-যামাখশারী আল-মু'তাযিলী (ওফাত ৫৩৮ হিঃ—১১৪৪ খৃষ্টাব্দ) তাঁর অনবদ্য তাফসীর আল্ কাশশাফ-আন-হাকায়িকিত-তানযীল'-এর মধ্যে ই'জায শাস্ত্রের মতবাদকে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন কুরআনে ব্যবহৃত বিশেষ বিশেষ শব্দ বৈচিত্র্য এবং এর অপূর্ব প্রকাশভঙ্গীর মাধ্যমে। এভাবে তিনি যেন শায়খ আল-জুরজানীর মতবাদকেই পরোক্ষভাবে সাব্যস্ত করতে প্রয়াস পেয়েছেন।[১]

তাঁর মতে ই'জায শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়েছে কুরআনে ব্যবহৃত শব্দসমূহের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক তাৎপর্য এবং ব্যবহারের ধরন থেকে।

আল্-বাসউনী কৃত 'হুসনুস্-সানী' নামক কিতাবের মুখবন্ধে ডক্টর মুহাম্মদ খালীল আল্ খাতীব বলেন: সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে যারা কুরআনের ই'জাযকে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, তন্মধ্যে শায়খ আবদুল কাহির আল-জুরজানী প্রথম এবং আল-যামাখশারী হচ্ছেন দ্বিতীয় মনীষী। বলতে কি, কুরআনের ই'জায এবং এর বাক্রীতি ও সাহিত্যিক মানের যথার্থ মর্যাদা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া এবং বিপুল পারদর্শিতা অর্জন করার মানসে এই উভয় মনীষী যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও আজন্ম জ্ঞান-সাধনা করেছেন তা সত্যিই অতি প্রশংসনীয়। আরবীতে একটি প্রসিদ্ধ মাকুলা বা প্রবাদ বাক্য রয়েছে:

لم يدر اعجاز القران الا الاعرجان احدهما زمخشر والاخر من جرجان -

কুরআনের ইজায সম্পর্কে দু'জন খঞ্জের মত আর কেউ এত ব্যুৎপত্তি কোনদিন হাসিল করতে পারেন নি। একজন যামাখশারের অধিবাসী আর অপরজন জুরজানের।

---

১. ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম: পৃষ্ঠা ১৮৩-১৮৪।

ডক্টর খলীল আল-খাতীব এ প্রসঙ্গে ইবনু খালদুনের (ওফাত ৮০৮ হিঃ—১৪০৬ খৃীঃ) অভিমতকে এভাবে উল্লেখ করেছেন: "কুরআনের ই'জাযকে সম্যক অনুধাবন করাই হচ্ছে অলংকার শাস্ত্রের একটা অবশ্য-ম্ভাবী ফলাফল। তাই একজন তাফসীরকারের প্রতিটি পদক্ষেপেই যে এই শিল্পের প্রয়োজন হয় তা' বলাই বাহুল্য। অতীব পরিতাপের বিষয় যে, অতীতের তাফসীরকারগণ পবিত্র কুরআনের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তার অধিকাংশই এই অলংকার শিল্প থেকে বঞ্চিত। কিন্তু আল্লামা জারুল্লাহ যামাখশারী যখন তাফসীর বিজ্ঞানের সুপ্রশস্ত ময়দানে অবতরণ করে লেখনী হাতে নিলেন, তখন কুরআনের প্রতিটি আয়াতকেই ই'জাযের দৃষ্টান্ত দিয়ে পেশ করলেন। এই দৃষ্টিকোণের মাপকাঠি ও কষ্টিপাথরে তিনি যাচাই করলেন, আর অলংকার শাস্ত্রের আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে অভিনিবেশ-সহকারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন। এদিক দিয়ে তিনি সত্যিই প্রশংসার পাত্র। কিন্তু যামাখশারীর জীবনের আরও একটা তমসাবৃত অধ্যায় রয়েছে। সেটা হচ্ছে তাঁর Rationalism বা যুক্তিবাদিতার মতবাদ। এই দ্বিতীয় মতবাদকেই তিনি তাঁর তাফসীরে খুব বেশী জোর দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন: কুরআন যদি অসৃষ্ট হয়, তবে এর ই'জাযের সাথে মিল খাবে কি করে? অর্থাৎ পবিত্র কুরআনকে যদি আমরা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বলে মনে করি, তবে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট মু'জিযাকেও আমরা অতি সহজে অনুধাবন করতে পারবো। নতুবা একে সম্যক উপলব্ধি করা আমাদের জন্য একটা দুরূহ ব্যাপার হয়ে পড়বে।

আসল ব্যাপার, ই'তিযাল মতবাদের বিশিষ্ট অগ্রনায়ক হিসেবে এবং এর প্রতিপাদন কল্পেই তিনি কুরআন সৃষ্ট বা অসৃষ্ট হওয়ার ব্যাপারটাকে ই'জাযের প্রশ্নের সাথে জড়িয়ে দিয়েছেন অবিচ্ছেদ্যভাবে। যাই হোক, মু'তাযিলা মাযহাব এবং কুরআন সৃষ্টির ব্যাপার নিয়ে আল্লামা যামাখশারী যে সমস্ত দলীল-প্রমাণ পেশ করেছেন—সে সবের অভ্রান্ত অথচ সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়েছেন ইমাম নাসিরুদ্দীন আহমদ বিন মুহাম্মদ আল-মুনীর আল-ইসকান্দারী (ওফাত ৬৮৩ হিঃ—১২৮৪ খৃীঃ)। ইনি ছিলেন সে যুগে

আলেকজান্দ্রিয়ার কাযী এবং মালিকী মযহাবের অনুসারী। তাঁর এই জবাব সম্বলিত বইটি 'ইনতিসাফ' নামে অভিহিত এবং 'আল-কাশ্‌শাফে'র সাথেই মিসরের বুলক প্রেসে মুদ্রিত (হিজরী ১৩১৮)।

আল্লামা যামাখশারী কুরআনকে সৃষ্ট সাব্যস্তে এতদূর আগ্রহশীল ছিলেন যে, তিনি তাঁর তাফসীরের প্রাথমিক ফিকরা শুরু করেছেন—

"সকল তা'রীফ সেই মহান আল্লাহ্‌র যিনি কুরআন সৃজন করেছেন।"[১]

অতএব তাঁর গ্রন্থাবলীর পত্রান্তরালে আমরা যে আলোকোজ্জ্বল দিকটা দেখতে পাই—তা অনেক সময় ই'তিযাল মযহাবের গাঢ় অন্ধকারে পলে পলে আচ্ছন্ন ও অস্তমিত হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, স্থানে স্থানে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের প্রখ্যাতনামা আল্লাহ্‌ভক্ত আলিমকুলকেও তিনি অকথ্য ভাষায় গালি দিতে ছাড়েন নি। তিনি তাঁদের নিষ্কলুষ ও বিশুদ্ধ বিধৌত চরিত্রে কলংকের কালিমা লেপন করতে একটুও কুণ্ঠাবোধ করেন নি।

কিন্তু একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, এত ত্রুটি আর বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও তাফসীরী দুনিয়ায় 'আল-কাশ্‌শাফ' যে একটা অনন্য ও অনবদ্য অবদান, এতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। এই তাফসীরে ই'জায শাস্ত্রের সাথে সাথে তিনি অলংকারের প্রতিও বেশ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন ঃ অলংকার শাস্ত্রে সুগভীর বুৎপত্তি অর্জন করা ব্যতিরেকে নবী মুস্তফা (সঃ)-এর চিরন্তন মু'জিযাকে উপলব্ধি করা আদৌ সম্ভবপর নয়। তিনি প্রতিপন্ন করেন যে, কুরআনের এই অমর মু'জিযা সকল যুগে, সকল সময়ে, সকল স্থানের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য। তাই এর চিরন্তন চ্যালেঞ্জের জবাব যেমন ইসলাম-পূর্ব যুগের আরবরা দিতে পারেনি, তেমনি অদূর ভবিষ্যতেও কেউ কোনদিন পারবে না। ই'জাযুল কুরআন (Miracle or unapproachability of the Quran) সম্পর্কীয় মতবাদগুলো সমস্তই তাঁর আল্-কাশ্‌শাফ' নামক তাফসীরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ই'জাযের প্রশ্ন নিয়ে তিনি

১. A History of Arabic Literature by Element Huart, edited by Edmund Gosse, P. 167-68.

কোন আলাদা বই লিখেছেন বলে আমার মনে হয় না। এই 'কাশ্শাফ' গ্রন্থের অনবদ্যতা সম্পর্কে তার প্রতি আল্লাহ্র অজস্র দানের শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে গিয়ে তিনি সুন্দর কবিতা লিখেছেন।

"একথা সত্য যে, এই ধরণীর বুকে কুরআনের তাফসীর বা ভাষ্যের কোন অভাব-অনটন নেই। কিন্তু আমার প্রাণের কসম! কাশ্শাফের মত এমন একটি তাফসীর আর কোথাও খুঁজে পাওয়া ভার! তাই, হে আমার শ্রোতা! হিদায়ত যদি তোমার কাম্য হয়, তবে আর কালবিলম্ব না করে 'কাশ্শাফে'র অধ্যয়নে তুমি উঠে পড়ে লেগে যাও। কারণ, অজ্ঞতা একটা ব্যাধি আর 'কাশ্শাফ' তার প্রতিষেধক।"

আল্লামা যামাখশারীর এই অমর গ্রন্থ 'কাশশাফে'র প্রণয়ন ৫২৮ হিজরীর ২৩শে রবিউল সোমবার দিনে খানায়ে কা'বার সম্মুখস্থ 'দারে সুলাইমানী' নামক পূত-পবিত্র স্থানে সুসম্পন্ন হয়, যেখানে সব সময় কল্যাণ ও বরকতের অনন্ত বারিপাত হতে থাকে আর যেখানে এক সময়ে আল্লাহ্র কাছ থেকে ই'জায বা মু'জিযাকে সঙ্গে নিয়ে মুহম্মদ্দুহু 'ওহী নাযিল হতো তাঁর ধারক ও বাহক আঁ হযরত (সঃ)-এর প্রতি।

আগেই বলেছি, অলংকারশাস্ত্র ই'জাযের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই এই অঙ্গকে বাদ দিতে না পেরে আল্লামা যামাখশারী 'আসাসুল বালাগা' (Fundamental source of rhetoricity) শাস্ত্রের একখানা চমৎকার কিতাব প্রণয়ন করেন। অভিধানই হচ্ছে মুখ্য এবং অলংকার এর গৌণ বিষয়বস্তু।

প্রফেসর হাইউড তাঁর সম্বন্ধে বলেন: আল্লামা যামাখশারী অসংখ্য কিতাবের লেখক এবং জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও শিক্ষা জগতের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত। আরবী ব্যাকরণে 'আল-মুফাস্সাল' নামক বৃহৎ গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে তাঁর সর্বতোমুখী মনীষার পরিচায়ক। পরবর্তীকালের লেখকরা এর ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে বেশ প্রতিযোগিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। এর প্রণয়ন শুরু হয়েছিলো ৫১৩ হিজরীর ১লা রমযানে আর খতম হয়েছিলো ৫১৫ হিজরীর মুহররম মাসে। তাঁর তৃতীয় কিতাবের নাম 'নাসাইহুল কিবার' (The great

admonitions)। এর অপর নাম 'আল-মাকামাত'। এটা আরবী ভাষা ও সাহিত্যের একটা উপদেশমূলক কাব্য-উপন্যাস। একে লিপিবদ্ধ করার পেছনে রয়েছে একটা ঐতিহাসিক পাস-মানযার বা পটভূমি। তাশ কোপরা যাদাহ বলেন: জীবনের সুদীর্ঘ ৪১টি বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও যামাখশারী তাঁর চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী রাজদরবার ও অন্যান্য আমীর-ওমরাদের কাছে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। তাঁদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও গুণকীর্তন দ্বারা কিছু পয়সা কামাবার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি এরূপ করতেন। কিন্তু এরপর সৌভাগ্যক্রমে আল্লাহ্ পাক তাঁর জীবনে নিয়ে এলেন এক অচিন্ত্যনীয় পরিবর্তন। তাই পার্থিব ভোগ-বিলাসকে পরিহার করে দীনী খিদমত আঞ্জাম দেয়ার জন্য তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হলেন।[১]

তাঁর আল-মাকামাতের শুরুতেই স্বয়ং তিনি এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন।[২]

এরপর থেকেই তাঁর জীবনে দেখা দিলো একটা বিরাট পরিবর্তনের সূচনা। ৫১২ হিঃ—১১১৮ খৃীস্টাব্দের রজব মাসের শুরুতে ৪১ বছর বয়সে তিনি এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। এই দুর্বলতম মুহূর্তেই তাঁর মনে ভাবান্তর উপস্থিত হয়। চরম গ্লানি ও ধিক্কার এসে সর্বক্ষণের জন্য তাঁর দেহ-মনকে আচ্ছন্ন ও ভারাক্রান্ত করে তোলে। তখন থেকেই তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, আল্লাহ্ পাক রোগ হতে মুক্তি দিলে আর কস্মিনকালেও তিনি রাজদরবার মাড়াবেন না। চাটুকারদের মত বাদশাহদের সামনে আর কোনদিন তিনি স্তুতিবাক্য আওড়াবেন না এবং মিথ্যা অলীক প্রশংসা দ্বারা তাঁদের অনুগ্রহভাজন হওয়ার আকাঙ্ক্ষাও করবেন না। এই অযথা প্রশংসা করতে গিয়ে এর বিনিময়ে বকশিশের যে একটা মোটা অংক তাঁর হাতে

১. তাশ্‌কোপরা যাদাহ কৃত মিফতাহুস্ সা'আদাহ্ Edt. (Hyderabad 1911) ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩৪।

২. See Introduction of Nasaihul Kibar (The great admonitions) or al-Maqamat, pp 30—31. Also see Element Huarts' A History of Arabic Literature, Edited by Edmund Gosse PP. 262.

আলতো, তার মোহে পড়বেন না তিনি। মোটকথা, এই পার্থিব ফানী দরবার থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন রেখে এক অদ্বিতীয় ও অবিনশ্বর দরবারে ইলাহীর খাতায় নিজকে তালিকাভুক্ত করার তিনি দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করলেন।[১]

এসব আত্মকৃত অপকর্মের অনুভূতি তাঁকে নরকাগ্নির অনুতাপানলে দগ্ধ করতে লাগলো। তখন তিনি সেই দেশের মায়া মমতা ও অটুট বন্ধন ছিন্ন করে পবিত্র মক্কাভূমির যাত্রাপথে পাড়ি দিলেন।[২]

অতঃপর ৫১৬ হিঃ ১১১২ খৃীস্টাব্দের এক পুণ্য প্রভাতে সত্য সত্যই তিনি মহিমার প্রাণকেন্দ্র মক্কার পবিত্র মাটিতে পা দিলেন। ইবনু অহছাস সসম্মানে তাঁকে সম্বর্ধনা করলেন এবং সাদর সম্ভাষণের পর দারে সুলাই-মানীকে তার অবস্থান হিসেবে নির্দিষ্ট করলেন।[৩]

এখানে বসেই তিনি নব জীবনের অমৃতফল পুরোপুরি উপভোগ করেছেন। এখানে বসেই তিনি মুফাসসাল আতওয়াকুয যাহাব, ফাইক ফী গারীবিল হাদীস, মাকামাত প্রভৃতি ধর্মীয় পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। পরবর্তীকালে এখানেই তিনি মক্কার আমীর এবং তার অন্তরঙ্গ বন্ধু আশ্রয়দাতা আবুল হাসান উলাই বিন ঈসার পরামর্শে ৫২৮ হিজরীতে অবিস্মরণীয় অবদান আল-কাশশাফের রচনা শেষ করেন।[৪] তাফসীর বিজ্ঞানে যামাখশারী যে রীতিনীতি ও নিয়ম পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন সে সম্পর্কে জনাব মুস্তাফা

---

১. দেখুন যামখশারী কৃত আল্ মাকামাত : পৃষ্ঠা ৭-১০।

২. যামখশারী কৃত আতওয়াকুয যাহাব : পৃষ্ঠা ১৮৪ (Edited and Translated by C. Bashier de Meynard, Paris 1876.

৩. বিস্তারিতের জন্য দেখুন সাইয়েদ মুরতাযা যুবাইদী কৃত তাজুল আরূস : ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৩।

৪. পুরো নাম : আল্-কাশশাফ আন্-হাকা-য়িকত্তা-তানযীল ওয়া-উয়ূনুল আকাভীল ফী উজুহিত তাভীল (Ed. Nassar . Less Calcutta, 1865—1858.

আল-জুয়াইনী একটা সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেন। এর নাম 'মানহাতুত তাফসীর লিয যামাখশারী।' এটি মিসর থেকে প্রকাশিত হয়।

উপরিউক্ত গ্রন্থাবলী ছাড়াও যামাখশারীর নিম্নলিখিত কিতাবগুলো সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১. আল-মুহাজাত বিল মাসাইলিন্ নাহভীয়া।
২. রাবীউল আবরার ওয়া ফুসুসুল আখবার।
৩. আল্-আনমুদাজ ফী ইলমিল আরাবীয়া।
৪. আল্-মুফরাদ ওয়াল-মুয়াল্লাফ ফী আল্ মাসাইলিন নাহভীয়া।
৫. আল্-মুসতাকসা ফিল্-আমসালিল আরাবীয়া।
৬. আল-কাবুল জালীল আল-মুসাম্মা বি দিউয়ালিত-তামসীল।
৭. মুতাসানহু আসামী আর-রুআ'ত।
৮. মুকাদ্দামাতুল আদাব ফিল্ লুগাত।
৯. রুউসুল মাসাইলিল ফিকহিয়্যাহ।
১০. আল্ দুরুরুস সাফিরাহ ফী আল্ আমসালিন্ সায়্যিরাহ।
১১. শাকাইনুন নু'মান ফী হাকাইকিন নু'মান।
১২. আল কিসতাস ফী আল-উরুখ।[১]

মিসরের ডক্টর আহমদ মুহম্মদ আল হাওফী সাহেব যামাখশারীর বিস্তারিত জীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন।

ইবনু আতীয়া আল-গারনাতী

পুরো নাম আবু মুহাম্মদ আবদুল হক বিন আবি বাকর গালিব বিন আতীয়া আল-গারনাতী আল আন্দালুসী (ওফাত ৫৪২ হিজরী—১১৪৭খৃঃ)

১. See Life-sketch of Zamakhshari by Shaikh Ibrahim al-Dasuqi published at the end of Tafsir al-Kashshaf. Vol 3, PP 375, Cairo, 1951 and Nuzhatul Alibba fi tabaqatil-udaba, PP. 469.

একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ তাফসীরকার হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এছাড়া তিনি ই'জায সম্পর্কেও বই লিখেছেন। আল্লামা জালালউদ্দীন সুয়ূতী তাঁর 'আল-ইতকান' নামক গ্রন্থে নিম্নরূপ বরাত দিয়েছেন। ইবন্ আতীয়াহ বলেন : পবিত্র কুরআনের মু'জিযা সম্বন্ধে মূর্খ-পণ্ডিত নির্বিশেষে সবাই এ সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, ভাষাশৈলী, বাকরীতি গভীর তাৎপর্য ও অলংকার সবকিছুর মধ্যেই নিহিত রয়েছে এই ই'জাযের অনন্ত সম্ভাবনা। আল্লাহ্ পাক প্রতিটি শব্দেরই খুঁটিনাটি সম্পর্কে অগাধ জ্ঞানের মালিক। দুনিয়াতে এমন কোন বস্তু নেই, যা তার অগোচরে। তাই অতি সুন্দর, সার্থক ও নিখুঁত অর্থ চয়ন করে তিনি পবিত্র কুরআনের শব্দ সম্ভারকে সাজিয়েছেন। এর শাশ্বত সত্যকে কারও অস্বীকার করার জো নেই। আর মানুষ মাত্রই অজ্ঞ, ভ্রান্ত এবং অযোগ্য। তাই স্বভাবতই সকল প্রকার জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার কেউ কোনদিন দাবী করতে পারে না। মানুষ মাত্রেই না। তাই অলংকারে সার্বিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং স্বভাবের সার্বিক গুণাবলী একমাত্র পবিত্র কুরআনের রচনারীতির মধ্যেই সম্ভব। কুরআনের এই অতুল গুণাবলী ও অনুপম সৌন্দর্যের দিকে একটু লক্ষ্য করলেই আমরা অতি সহজে একথা বুঝতে পারি যে, কুরআনের মুকাবিলা থেকে আরবদের সরিয়ে রাখা হয়েছিল, এটা কত ভ্রান্ত এবং প্রমাদপূর্ণ মতবাদ। সত্যি বলতে কি, কুরআনের মুকাবিলা করা কোনদিনই কারো পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। একজন সৃষ্টিধর্মী পণ্ডিত তাঁর প্রবন্ধ অথবা কবিতাকে দীর্ঘ বহুদিন ধরে পরিবর্তিত, পরিমার্জিত বা কাটছাট করতে থাকেন এবং পরিশেষে এমন এক পর্যায়ে এসে উপস্থিত হন যে, তারপর কাট-ছাটের আর কোন সম্ভাবনাই থাকে না, পক্ষান্তরে পবিত্র কুরআন শুরু থেকেই এমন এক পর্যায়ে অধিষ্ঠিত যে, একে উন্নততর করার জন্য একটি শব্দ এমন কি একটি অক্ষরও অদল-বদল করা সম্ভব নয়।

কুরআনের বিভিন্নমুখী অনুপম গুণাবলী উপলব্ধি করা অনেক দিক দিয়েই সোজা, কিন্তু আবার বহুদিক দিয়ে দুর্বোধ্য এবং রহস্যময়ও বটে।

কারণ প্রাচীন আরবরা যে সাহিত্যিক ও আলংকারিক গুণে বিভূষিত ছিল, আজকের দিনের আরবারা তা হারাতে বসেছে।

আরবদের জন্য তাই কুরআনের চিরন্তন মু'জিযার একমাত্র দলীলই হচ্ছে এর রচনাশৈলীর আলংকারিক সৌন্দর্য, ভাষার মাধুর্য ও সাবলীলতা। যেমন হযরত মূসা (আঃ)-এর নবুওতের বৃহত্তম মু'জিযা ছিল তাঁর ইন্দ্রজালিক যাদুর পরশ। অনুরূপভাবে হযরত ঈসা (আঃ)-এর নবুওতের প্রধান মু'জিযা ছিল চিকিৎসাশাস্ত্রে (Medical Science) তাঁর সর্বতোমুখী পারদর্শিতা, কারণ যে যুগের লোক যে বিষয়ে প্রগতির চরম শিখরে আরোহণ করে, আল্লাহ্ পাক সে যুগের নবীকে উক্ত বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই সর্বোচ্চ মু'জিযা প্রদান করে থাকেন। এটা তার চিরাচরিত একটা নীতি।[১]

একথা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, ইবনু আতীয়াহ আল-গারনাতী ই'জাযের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে 'সারাফা' মতবাদকে তিনি আদৌ স্বীকার করতে পারেন নি। তিনি এ মত প্রকাশ করেন যে, কুরআনের শব্দ ও অর্থ সবই আল্লাহ্র নিজস্ব আর এটাও সর্ববাদীসম্মত যে, শব্দে ও অর্থে আল্লাহ্র পাণ্ডিত্যের কাছে আরব-অনারব কারোরই পাণ্ডিত্যের কোন তুলনা হতে পারে না। তাই আরবরা কুরআনের মুকাবিলা করতে সাহস করবে কিসের বলে ?

ইবনু আতীয়াহ কুরআনের ভাষাশৈলী ও রচনারীতিকেই এর ই'জায বলে মনে করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, কুরআনে সামগ্রিক অনুপমত্বই আল্লাহ্র অমোঘ বাণীর দলীল। পবিত্র কুরআনের শব্দকে তিনি তাই কোন মানবীয় শব্দের সাথে তুলনা করতে রাযী নন।

ইবনু আতিয়ার সুপ্রসিদ্ধ তাফসীরেও আমরা ই'জায সম্পর্কে তাঁর মতামত পাই।

১. আল-ইতকান : আল্লামা জালালউদ্দীন সুয়ূতী : ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৮।

কুরআনের ই'জায ও তার ইতিবৃত্ত

এই তাফসীরের পুরো নাম 'আল-মুহাররিরুল অজিয ফী তাফসীরি কিতাবিল আযীন'।

শ্রেষ্ঠতম ঐতিহাসিক ইবনু খালদূন (ওফাত ৮০৮ হিঃ—১৪০৬ খৃীস্টাব্দ) তাঁর মুকাদ্দিমায় এই লেখক সম্বন্ধে বলেন: ইবনু আতীয়া তাঁর কিতাবে সমস্ত মানবকুল তাফসীরসমূহের সার-সংক্ষেপ দিতে প্রয়াস পেয়েছেন। এই তাফসীরে তিনি ইচ্ছা করেই শুধু ঐ সমস্ত রিওয়ায়েতের কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলো অকাট্য দলীল-দস্তাবীজের দ্বারা প্রমাণিত। পাশ্চাত্য মহলে, বিশেষ করে আন্দালুসে তাঁর এই অনবদ্য তাফসীর বেশ সমাদর লাভ করেছে।[১]

ইবনু আতীয়ার এই তাফসীর মাখতুতাত' আকারে এখনও 'দারুল কুতুব-আল মিসরিয়্যাহ' এবং 'কুতুবখানা তাইমুরিয়া'তে সংরক্ষিত রয়েছে।

এই তাফসীরের একটি বিশিষ্ট গুণ হচ্ছে এই যে, সুযোগ্য তাফসীরকার এতে কোন অপ্রাসংগিক কথা আদৌ স্থান দেন নি। বরং শুধুমাত্র অতি প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে বেশ সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত করেছেন। তাফসীরী রিওয়ায়েতগুলোর মধ্য থেকে তিনি শুধুমাত্র সহীহ ও নিখুঁত বর্ণনাগুলোকেই গ্রহণ করেছেন। অবশ্য এ করতে গিয়ে তিনি স্থানে স্থানে 'তাবারী' থেকেও উদ্ধৃতি দিয়েছেন নিঃসংকোচে। কিন্তু 'তাবারী'র কোন কোন রিওয়ায়েত সম্বন্ধে তিনি আবার সমালোচনা এবং পর্যালোচনাও করেছেন।[৩]

প্রখ্যাত তাফসীরকার আবু হাইয়ান তাঁর সুপ্রসিদ্ধ তাফসীর 'বাহরুল মুহীতে'র মুকাদ্দিমা বা উপক্রমণিকায় ইবনু আতীয়ার এই তাফসীরকে

১. See Prolegmena of the Ibn Khaldun p. 491.

২. ব্রকলম্যান, ১ম খণ্ড; পৃষ্ঠা ৪১২; তাকমিলা; ১ম খণ্ড; পৃষ্ঠা ৭৩২।

৩. উর্দু ইনসাইক্লোপেডিয়া: ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১৭।

অতি উত্তম বলে অকুণ্ঠচিত্তে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয় তিনি এর অনুপম শৃংখলা-পদ্ধতি ও রচনারীতির ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন।

অতঃপর আবু হাইয়ান গারনাতী (৬৫৪—৭৪৫ হিঃ) ইবনু আতীয়ার এই তাফসীরকে যামাখশারীর কাশশাফের সংগে তুলনামূলকভাবে যাচাই করতে গিয়ে বলেনঃ "ইবনু আতীয়ার তাফসীর অত্যন্ত বিস্তৃত, অকাট্য এবং সম্পূর্ণ; পক্ষান্তরে যামাখশারীর তাফসীর অতি সংক্ষিপ্ত অথচ কতক পরিমাণে দুর্বোধ্য। (আবু হাইয়ান কৃত 'আল-বাহরুল মুহীত' ১ম (খণ্ডঃ পৃষ্ঠা ১০)

অনুরূপভাবে ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ আল-হাররাশী উপরিউক্ত তাফসীর-দ্বয়ের মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে বলেনঃ "ইবনু আতীয়ার তাফসীর যামাখশারীর তাফসীরের তুলনায় অনেক পরিমাণে শ্রেষ্ঠ। কারণ এর আলোচনা ও রিওয়ায়েতের মধ্যে সহীহ্ হাদীসকেই বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আর তা'ছাড়া মু'তাযিলা দৃষ্টিভংগী এবং শিরক বিদ'আতের প্রভাব থেকে ইহা অনেক পরিমাণে মুক্ত।"[১]

যেহেতু ইবনু আতীয়াহ ছিলেন আরবী ব্যাকরণের পণ্ডিত এবং একজন সুসাহিত্যিক, তাই পবিত্র কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রাক-ইসলামী যুগের কবিতার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। ব্যাকরণের কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখপূর্বক তিনি প্রায় প্রতিটি আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে অতি সহজ ও প্রীতিমধুর ভাষা প্রয়োগ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কিরয়াতের উল্লেখ ও তার অর্থগত পার্থক্যের কথাও অকপটে ব্যক্ত করেছেন।

তাফসীর তাবারী থেকে রিওয়ায়েত নকল করতে গিয়ে সেগুলোকে তিনি অন্ধভাবে অবনতমস্তকে স্বীকার করতে পারেন নি। বরং স্থানে

---

১. ফতওয়া ইবনু তাইমিয়া, ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ১৯৪ এবং ইবনু তাইমিয়ার মুকাদ্দিম উসুলিত তাফসীর, পৃষ্ঠা ২। আবদুর রাযযাক মালিহাবাদী অনূদিত।

স্থানে প্রয়োজনবোধে তিনি স্বাধীনভাবে সেগুলোর তীব্র সমালোচনা করেছেন। বলা বাহুল্য, এই তীব্র সমালোচনার জন্যই ইবনু আতীয়ার উপর মু'তাযিলার অপবাদ দেয়া হয়েছিল।—আসলে তিনি ছিলেন খাঁটি আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামা'আতের একজন বিশিষ্ট অগ্রনায়ক।

ইবনু আতীয়ার এই তাফসীর মুকাদ্দিমা ছাড়াই মোটা মোটা দশ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে এবং যুগ যুগ ধরে প্রতি মহলেই প্রত্যেকের কাছ থেকে সমভাবে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে এসেছে। দুঃখের বিষয় যে, বর্তমানে এই অমূল্য তাফসীরখানা পুনঃ প্রকাশের কোনখান থেকেই কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। অবশ্য এর মুকাদ্দিমা বা ভূমিকা কোন কোন প্রাচ্যবাদীর (Orientalist) প্রচেষ্টায় প্রকাশ পেয়েছে। মওলানা মুহাম্মদ হুসাইন যাহাবী বলেনঃ কাহেরার 'দারুল কুতুব আল-মিসরিয়া' নামক লাইব্রেরীতে এর চার খণ্ড এখনও পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তা' অতি বিশৃঙ্খলভাবে অর্থাৎ শুধু তৃতীয়, পঞ্চম, অষ্টম ও দশম খণ্ড বিদ্যমান রয়েছে। বাকী খণ্ডগুলো অন্য কোন লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য বলে এখনও আমরা অবগত হতে পারিনি।[১]

আবু সায়দ আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ সা'আলাবী (ওফাত ৮৭৬ হিঃ) তাঁর 'জাওয়াহিরুল হিসান' নামক তাফসীরে ইবনু আতীয়ার ভাষ্য থেকে এতো বেশী সাহায্য নিয়েছেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে একে তার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বললে আদৌ অত্যুক্তি হয় না। সা'আ'লাবী ছাড়া আরও অনেক ভাষ্যকার এ থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছেন।

ইসলাম ও মুসলিম জাহান

ইবনু আতিয়ার হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর মুহতারাম পিতা আবু বাকর গালিব বিন আতীয়ার তত্ত্বাবধানে, যিনি নিজে ছিলেন একজন

১. মুহাম্মদ হুসাইন যাহাবী কৃত 'আত্-তাফসীর আল মুফাসসিরুন' পৃঃ ২৪০ (১৯৬১ সালে কাহেরা থেকে প্রকাশিত)।

উ'চুদরের পণ্ডিত এবং কুরআনে হাফেজ। স্বীয় পিতা ছাড়া আল্লামা শাফাদী ও আবু আলী গাসসানী প্রমুখ বড় বড় মনীষীর কাছ থেকেও তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁদের কাছ থেকে হাদীস রিওয়ায়েতের অনুমতি নেন। অতঃপর তিনি ইলমে হাদীস ও অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষা-দানে ব্রতী হন। দেশ-বিদেশ থেকে অগণিত ছাত্রবৃন্দ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্ত করতে এসেছিলেন। ইবনু আতীয়াহ আন্দালুসের অন্তর্গত মুরাইয়া নগরে বহুদিন ধরে প্রধান বিচারকের পদ অলংকৃত করেন। এত ন্যায়নীতি ও ইনসাফের সাথে তিনি স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করেন যে, অতি অল্পদিনেই ঠিক যেন জংগলের আগুনের মতই তাঁর সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। একজন সুসাহিত্যিক এবং কবি হিসেবে মাঝে মাঝে তিনি কবিত্ব চর্চাও করেন।

ইবনু ফারহূন তাঁর 'দিবাজুল মুযাহহাব' নামক গ্রন্থে ইবনু আতীয়াকে মালিকী মযহাবের একজন প্রখ্যাত আলিম হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর জীবনীও লিপিবদ্ধ করেছেন।[১]

আল্লামা জালালউদ্দীন সুয়ূতী তাঁকে একজন খ্যাতিমান বৈয়াকরণিক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ আলিম বলে অভিহিত করেছেন।[২]

ইবনু রুশদ (Averroes)

স্পেনের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক আবুল ওলীদ মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন মুহাম্মদ ইবনু রুশদ (ওফাত ৫৯৫ হিঃ—১১৯৮ খৃঃ) তাঁর 'ফাসলুল মাকাল' নামক অন্যতম পুস্তকে কুরআনের ই'জায সম্পর্কে এমন কতগুলো সুন্দর

১. ইবনু ফারহূন কৃত 'দিবাজুল মুযাহহাব': পৃষ্ঠা ১৭৪।
২. 'বুগিয়াতুল উআ'ত ফী ত্বাবাকাতিন নুহাত' আল্লামা সুয়ূতী, পৃষ্ঠা ২৯। মাসিক 'আর রাহীম' হায়দ্রাবাদ (উর্দু পত্রিকা) সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ সাল, পৃষ্ঠা ২৪৩।

উক্তি করেছেন, যা ইতিপূর্বে কোন দার্শনিক করেছেন বলে মনে হয় না। মুসতাফা সাদিক আর-রাফেয়ী ই'জাযুল কুরআনে' ইবনু রুশদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন: ইবনু রুশদ একথা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে, কুরআনই সর্বপ্রথম এবং শিক্ষা-দীক্ষার দিক দিয়ে ম্যাজি-ককে সুদূরে নিক্ষেপ করে লজিকের বুনিয়াদ পত্তন করেছেন। হযরত মূসা (আঃ) প্রমুখ নবীর মু'জিযার ভিত্তি ছিল অনেকটা এই ম্যাজিক বা ইন্দ্র-জালের উপর। ম্যাজিক মানুষকে সাময়িকভাবে মুগ্ধ করতে পারে সত্য, কিন্তু স্থায়ীভাবে মানুষের মনে দাগ কাটিতে পারে না। ইবনু রুশদ বলেন: ইহা কুরআনের ই'জাযের একটা প্রধানতম অংশ।[১]

ইবনু রুশদের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়েছিল আশ'আরী পদ্ধতিতে মালিকী মযহাব অনুযায়ী। তাই জীবনের প্রথম অধ্যায়ে তিনি কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, ইলমুল কালাম (Scholastic theology), অলংকারশাস্ত্র, ইসলামের ইতিহাস ইত্যাদিতেই অসামান্য ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। তার-পর তিনি আয়ত্ত করলেন ইবরানী ও ইউনানী ভাষা। শুধু তাই নয়, দর্শন, তর্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, ইলমে তিব এবং রিয়াযী বা অংক শাস্ত্রেও তিনি অতি অল্প দিনে বিপুল পারদর্শিতা অর্জন করে ফেলেন। এভাবে পরবর্তী শিক্ষার দিকে তিনি এতদূর ঝুঁকে পড়েন যে, আগের সেই আশ'আরে' শিক্ষা পদ্ধতির বিরূপ সমালোচনা করতে শুরু করলেন। অবশেষে খলীফা আল্-মনসুরের শাহী দরবারের সংস্পর্শে এসে তিনি অ্যারিস্টটলের ফালাসাফার খোলাসা লিখতে উঠে-পড়ে লাগলেন।[২]

এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে ইমাম গাযযালীর 'তাহাফুতুল ফালাসিফা' (Inco-herence of philosophy) নামক কিতাবের প্রতি-উত্তরে ক্ষুরধার লেখনী চালিয়ে তিনি 'তাহাফুতুল তাহাফাত' নামক গ্রন্থ রচনা করলেন। এতে করে মুসলিম জগতে তাঁর দুর্নাম রটে গেল অতি ব্যাপকভাবে। অতএব বিভিন্নমুখী

---

১. মুসতাফা সাদিক আর-রাফেয়ী: পৃষ্ঠা ২৮১।

২. See for details the articles on Ibn Rushd by Prof. Rinan, a French scholar.

প্রতিকূল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এহ স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ইবনু রুশ্‌দ তাঁর পূর্ববর্তী শিক্ষা ও চিন্তাধারায় কায়েম থাকলে ইসলামের যথেষ্ট খিদমত আনজাম দিয়ে যেতে পারতেন। বিশেষ করে ই'জাব শাস্ত্র সম্পর্কে তিনি সার্থক এবং বেশ একটা উল্লেখযোগ্য অভিমত রেখে যেতে পারতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর পরবর্তী জীবনে এদিকে মনোসংযোগ অপেক্ষা তাঁর উপেক্ষাই ছিল ঢের বেশী।

তাঁর অমর অবদান 'ফাসলুল-মাকাল' এ কথার জ্বলন্ত স্বাক্ষর যে, ইসলামের প্রতিটি শাস্ত্র সম্পর্কেই তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ছিল কত গভীর। শরীয়ত ও ফালাসাফার মাঝে যে যোগসূত্র রয়েছে তিনি তা বোঝাতে চেয়েছেন এই পুস্তকের মাধ্যমে। এটাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। এই বইটি সর্বপ্রথম ইউরোপে প্রকাশ পায় এবং তাঁদেরই সাহায্যে আমাদের হাতে আসে। এই গ্রন্থকে ইংরেজীতে ভাষান্তরিত করেছেন জর্জ এফ. হাউরানী। এটি ১৯৬২ সালে বৈরূত থেকে প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়াও ইসলামী ভাবধারায় সমৃদ্ধ বহু কিতাব তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাঁর জীবনের প্রথম অধ্যায়ে। যেমন :

১. বিদায়াতুল মুজতাহিদ নিহায়াতুল মুকতাসিদ্।

২. খুলাসাতুল মুসতাফা।

৩. মিনহাজুল আদিল্লাহ।

৪. তাহসীল।

৫. মুকাদ্দিমাত।

৬. রিসালাহ।

এছাড়াও ইসলামে তিব বা চিকিৎসা বিদ্যা, রিয়াযী বা অংকশাস্ত্র, ফালাসাফা বা দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি এত বেশী বই লিখেছেন এবং জ্ঞান চর্চা করেছেন যে, তাঁর লিখিত গ্রন্থমালার সঠিক তালিকা আজও নির্ণীত হয়নি। তাঁর বহু গ্রন্থের হস্তলিপির আজও অস্তিত্ব রয়েছে এবং কতকগুলোর আরবী, জার্মান, ল্যাটিন ইত্যাদি সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে।

ইবন্ রুশদ বলেন : বিশ্বনবীর (সঃ) আমন্ত্রবাণী ও শিক্ষার দিকে আমাদের লক্ষ্য ও দৃষ্টি না ফিরালে কোনই গত্যন্তর নেই। তিনি আরও বলেন যে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে আমাদের দু'ভাবে গ্রহণ করতে হবে। অশিক্ষিতদের জন্য আক্ষরিক অর্থে আর সুধী-সজ্জনদের জন্য রূপক অর্থে। কারণ সুধী-সজ্জনদের জন্য কুরআনের এই রূপক অর্থ দার্শনিক মতবাদের আলোকে উপলব্ধি করাই সম্ভব।[১]

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, হিজরী ছয় শতক এবং খ্রীস্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দী এ ভাবেই অতিবাহিত হয়েছে ই'জায শাস্ত্রকে কেন্দ্র করে। এই শতাব্দীতে বড় বড় মনীষীরা ই'জায শাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের একনিষ্ঠ জ্ঞান-সাধনা ও ক্ষুরধার লেখনী দ্বারা। আমরা একথা আগেই আলোচনা করেছি। এ যুগের ইমাম গাযযালীই সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক উপায়ে ই'জাযের মতবাদকে উল্লেখ করেছেন। কাযী আইয়ায ও ইবন্ রুশ্দ প্রমুখ মনীষী ইমাম গাযযালীরই অনুকরণ করেন। এমন কি ইবনু আতীয়াহ প্রমুখ তাফসীরকারও ই'জায শাস্ত্রে নতুন কোন কিছু সৃষ্টি না করে ঠিক যেন গতানুগতিকভাবেই পূর্বসূরিদের অনুসৃত নীতিকে অবলম্বন করেছেন এবং তাঁদেরই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন। পক্ষান্তরে এ যুগের একজন সৃষ্টিধর্মী লেখক আল্লামা যামাখশারী তাঁর তাফসীরে কাশ্শাফ-এ ব্যাপারে একটা অভিনব অভিব্যক্তির অবতারণা করেছেন। সেটা এই যে, আলংকারিক বৈশিষ্ট্যই পবিত্র কুরআনের একমাত্র মু'জিযা। কিন্তু এই সঙ্গে তিনি একটা আজব বস্তুও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : কুরআন অমর মু'জিযা, কিন্তু একে 'মাখলুক' বা সৃষ্ট বলে না মানলে এ মু'জিযা হতে পারে না। কারণ অসৃষ্ট বস্তুর মুকাবিলার জন্য চ্যালেঞ্জ দেয়া আদৌ সম্ভবপর নয়।

১

হিজরী সাত শতক—খ্রীস্টাব্দ তের শতক

ই'জায শাস্ত্র সম্বন্ধে এই শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হচ্ছেন ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী। তিনি ছিলেন একাধারে মুফাসসির (Exegetic or

১. বিস্তারিতের জন্য দেখুন : মাকালাতে শিবলী, ৫ খণ্ড : পৃষ্ঠা ১৮-৬১।

commentator of the holy Quran) এবং মুতাকাল্লিম বা ধর্মতাত্ত্বিক (scholastic theologian)। ইমাম সাক্কাকী ছিলেন সাহিত্যিক এবং অলংকারশাস্ত্রের নামকরা পণ্ডিত। ইবনু আরাবী ছিলেন এ যুগের সূফী পণ্ডিত। আলী আল-আমিদী এবং হাযিম কারতাযানী ছিলেন মুতাকাল্লিম।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী

আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ফখরুদ্দীন ইবনুল খাতীব উমরা বিন হুসাইন আররাযী (ওফাত ৬০৬ হিঃ—১২০৯ খৃঃ) তাঁর বিভিন্ন কিতাবের মাধ্যমে কুরআনের ই'জায সম্পর্কে আলোচনা করেন। পণ্ডিত আবদুল আলীম বলেনঃ ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী প্রকৃত প্রস্তাবে ই'জাযের কোন নতুন মতবাদ আনয়ন করেন নি বরং তিনি শায়খ জুরজানীর 'আসরারুল বালাগা', এবং 'দালাইলুল ই'জায' নামক পুস্তকদ্বয়ের খোলাসা বা সার-সংক্ষেপ দিয়েছেন মাত্র। স্বীয় 'নিহায়াতুল ই'জায ফী দিরায়াতিল ই'জায' নামক গ্রন্থে তিনি শায়খ জুরজানীর কথাগুলোকে আরও সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত করেছেন। ই'জায শাস্ত্রের জ্ঞাতব্য বিষয় তাই এ যুগের পাঠকদের জন্য অতি সহজ ও সুগম হয়ে উঠেছে। ইমাম রাযী তাঁর অন্যতম তাফসীর 'মাফাতীহুল গায়ব' বা তাফসীরে কাবীর নামক গ্রন্থেও এই শাস্ত্র নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এ ছাড়া ইলমে কালামের উপর তার 'মাআ'লিম উসূলিদ-দ্বীন' এবং 'আফকারুল মুতাকাদ্দিমীন' নামক পুস্তকদ্বয়েও ই'জায সম্বন্ধে তিনি বাহাস করেছেন। ইমাম রাযী বলেনঃ

"স্পষ্টবাদিতা, রচনা পদ্ধতির অভিনবত্ব এবং অন্যান্য দোষত্রুটি থেকে মুক্ত থাকার মধ্যেই কুরআনের ই'জায নিহিত রয়েছে।[১]

ইমাম রাযীর 'নিহায়াতুল ই'জায ফী দিরায়াতিল ই'জায নামক পুস্তকের নিম্নরূপ সার-সংক্ষেপ দেয়া যেতে পারে।

---

১. আল্লামা সুয়ূতী কৃত আল-ইতকানঃ ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৯, মুস্তফা হালাবী প্রেস, মিসরঃ ১৯৫১ খৃঃ।

তিনি বলেনঃ ই'জায শাস্ত্র সম্পর্কে সাধারণত চারটি মতবাদ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। প্রথম মতবাদ হচ্ছে 'সারাফা'—যে মতবাদকে তিনি আন্নাযযামের অনুসরণ করে বিশ্লেষণ করেছেন। অতঃপর ইমাম রাযী এই 'সারাফা' মতবাদকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে বলেনঃ কুরআনের মুকাবিলা হতে আরবদের যদি সত্যই সরিয়ে রাখা হতো, তবে তারা এর অনুপম আলংকারিক বৈশিষ্ট্য এবং অন্যান্য গুণাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কখনোই এতটা বিস্ময়াবিষ্ট হত না। কারণ 'সারাফা' (deflection) মতবাদ অনুসারে কুরআনের অন্তর্নিহিত উপযুক্ত ধারাকে আকণ্ঠ পান করার কোন ক্ষমতাই তো তাদের ছিল না। কিন্তু আসল ব্যাপারটাই এখানে সম্পূর্ণ উল্টো।

ই'জাযের দ্বিতীয় মতবাদ যে বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত তা হচ্ছে এই যে, পবিত্র কুরআনের রচনারীতি এবং অন্যান্য কবিতা ও বাগ্মিতার মাঝে যে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়—সেটাই হচ্ছে কুরআনের ই'জায। ইমাম রাযী এই মতবাদ খণ্ডনকল্পে পর পর পাঁচটি কারণ দেখিয়েছেন।

(ক) একটা অভিনব সাহিত্যিক রচনারীতির সূচনা কোনদিনই মু'জিযা হতে পারে না। কারণ তাহলে তো আরব কবির মুখনিঃসৃত প্রথম কবিতাটিই মু'জিযা হয়ে দাঁড়াতো।

(খ) একথাও অর্থহীন যে, একটা বিশিষ্ট ও অভিনব স্টাইল বা রচনারীতির মুকাবিলা করা চলে না।

(গ) মুসায়লামা কায্যাবের জাল কুরআনও একটা মু'জিযা হয়ে দাঁড়াতো। কারণ আপাতদৃষ্টিতে আসল কুরআনের সঙ্গে তো এর সাদৃশ্য ছিলই। হোক না সে সাদৃশ্য অতি নগণ্য।

(ঘ) পবিত্র কুরআনের আয়াত ولكم فى القصاص حيوة মুসায়লামা রচিত জাল-কুরআনের অনুরূপ আয়াতের অর্থের সঙ্গে (যেমন একটি মৃত্যু অন্য মৃত্যুর নিরসনকারী) সাদৃশ্যজনক। অতএব ইহাও মু'জিযা। কারণ ইহা অন্যান্য লিখিতাংশকে পৃথক করে।

(ঙ) আরবরা কুরআনের যে বর্ণনা দিয়েছে তা ঠিক নয়। কারণ ইমাম রাযী তৃতীয় মতবাদের বরাত দিয়েছেন যে, কুরআন বৈপরীত্য থেকে মুক্ত এবং এই সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এর ই'জায বা মু'জিযা। তিনি এই থিওরীকে কবুল করতেও রাযী নন। তাই তিনি বলেন যে, যদি ইহা সত্য হতো, তবে বৈপরীত্য থেকে মুক্ত বহু লেখা এবং ভাষণও এই ই'জাযের শামিল হয়ে দাঁড়াতো।

ইমাম রাযী চতুর্থ থিওরীর এভাবে হাওয়ালা দিয়েছেন যে, কুরআন যে সমস্ত গায়েব বা অদৃশ্যের খবর দিয়েছে সেগুলোর উপরই কায়েম রয়েছে এর মু'জিযা। এই মতবাদকেও তিনি প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে বলেন: এই থিওরী সমস্ত আয়াতের উপর প্রযোজ্য হতে পারে না। কারণ সব আয়াত তো আর গায়েবের খবর দেয় না। অতএব রাযী একথা সমর্থন করেন যে. কুরআনের ই'জায সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে এর আলংকারিক অনুপম বৈশিষ্ট্যের উপর। এতে করে এমন একটা মানদণ্ড বা কষ্টিপাথরের উপর ই'জাযকে দাঁড় করানো যায়, যার মাধ্যমে কুরআনের সব আয়াত সমভাবে প্রযোজ্য হতে পারবে। অবশ্য এ করতে গিয়ে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী মনীষীদের ন্যায়ই ভ্রান্তির বশবর্তী হয়েছেন। কারণ একই দৃষ্টিকোণ নিয়ে পবিত্র কুরআনকে পর্যবেক্ষণ করা ঠিক হয় না। তাই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিরীক্ষণ করলে কুরআনের প্রতিটি আয়াত নিশ্চয়ই বিভিন্ন রূপমাধুর্য, বিচিত্র ছন্দবন্ধ ও বৈশিষ্ট্য এবং রূপ-রস গন্ধ নিয়ে ইমাম রাযীর নয়ন সম্মুখে ভাস্বর হয়ে প্রতিভাত হতো।

যাই হোক, ইমাম রাযী তাঁর যে সমস্ত গ্রন্থে ই'জায শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন সেগুলো এই:

১. নিহায়াতুল ই'জায ফী দিরায়াতিল ই'জায।

---

১. تتبع الدم بالقود مطلب الدم مالقود - العقاب

আল কিসাস' অর্থাৎ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য হত্যার যে দাবী, এর মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জীবন (সূরা বাকারা : ১৭৯ আয়াত)

২. মাফাতীহুল গায়ব বা তাফসীরে কাবীর (সূরা আল-ফাতিহা ছাড়াই দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত)।

৩. মাআলিমু উসূলিদ-দীন (The outlines of the principles of the faith)।

৪. মুহাসসালু আফকারিল মুতাকাদ্দিমীন (The Summery of the views of predecessors)। এ ছাড়া তাঁর নিম্নলিখিত কিতাবগুলোও বেশ প্রণিধানযোগ্য।

১: مناقب امام شافعی رح

২. তাফসীর সূরাতিল বাকারা আলা ওয়াজহিল আকলী।

৩. রিসালা ফী আসরারিল কুরআন।

৪. তাফসীর আসমাইল্লাহিল হুসনা।

৫. তাফসীর সূরাতিল ইখলাস।

৬. দুররাতুত তানযীল ওয়া গুররাতুত তাভীল ফী আয়াতিল মুতাশাবিহাত।

৭. আল-বুরহান ফী কিরাতিল কুরআন।

৮. নাকদুত-তানযীল।

৯. আল মিসকুল আবীক ফী ইউসুফ সিদ্দীক।

এতগুলো কিতাবের মধ্যে 'মাফাতিহুল গায়ব' বা 'তাফসীরে কাবীর'কে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ে, একদম মরণ সাগরের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে এবং এটাই হচ্ছে তাঁর অবিস্মরণীয় অমর অবদান (Masterpiece)। একে শুরু করেছিলেন তিনি হিজরী ৫৫৯ সালে এবং সূরা 'আল-ফাতাহ' পর্যন্ত তফসীর লিখার পর একে অসমাপ্ত রেখেই অবসর গ্রহণ করতে হয়েছিল। অতঃপর এই আরব্ধ কার্যকে সমাপ্ত করেছেন

শায়খ নাজমুদ্দীন আহমদ (ওফাত ৭৭৭ হিঃ) এবং কাযী শিহাবুদ্দীন বিন্ খালীল আদ-দিমাশকী (ওফাত ৬৩৯ হিঃ)।

ইমাম রাযীকে এই গ্রন্থ লিখতে গিয়ে সুদীর্ঘ ৮ বছর ধরে কলম চালাতে হয়েছে অস্থির এবং অবিশ্রান্ত গতিতে। তবুও নিশ্চিত মনে এক জায়গায় বসে নয়। বরং পথচারী মুসাফিরের বেশে, একান্ত প্রতিকূল ও নিঃস্ব অবস্থায়। এক জায়গায় তিনি স্বয়ং লিখেছেনঃ

৬০১ হিজরীর শনিবারে আমি (সূরা ইউনুসের) তাফসীর খতম করি। আমি তখন প্রিয়পুত্র মুহাম্মদের অকাল মৃত্যুতে একেবারেই মুহ্যমান অবস্থায় ছিলাম।

এমন কি সূরা ইউসুফের তাফসীর শেষ করতে গিয়ে তার শোকসন্তপ্ত অন্তরের আবেগ উচ্ছাসকে সন্তর্পণ করতে না পেরে একটি দীর্ঘ কবিতা দ্বারা তিনি উক্ত সূরার ছেদ টেনেছেন। কবিতার শেষ পংক্তিটি এইঃ

"হে বৎস! তোমার মৃত্যুর পর আমার বেঁচে থাকায় কোন লাভ নেই; বরং এই উপর্যুপরি পরিতাপ, দুঃখ ও যাতনার চাইতে মৃত্যুই শতগুণে শ্রেয়।" এত যে দুঃখ-দৈন্যের চাপ, এতো শোকসন্তপ্ত আর এত উপর্যুপরি পরিতাপ এবং চারদিকের ফিতনা-ফাসাদের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকা সত্ত্বেও তার কলমের ডগা দিয়ে যা কিছু প্রকাশ পেয়েছে, পরবর্তী যুগে তা সকলের কাছে পরশমণিরূপে অবাধে স্বীকৃতি লাভ করেছে। পরবর্তী যুগের আলিমরা গড়পরতায় তাঁর লিখার পরিমাণ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেন যে, দৈনিক তিনি বিশ পৃষ্ঠার কম লিখতেন না। অথচ 'রায়' নগরে প্রায় দৈনন্দিন অলংকারপূর্ণ বক্তৃতা, ফতওয়ানবীশি এবং খাওয়ারিযমের শিক্ষাকেন্দ্রে দেশীয় ও দূরাগত হাজার হাজার শাগরিদের সামনে সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয় নিয়ে অধ্যাপনার কাজ তাঁর সব সময়েই লেগে থাকতো। তাঁর জীবনের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, দুঃখ-দৈন্য হর্ষ-বিষাদ ইত্যাদি সকল অবস্থার সাথেই তিনি নিজকে খাপ খাইয়ে (adjust) নিতে পারতেন। এজন্যই তার আশহাবে কলম (লেখনীর অশ্ব) অনবরত চলতেই থাকত। হামাসার কবি কি আর সাধে গেয়েছেনঃ

অর্থাৎ বর্শার সুতীক্ষ্ণ ধারে ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার অবস্থায়ও আমি তোমায় ইয়াদ করে থাকি, আর এদিকে নেযা ও বল্লমগুলো আমার টাটকা রক্ত পানে পরিতৃপ্ত হয়।"

তাফসীর কাবীর লিখতে গিয়ে ইমাম রাযী সাধারণত মাল-মসলা গ্রহণ করেছেন আবু মুসলিম ইস্পাহানীর (ওফাত ৩২২ হিঃ) ১৪ খণ্ড বিশিষ্ট তাফসীরে কুরআন থেকে এবং কাবীর (ওফাত ৩০৯ হিঃ) ১২ খণ্ড বিশিষ্ট তাফসীর থেকে। এরা উভয়েই ছিলেন মু'তাযিলা পন্থী। ইমাম রাযী মাঝে মাঝে আবু মুসলিমের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কীর্তনও করেছেন। যেমন সূরা 'আলে ইমরানে'র তাফসীর লিখতে এক স্থানে তিনি লিখছেন :

অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন এই আবু মুসলিম তাফসীর সম্পর্কে খুব ভালো ভালো কথা বলেন।[১]

ইমাম রাযীর এই তাফসীর কাবীরের একটি বিশিষ্ট গুণ এই যে, অত্যন্ত জটিল এবং দুর্বোধ্য বিষয়কেও তিনি অতি সহজভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন, সম্ভবত এদিক দিয়ে কোন আলিমই তাঁর সমকক্ষতা লাভ করতে পারবে না। সূরাতুল বাকারায় চ্যালেঞ্জের শেষ (২৩ ও ২৪ নম্বর) আয়াতের তাফসীরে তিনি বলেন যে, পবিত্র কুরআনের মুকাবিলার জন্য আল্লাহর কাছ থেকে তাঁর রসূলে করীম (সঃ)-এর মুখে স্পষ্টাক্ষরে মুহুর্মুহু চ্যালেঞ্জ এসেছিল বহুবার বিভিন্ন রকমে। প্রথমে আরবদের সমগ্র কুরআন অথবা এর বৃহদাংশের মুকাবিলার জন্য চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছিল। এতে অপারগ হলে কুরআনের একটা ক্ষুদ্রতম অংশের সাথে তাদের চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়। কিন্তু এতেও তাদের অক্ষমতা প্রকাশ পেল। তাই পরিশেষে সূরা কাউসারের মত কুরআনের একটা ক্ষুদ্রতম সূরার অনুরূপ অলংকারপূর্ণ বাণী তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা দ্বারা রচনা করে নিয়ে আসতে বলা হয়। ইমাম রাযী চ্যালেঞ্জ সম্বন্ধীয় এই ঘটনাপঞ্জীর এত সুন্দর ও

---

১. মোল্লা কাতিব চাল্‌পি কৃত কাশফুয যুনূন, তাফসীর অধ্যায়, পৃষ্ঠা ২২৮—২৩২।

স্বচ্ছভাবে বর্ণনা করেছেন যে, সত্যিই তার তুলনা মেলে না। ই'জাযের মতবাদে তিনি অনেকটা আল-বাকিল্লানী এবং আল্ গাযযালীর অভিমতের অনুগমন করেছেন। আমীন আল খওলী বলেন: ই'জাযের প্রশ্নে বৈজ্ঞানিক উপায়ে আলোচনার জন্য ইমাম রাযীকে নির্ভরযোগ্য অথরিটি হিসেবে মনে করা হয়।[১]

'মাফাতিহুল গায়ব' ছাড়াও মাফাতিহুল উলূম এবং তাফসীর সূরা ইখ্লাস নামে আরও দুটো তাফসীর রয়েছে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী লিখিত।

তিনি ই'জায প্রসঙ্গে 'জাব্র (constramt) মতবাদকে নিয়েও সুদীর্ঘ আলোচনা করেন। তিনি বলেন: কুরআনের মুকাবিলার জন্য আরবদের যে চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছিল এর দ্বারাই 'জাবর' মতবাদ বানচাল হয়ে যায়। কারণ মানুষ যদি তার প্রতি আরোপিত কাজকে সুচারুরূপে সমাধা করতে যোগ্যতার অধিকার না রাখে, তবে তাকে চ্যালেঞ্জ দেয়া সমীচীন হবে কি করে ?

ইমাম রাযী তা'র জীবনের শেষ মুহূর্তে মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় কতকগুলো মূল্যবান কথা বলে গেছেন: বাস্তবিকই আমি কথাবার্তার বহু রীতি-নীতি এবং দর্শন শাস্ত্রের বহু সুগম পথ পরীক্ষা করেছি। কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কুরআন কারীমের মধ্যে যে প্রভূত উপকার প্রাপ্ত হয়েছি, অন্য কোথাও তা পাইনি। কারণ উহা আল্লাহ পাকের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব পূর্ণরূপে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে এবং প্রতিবাদ ও বিপক্ষতার পাকে ডুবে যাওয়া থেকে বাধা প্রদান করে।[২]

---

১. আমীর আল্ খওলী কৃত 'আত তফসীর অমায়ালিমু হায়াতি হী' পৃষ্ঠা ২০।

২. বিস্তারিতের জন্য দেখুন: উয়ুনুল ইনবা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা; ২৩. ইবনু খাল্লিকান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬০০; আখবারুল হুকামা, পৃষ্ঠা ১৯০ তাশ্ কোপরা।

মোটকথা তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, মুহাদ্দিস, ফকীহ, মুফাসসির, তার্কিক প্রভৃতি বহুগুণে ভূষিত। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের সমগ্র বিশ্বসভ্যতা তাঁর কাছে বহুল পরিমাণে ঋণী।

আস্-সাক্কাকী

আবু ইয়াকুব ইউসুফ বিন আবী বাকর বিন মুহাম্মদ বিন্ আলী আল্ খাওয়ারিযমী আস্-সাক্কাকী (ওফাত ৬২৬ হিঃ—১২২৮ খৃঃ) তাঁর চমৎকার গ্রন্থ 'মিফতাহুল উলুম'-এ ই'জায শাস্ত্র নিয়ে বেশ সুন্দর আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর এই আলোচনায় আবদুল কাহির আল-জুরজানীর পরিত্যক্ত পথ ও ভাবধারাকে অবলম্বন করে তাঁরই অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করার প্রচেষ্টা নিয়েছেন। অবশ্য এ করতে গিয়ে তাঁকে একটা নতুন বিষয়বস্তুও সংযোজিত করতে হয়েছে। এটা হচ্ছে 'ইল্মে বদী' বা অভিনব সাহিত্যরীতি (Unique literary style)।১

যাদাহ্ কৃত মিফতাহুস সা'আদাহ, প্রথম খণ্ড, মাকালাতে শিবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২—৪৮।

১. অবশ্য সাক্কাকীকে 'ইলমে বাদীর' প্রবর্তক বললে ভুল হবে। কারণ ইল্মে বাদী সম্পর্কে সর্ব প্রথম বই লিখেন ইবনুল মুতায়েব আব্বাসী ইবনু দুরাইদ, আস্-জাহিয এবং কুদামা বিন জাফর আল-কাতিব। ১৯৩১ সালে ইবনুল মুতায়েব এই পুস্তকটির তরজমা ও সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন ক্র্যাচোকোভসকী (Krachokovsky 1883—1951)। ইনি রাশিয়ার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রাচ্যবাদী পণ্ডিত। প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত Victor Romanovich Rosen-এর ছিলেন অতি প্রিয় শাগরিদ এবং তাঁরই মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি আরবী শিক্ষায় ব্রতী হয়েছিলেন। শিক্ষার প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিলো এতো বেশী যে, ছাত্র জীবনেই তিনি প্রায় ডজনখানেক ভাষা আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন। অতঃপর তিনি দশ শতকের কবি উৎবীর উপর থিসিস লিখতে শুরু করেন।

এর মধ্যে রূপক ও দ্ব্যর্থ বাক্য ইত্যাদি এসে পড়ে। শায়খ আল্-জুরজানী কিন্তু এ নিয়ে কোন আলোচনা করেন নি। তাই ইমাম সাক্কাকী এই পরিত্যক্ত কার্যকে সম্পাদন করেছেন অতি নিপুণভাবে। এ ছাড়া তিনি অলংকার শাস্ত্রকে এমন একটা নিয়মতান্ত্রিক পর্যায়ে উন্নীত করেন, যা তাঁর পূর্বপুরুষেরা করেন নি এবং পরবর্তী যুগের মনীষীরা এ ব্যাপারে সাক্কাকীরই পদাংক অনুসরণ করেছেন।

এ পথে সাক্কাকীও ঠিক অনুরূপভাবেই তাঁর পূর্বসূরিদের অনুসৃত আদর্শ ও মশালকে হাতে নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন।

আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, পবিত্র কুরআনের মু'জিযাকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে যাচাই করার জন্য যেহেতু অলংকার শাস্ত্র একটা মাপকাঠি বা কষ্টিপাথরস্বরূপ, তাই কুরআন পাককে কেন্দ্র করেই উদ্ভব হয়েছে অলংকার শাস্ত্রের। এই শাস্ত্র সম্পর্কে সর্বপ্রথম বই লিখেন খালীল বিন্ আহমদ আল্ফারাহীদির (ওফাত ১৬০ হিঃ) প্রিয় শাগরিদ আবু ববায়দা মা'মার বিন্ মুসান্না (ওফাত ২১০ হিঃ)। যাই হোক, এই সবগুলো অর্থাৎ ইলমে মা'আনী, ইলমে বায়ান, ইলমে বাদী ইত্যাদিকে একত্রিত করে সর্বপ্রথম বই লিখেছেন আবু ইয়াকুব আস্-সাক্কাকী। এরই নাম 'মিফতাহুল উলূম'। এর শারাহ লিখেছেন আল্লামা কুতুবুদ্দীন।

১৯০৮ সালে অধ্যাপক Krachokovsky মধ্যপ্রাচ্য পরিভ্রমণে বহির্গত হন। বৈরুতকে কেন্দ্র করে শ্যাম, ফিলিস্তিন, ইরাক, মিসর প্রভৃতি আরব রাজ্যে সফর শেষ করেন। এরূপে আরব ভূমির বুকে পূর্ণ দুটি বছর অবস্থান করার ফলে তিনি আরবী ভাষায় অনর্গল কথা বলতে শেখেন। জন্মভূমি রাশিয়ায় প্রত্যাগমনের পর আরবী পাণ্ডুলিপিসমূহের সম্পাদনা ও সংগ্রহেই তাঁর কর্মবহুল জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। এক সময় তিনি ১০০ হিজরী বা ৭১৯ খৃস্টাব্দে লিখিত একটা অতি দুষ্প্রাপ্য আরবী পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেছিলেন। তাই মনে হয়, প্রাচীন ও আধুনিক যুগের আরবী পাণ্ডুলিপিগুলোর নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

আস্-সাক্কাকী তাঁর মিফতাহুল উলূমে (শায়খ জুরজানীর অনুকরণ পূর্বক) বলেন : কুরআনের চিরন্তন মু'জিযাকে সম্যক উপলব্ধি করতে হলে সাহিত্যিক ও আলংকারিক কতকগুলো গুণের সমাবেশ থাকা একান্ত প্রয়োজন। কারণ একে শুধু অন্তর দিয়ে উপলব্ধি ও অনুভব করা সম্ভব। আর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে অপরের সামনেও তুলে ধরা চলে।

অতঃপর আস-সাক্কাকী এই অভিমতকে পরিত্যাগ করে বলেন : আমাদের একথা মনে রাখা উচিত যে, ই'জাযের প্রশ্নটা অতি জটিল, দুর্ভেদ্য এবং রহস্যময়। আলংকারিক এবং সাহিত্যিক অভিরুচির মাধ্যমেই একে অনুভব করা চলে কিন্তু ভাষায় বা শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করা চলে না। কথার লালিত্য, ছন্দ ও বাক্যের অর্থগত গঠন প্রণালী আর এই 'ফাসাহাত' 'বালাগাত' সম্পর্কে যাদের কোন অভিজ্ঞতা ও অনুশীলন নেই কুরআনের অন্তর্নিহিত ই'জাযকেও উপলব্ধি করা তাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়।[১]

কুরআনের ই'জাযের উপর তাঁর সময় পর্যন্ত যতগুলো মতবাদ পেশ করা হয়েছিল, তিনি মনোনিবেশপূর্বক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সেগুলোর বিরোধিতা করেন এবং বলেন : এ সম্পর্কে মতবাদ রয়েছে চারটি আর পঞ্চম মতবাদ হচ্ছে এই যে, ই'জাযকে উপলব্ধি করার যে অভিরুচি সেটা বিরাজ করে সাহিত্যিক, আলংকারিক এবং ছান্দিক জগতে ভাষা ও রচনাশৈলীর রাজ্যে। এটা সম্পূর্ণ আল্লাহ্ প্রদত্ত। আল্লাহ্ পাক যে ভাগ্যবান পুরুষকে চান এ অভিরুচি দান করেন আর যাকে চান এ থেকে বঞ্চিত করেন।[২]

এখন তাই একথা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, কুরআনের ই'জাযকে প্রমাণ করার জন্য সাক্কাকী কোন নিরস অথবা শুষ্ক দলীল-প্রমাণাদির আশ্রয়

১. দেখুন আস্-সাক্কাকীর 'মিফতাহুল উলূম' : পৃষ্ঠা ১৭৬, আল্লামা জালালউদ্দীন সুয়ূতীর 'আল্-ইতকান' দ্বিতীয় খণ্ড : পৃষ্ঠা ১২০ এবং তারিখে কুরআন, মওলানা আবদুল কাইউম নাদভী, পৃষ্ঠা ৫৯।

২. মিফতাহুল উলূম, আস্-সাক্কাকী, পৃষ্ঠা ২১৬।

নেন নি। কারণ শুষ্ক নিরস বস্তু সাধারণত গ্রহণযোগ্য হয় না। অবশ্য ভাষাশৈলী, সাহিত্যরীতি এবং আলংকারিক অভিরুচির অনেক সময় আমূল পরিবর্তন ঘটতে থাকে দেশ-কাল ভেদে। বিশেষ করে আজকের এই আধুনিক আনবিক যুগে আরবীয় ঐতিহ্য-তাহযীব তমদ্দুন সব কিছুকে তারা হারাতে বসে পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছে।

আস্-সাক্কাকীর জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে সুলতান খাওয়ারিযমি শাহের রাজ দরবারে তিনি বেশ কিছুদিন অতিবাহিত করেছিলেন। সাইয়েদ মাজদুদ্দীন বলেন: জীবনের প্রথমভাগে তিনি নাকি লোহার ছিলেন।

ইবনুল আরাবী

পুরো নাম মুহীউদ্দীন ইবনুল আরাবী ওরফে মুহাম্মদ বিন্ আলী বিন্ মুহাম্মদ আল-আরাবী ইবনু আহমদ বিন্ আব্দুল্লাহ্ (ওফাত ৬৩৮ হিঃ—১২৪০ খৃীঃ)। ইসলাম জগতে এই মহামনীষী 'শায়খুল আকবার' বা শ্রেষ্ঠ সূফী নামে প্রসিদ্ধ। ই'জাযের প্রশ্ন নিয়েও এই প্রখ্যাত সূফী সাধক তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। আল্লামা জালালউদ্দীন সুয়ূতী এর নিম্নরূপ সারসংক্ষেপ দিয়েছেন।[১]

ইবনুল আরাবী বলেন: মু'জিযা হচ্ছে একটা 'খারেকে আদাত' বা চ্যালেঞ্জ সম্পর্কিত অলৌকিক ঘটনা কিন্তু মুকাবিলা থেকে চিরতরে সুরক্ষিত। ইহা সাধারণত দু'রকমের। দৈহিক কিংবা মানসিক। বনু ইসরাঈলদের প্রতি আগত প্রতিটি মু'জিযাই ছিল তাই দৈহিক পদার্থভিত্তিক। কারণ তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারার প্রসারও ছিল তখন অতি সংকীর্ণ ও সীমিত। আর তাদের মেধাশক্তি ততটা প্রখর ছিল না। পক্ষান্তরে

১. দেখুন জালালউদ্দীন সুয়ূতী কৃত 'আল-ইতকান': ২য় খণ্ড: পৃষ্ঠা ১১৩।

আরবদের সামনে যে অমর মু'জিযা উপস্থিত করা হয়েছিল, তা ছিল সম্পূর্ণরূপে মানসিক ও বুদ্ধিভিত্তিক। কারণ এদের মেধাশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর আর বুদ্ধি ছিল অতি শাণিত।

কুরআন করীমের মু'জিযা অমর, চিরস্থায়ী। তাই রোজ কিয়ামত পর্যন্ত ইহা লয় পাবে না, ক্ষয়ও হবে না। এ যে কালজয়ী, চিরস্থায়ী। অতঃপর ইবনুল আরাবী এ প্রসঙ্গে সহীহ্ বুখারী থেকে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর অমিয় বাণীর উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে বলেন ঃ

অর্থাৎ "আমাকে প্রদত্ত যে অমর মু'জিযার উপর লোক বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তা' ইতিপূর্বে কোন নবীকে দেয়া হয় নি। আর আমাকে যা দেয়া হয়েছে সেটা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আগত ঐশী বাণী। এই জন্যই আমি এ আশা পোষণ করি যে, আমার অনুসারী হবে সবচাইতে বেশী।" অর্থাৎ অন্যান্য নবীদের মু'জিযা শেষ হয়ে যাবে তাঁদের জীবনলীলা সাঙ্গ হওয়ার সাথে সাথে। তাই তাঁদের সমসাময়িক ব্যতীত অন্যান্য লোকেরা এর দর্শন লাভে বঞ্চিতই থাকবে। কিন্তু আমাদের নবীর (সঃ) উপর অবতীর্ণ হয়েছে কুরআনের যে অমর মু'জিযা, তা' কোন দিন শেষ হবার নয়। মহা প্রলয়কাণ্ড পর্যন্ত তা অক্ষয়, অটুট হয়ে থাকবে। হাফিজ ইবনু হাজার আল-আস্‌কালানী (ওফাত ৮৫৩ হিজরী—১৪৪৯ খৃঃ) ও ইমাম কোস্তুলানী সহীহ্ বুখারীর উক্ত হাদীসের শারাহ লিখেছেন অতি ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবে।[১]

পবিত্র কুরআনের রচনা পদ্ধতি ও সাহিত্যরীতি, এর অপূর্ব আলংকারিক সৌষ্ঠব ও গায়েবের সংবাদ দান সত্যিই এ সবগুলোর তুলনা অন্য কোথাও মেলে না, প্রতি যুগে যুগেই এর চিরন্তন মু'জিযার জন্য অমরতার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। পবিত্র কুরআন জগদ্বাসীর সামনে যে অভিনব মু'জিযা পেশ করেছে, তা প্রায় প্রতিটি যুগের মুক্ত বুদ্ধিজীবীই

১. আল্লামা জালালউদ্দীন সুয়ূতী কৃত 'আল-ইতকান'ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৭।

উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। কারণ এ মু'জিযা ম্যাজিকের ধাঁধাঁর উপর নয়, বরং যুক্তিকের অকাট্য দলীল-প্রমাণের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। মানুষ একে শুধু যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করতে পারে, তা নয়, বরং এ উপলব্ধি করা যায় প্রদীপ্ত অন্তকরণ, মুক্ত-শাণিত, সাহিত্যিক ও আলংকারিক অভিরুচি আর প্রখর মেধাশক্তির মাধ্যমে। এ জন্যই কুরআন করীমে যারা পূর্ণ বিশ্বাসী ও আস্থাবান—তাদের সংখ্যা পৃথিবীতে এতো বেশী।

বস্তুত ইবনুল আরাবী ছিলেন একজন সৃষ্টিধর্মী লেখক। তাকলীদ বা অন্ধ বিশ্বাসেরও তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করে গেছেন তিনি। তাঁর ওফাতের পাঁচ বছর আগে (১২৩৫ খৃীঃ) তিনি স্বয়ং তাঁর হস্তলিখিত গ্রন্থাবলীর একটা ফিরিস্তি তৈরী করেন। এই ফিরিস্তির সংখ্যা ওঠে ২৮৯ পর্যন্ত। তাঁর হস্তলিখিত গ্রন্থমালার মধ্যে আজও দেড়শত পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব পাওয়া যায়।[১]

আস্-শেরানী তাঁর 'আল-ইওয়াকীত ওয়াল জওয়াহির' নামক গ্রন্থে বলেন যে, ইবনুল আরাবীর গ্রন্থাবলী চারশ' থেকেও বেশী। জুরজী যায়দান তাঁর 'আদাবুল লুগাত' নামক গ্রন্থে লিখেছেন: ইবনু আরাবীর গ্রন্থের সংখ্যা দু'শো পর্যন্ত পৌঁছেছে। তন্মধ্যে ব্রকলম্যান ১৫৬ খানা কিতাব এবং যে সমস্ত স্থানে সেগুলো পাওয়া যায় তার নামও উল্লেখ করেছেন। মৌলানা আবদুর রহমান জামী তাঁর পুস্তক-পুস্তিকার সংখ্যা পাঁচশ' খানা বলে উল্লেখ করেছেন।[২]

---

১. বুরহানুল আবহার; প্রফেসর সারেম কৃত তারীখে তাফসীর: পৃষ্ঠা ১০০।

২. বিস্তারিতের জন্য দেখুন ইউসুফ সারকেস্ কৃত মুজামুল মাত্-বুয়াত; পৃষ্ঠা ১৭৬; ফাওয়াতুল অফিয়াত: ২য় খণ্ড: নাফহুত-তীব ২য় খণ্ড; লিসানুল মিযান; ৫ম খণ্ড এবং তাশ্‌কোপরা যাদাহ কৃত মিফতাহুস সা'আদা: ১ম খণ্ড।

তাফসীর বিজ্ঞানের উপর তিনি দুটো গ্রন্থ রচনা করেন। একটি আট খণ্ডবিশিষ্ট উচ্চশিক্ষিত সুফী সাধকদের জন্য বিস্তৃততম তাফসীর। এটি মিসরের ময়মনিয়া ও বুলাক প্রেস থেকে প্রকাশ পেয়েছে। অপরটি সর্বসাধারণের জন্য দু'খণ্ড বিশিষ্ট সহজতর তাফসীর। প্রথমোক্ত তাফসীরটি অসমাপ্ত অর্থাৎ সুরা 'কাহাফ' পর্যন্ত। ইবনুল আরাবীর তাফসীর গ্রন্থে ই'জায সম্পর্কে তাঁর মতামত হয়তো পাওয়া যেতে পারে। মুরায়সী নামক স্থানে বসে তিনি প্রথম বই লিখেন 'মাওয়াকিউন নুজুম' নামে।[১]

তারপর হজ্জব্রত উদযাপন মানসে মক্কা মুয়াযযমা এসে তিনি প্রায় সাত বছর ধরে এখানে অবস্থান করেন। এখানেই মকামে ইব্রাহীমের ইমাম আবু খাশার সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। ইমাম সাহেবের এক সুন্দরী ও শিক্ষিতা দুহিতার নাম ছিল নিযাম। ইবনুল আরাবী এই নিযামের স্তুতিবাদে 'তরজমানুল আসওয়াক' নাম একটা মনোজ্ঞ ও সুদীর্ঘ কবিতা রচনা করেন। কিন্তু আলিম সমাজ একে যৌন-প্রেমের অভিব্যক্তি বলে তীব্র প্রতিবাদ জানালে 'যাখাইরুল আলাখ' নামে এর একটা সুন্দর শারাহ লিখেন। ভাষ্যসহ তাঁর কবিতা গ্রন্থটি ১৩১২ খৃীস্টাব্দ বৈরুত থেকে প্রকাশ পেয়েছে।[২]

১২২৪ খৃীস্টাব্দে মক্কা শরীফ ত্যাগ করে তিনি আলেপ্পোয় গমন করেন। এখানে সুলতান যাহির গাযীর সঙ্গে তাঁর মুলাকাত হয় এবং এখানেই তিনি তদানীন্তন দর্শনের বিরুদ্ধে 'আল হিকমাতুল ইলাহিয়া' নামক কিতাব লিখেন।[৩]

কুনিয়া নামক স্থানে অবস্থানকালীন তিনি 'মুশাহাদুল আসরার' এবং 'রিসালাতুল আনওয়ার' নামক আরও দুটো পুস্তক লিখে সমাপ্ত করেন।

১. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইনান কৃত নিহায়াতুল আন্দালুস: পৃষ্ঠা ৩৩২—৩৯।

২. দেখুন তারীখুল ফিকরিল আন্দালুসী এবং মুকাদ্দিমা তানাববালুল আমলাক।

৩. দেখুন আল্লামা শাকিব আরসালান কৃত হায়াতু ইবনিল আরাবী।

তিউনিসে সফররত অবস্থায় তিনি যে বই লিখেন, তার নাম হচ্ছে 'ইনশাউদ দাওয়ারিল ইহাতীয়া আলা মুযাহাতিল ইনসান'।

এ ছাড়াও ইবনুল আরাবীর নিম্নলিখিত কিতাবগুলো সমধিক প্রসিদ্ধ :

১. আল-আরবাউনা সাহীফা মিনাল আহাদীসিল কুদসীয়াহ্।

২. তাজুল রাসাইল ওয়া-মিনহাজুল ওয়াসাইল।

৩. কুরআতুত্ তুয়ূর-লি-ইসতিখরাজিল কাল ওয়াথ্-থামীর।

৪. কাসীদাতুল মুশিরাত (শায়খ উসমান আবদুল মান্নান এর শারাহ্ লিখেছেন)।

৫. মুহাযারাতুল আবরার-ওয়া-মুসামায়াতুল আখিয়ার ফিল আদাবিয়াত ওয়ান্-নাওয়াদির।

৬. কুরআতুল মুবারাকাতুল মাইমুনা (মিসর ও বোম্বাই থেকে প্রকাশিত)।

৭. মাফাতীহুল গয়ব (মিসর থেকে প্রকাশিত)।

৮. ইসতালাতুস সুফীয়াহ (লীডেন এবং দারুল কুতুব্ মিসর থেকে প্রকাশিত)।

৯. আল্ মুবাদী ওয়াল্-গায়াত ফী আসরারিল হুরূফিল মাকনুনাত।

১০. ফুতুহাতে মাক্কীয়াহ (এর শারাহ লিখেছেন, আবদুল ওহাব শেরানী [ওফাত ৯৭৩ হিঃ] লাওয়াকিহুল আনওয়ার নামে।

১১. ফুসুসুল হিকাম ফী খুসুসিল কালেম। ইহা বিভিন্ন ভাষ্যের সাথে বহুবার মুদ্রিত হয়েছে।[১] যেমন বালী যাদাহর শারাহ ১২৫২ হিজরীতে 'আস্তানা' থেকে মুদ্রিত হয়েছে। আবদুল গনী নাবলুসী ও মওলানা

---

১. বিস্তারিতের জন্য দেখুন আল্ আলামুল ফালাসাফাতিল ইসলামিয়া।

২. প্রফেসর আবদুস সামাদ সারিম কৃত 'তারীখে তাফসীর : পৃষ্ঠা ১০৪।

আবদুর রহমান জামী (ওফাত ৮৯৮ হিঃ)-এর শারাহ্‌দ্বয় মাত্‌বায়া শারকীয়াহ্‌ থেকে প্রকাশ পেয়েছে ১৩০৪ এবং ১৩২০ হিজরীতে। অনুরূপভাবে ডক্টর আবুল আলা আল-আফিফীর শারাহ্‌ ১৩৬৫ হিজরীতে কায়রো নগরী থেকে প্রকাশ পেয়েছে।[১] ফুসুসুল হিকামের অর্থ Bezels of wisdom or Mosaic of Precptise জ্ঞানের মণিমুক্তা বা নীতি-সূত্রের বিভিন্ন কারু-কার্য। এটির প্রণয়ন দামেশক নগরে ৬২৭ হিজরীতে শুরু হয় এবং ১২৩০ ঈসায়ীতে সম্পন্ন হয়। অতঃপর ১৯০৯ ঈসায়ীতে আবদুর রাজ্জাক কাশানীর ব্যাখ্যাসহ কায়রো নগরীর এক লিথো প্রেসে মুদ্রিত হয়। এর ফার্সী এবং তুর্কী শারাহ্‌ও পাওয়া যায়। Prof. R. A. Nicholson ফুসুসুল হিকামের আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করার পর Studying in Islamic Mysticism নামে এর নোট লিখেছেন। খাজা খাঁ Wisdom of the Prophets নামে সংক্ষিপ্ত সার সহকারে এর ইংরেজী তরজমা করেন।

মওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেবও (ওফাত ১৩৬২ হিঃ—১৯৪৩ খৃঃ) ইবনুল আরাবীর একটা সুন্দর জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন। এটিতে বেশীর ভাগ তিনি বরাত দিয়েছেন আবদুল ওহাব শেরানী (ওফাত —৯৭৩ হিঃ) কৃত 'ইওয়াকিত আল-জওয়াহির ফী বায়ানে আকায়িদিল আকাবির' নামক গ্রন্থ থেকে। তৎসঙ্গে কামুসের লেখক শায়খ মাজদুদ্দীন ফিরোযাবাদীর হাওয়ালা দিতেও তিনি কসুর করেন নি। মওলানা থানভী সাহেব বলেন: ১৩৩৮ হিজরীতে আমি ইবনুল আরাবীর ফুসুসুল হিকামের শারাহ্‌ লিখতে শুরু করি কিন্তু কতগুলো জায়গা এত রহস্যপূর্ণ ও আপত্তিজনক ছিল যে, এর মর্মোদ্‌ঘাটন তো দূরের কথা এ পথে আর

---

১. দেখুন দায়িরাতুল মা'আরিফ আল্ ইসলামিয়া: ১ম খণ্ড, শাযরাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব: ৫ম খণ্ড; ইবনু তাইমিয়া কৃত মাজমুয়াতু রাসাইল ওয়াল্ মাসাইল; Also see Ibn-ul Arabi, The Great Muslim Mystic and Thinker by S. A. A. Q. Husaini M. A.

অগ্রসর হতেও আমার মন চাইল না। তাই আপাততঃ বাদ দিলাম। তারপর সুদীর্ঘ সাতটি বছর পর আবার সেই আরব্ধ কাজে হাত দিলাম এবং একটা আশু পরিসমাপ্তির দিকে নিয়ে আসার চেষ্টা নিলাম। আল্লামা জালালউদ্দীন সুয়ূতী এবং আল্লামা হাসফাকী ইবনুল আরাবীর গ্রন্থাবলীকে অধ্যয়ন করা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন। ইবনুল আরাবী সম্পর্কে এই প্রথমোক্ত মনীষী অর্থাৎ আল্লামা সুয়ূতী একটা সম্পূর্ণ বই-ই লিখে ফেলেছেন। বইটির নাম 'তাম্বীহুল গাবী বি-তাবরিয়াতি ইবনুল আরাবী'।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া (ওফাত ৭২৮ হিঃ) ইবনুল আরাবীর ফুসূসুল হিকাম গ্রন্থের তীব্র সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন: ফুতুহাতে মাক্কিয়াহ' ইত্যাদি গ্রন্থ পড়ে ইবনুল আরাবী সম্পর্কে আমার ধারণা বেশ ভালই ছিল। কিন্তু 'ফুসূসুল হিকাম' পড়ে তা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। কারণ এ গ্রন্থে আসল স্বরূপটিই যেন পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে। মওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ কোকন উমরী ইবনু তাইমিয়ার বিস্তৃত জীবনেতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। এতে ইবনু আরাবী সম্বন্ধে ইবনু তাইমিয়ার মতামতকে তিনি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন।

ফলকথা, ই'জায শাস্ত্র সম্পর্কে ইবনুল আরাবী যে কোন নতুন মতবাদের অবতারণা করেছেন, তা নয়। বরং তাঁর পূর্বসূরিদের মতামতকেই তিনি কতকটা পরিবর্ধন ও পরিমার্জন সহকারে পেশ করার চেষ্টা করেছেন এবং কোন এক বিশেষ অভিমতকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দিয়েছেন মাত্র।

আল-আমীদী

আলী ইবনু আবী আলী আল-আমীদী (ওফাত ৬৩১ হিঃ—১২৩৫ খৃঃ) তাঁর 'আকবারুল আফকার' নামক গ্রন্থে কুরআনের ই'জায সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন এবং এ প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী মনীষীদের মতামত নিয়েও আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি স্বীয় যুগের এ সমস্ত পণ্ডিতদের

পদাংক অনুসরণ করেছেন, যাঁরা ই'জায শাস্ত্রের উপর দলীল-প্রমাণ সহকারে একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ নিয়ে নিজেদের বিস্তারিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। আল্লামা মাহমুদ আলুসী বাগদাদী (ওফাত ১২৭০ হিঃ) তাঁর সুন্দরতম তাফসীর 'রূহুল মা'আনী'র ভূমিকায় এই ই'জায সম্পর্কে আল-আমীদীর মতামতের নিম্নরূপ একটা সার-সংক্ষেপ দিয়েছেন।

আল্ আমীদী বলেন ঃ 'আলংকারিক গুণাবলী গায়েব বা অদৃশ্যের সংবাদ দান ও রচনাশৈলী ইত্যাদির সংমিশ্রণে নিহিত রয়েছে কুরআনের মু'জিযা'। আল্লামা আলুসী বলেন যে, আল্ আমীদীর এই অভিমতকে পরবর্তীকালে প্রায় সকল মনীষীই গ্রহণ করেছেন সমবেতভাবে। যাই হোক, আল্ আমীদীর এই অভিমত যেমন বহুল পরিমাণে তাঁর উন্মুক্ত ও ব্যাপক মনোবৃত্তির পরিচায়ক, ঠিক তেমনি ই'জায সম্পর্কে এর আগেকার পণ্ডিতদের সংকীর্ণ ও সীমিত মনোবৃত্তি ও অভিমতের পরিপন্থী।

হাযিম আল্-কারতাজানি

হাযিম বিন্ মুহাম্মদ আল্-কারতাজানি (ওফাত ৬৮৪ হিঃ—১২৮৫ খৃঃ) হচ্ছেন ই'জায শাস্ত্র সম্পর্কে 'মিনহাযুল বুলাগা' নামক অমর গ্রন্থের লেখক। পণ্ডিত আবদুল আলীম বলেন ঃ এই লেখকেরই হস্তলিখিত আর একটি পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে মদীনা মুনাওয়ারায়। এ গ্রন্থের নাম 'আল বুরহানুল কাশিফ আল্-ই'জাযিল কুরআন'। অনেকের মতে ইহা দুই নামের একই গ্রন্থ।

আল্লামা জালালউদ্দীন সুয়ূতী তাঁর 'আল্ ইত্‌কান' গ্রন্থে হাযিম কারতাজান্নির অভিমতের নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত-সার দিয়েছেন ঃ কুরআনের শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত যে সাহিত্যিক ও আলংকারিক গুণের অপূর্ব সমাবেশ রয়েছে ইহাই এর মু'জিযার জন্য যথেষ্ট। এর কোথাও সামান্যতম খুঁত বা ত্রুটি-বিচ্যুতির লেশমাত্রও নেই। কুরআনের মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে কোন যুগের কোন লোকই কোনদিন এই সমস্ত গুণাবলী একত্রে আনয়ন করতে সক্ষম হননি

আর ভবিষ্যতেও হবে না। আরবদের মুখের ভাষা আর যে সমস্ত লোক আরবী বলে তাদের সকল কথাবার্তায় সকল সময়ে এই উচ্চতর গুণাবলীর সমাবেশ কোনদিনই পরিদৃষ্ট হওয়া সম্ভব নয়। কারণ মাতৃভাষাই হোক, আর কথাবার্তাই হোক, সব সময় একই রকম স্ট্যান্ডার্ড কোনদিনই রক্ষা করা যায় না।

মনে হয়, আল্লামা হাযিম এই ই'জায সম্পর্কে শুধু আল্-বাকিল্লানীর মতবাদেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন। কারণ আল্-বাকিল্লানী ইতিপূর্বেই এ অভিমত প্রকাশ করে গিয়েছেন যে, কুরআনের শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সাহিত্যিক অলংকারের রয়েছে এক অপূর্ব সমাবেশ। হাযিম কারতাজান্নি এই অভিমতের সঙ্গে নতুন কোন কিছু সংযুক্ত না করে অবিকল সেটাকেই একটু পরিবর্ধিত আকারে পেশ করতে প্রয়াস পেয়েছেন।[১]

এই তো গেলো সপ্তদশ হিজরীর কথা। এরপর আসছে অষ্টম শতক। এই শতকে বহু স্বনামখ্যাত মনীষী ই'জায শাস্ত্র সম্পর্কে কলম ধরেছেন এবং অতি মূল্যবান আলোচনাও করে গেছেন। যেমন: আল্লামা যামালকানী তাঁর 'আত তিবইয়ান ফী ই'জাযিল কুরআন' নামক গ্রন্থে; প্রখ্যাত বৈয়াকরণিক জালালউদ্দীন আল্-খাতীব আল্-কাযভিনী তাঁর 'তাল্খীসুল মিফতাহ' নামক পুস্তকে; ইয়াহইয়া বিন হামযা আল্ আলাভী তাঁর 'আত-তিরায' নামক গ্রন্থে; প্রসিদ্ধ মুফাসসির আল্ ইস্পাহানী ও আন্ শাতিবী এবং আল্লামা বদরুদ্দীন যারকানী তাঁর 'আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন' নামক চমৎকার গ্রন্থে।

আয্-যামালকানী

ই'জায শাস্ত্র সম্পর্কে আয্-যামালকানী যে বই লিখেছেন তার নাম 'আত্ তিব্ইয়ান ফী ই'জাযিল কুরআন।' আল্লামা জালালউদ্দীন সুয়ূতী তাঁর 'আল্ ইতকান' নামক গ্রন্থে আয্-যামালকানীর মতামত এভাবে ব্যক্ত করেছেন

১. দেখুন 'আল্ ইতকান ফী উলূমিল কুরআন': ২য় খন্ড; পৃষ্ঠা ১১৯।

যে, কুরআনের ই'জায নিহিত রয়েছে এর সাহিত্যরীতির অনুপম বৈশিষ্ট্যের মাঝে। এছাড়া অর্থ ও পরিভাষার মধ্যে যে ভারসাম্য রয়েছে যার দরুন এর আকার ও অর্থের সৌন্দর্য বহুল পরিমাণে বর্ধিত হয়ে থাকে, তার মাঝেও বিরাজ করে কুরআনের চিরন্তন ই'জায। অন্যরূপে বলতে গেলে কুরআনে ব্যবহৃত শব্দ ও অর্থের মাঝে যে অনুপম বৈশিষ্ট্য ও ঐক্যতা রয়েছে এতেই বিরাজ করে কুরআনের ই'জায। মোটকথা, আল্লামা যামাখশারীর আলোচনার মধ্যে একটা অভিনব ধারণা বলতে তেমন কিছু নেই।

আল্লামা যামালকানী ছিলেন শাফেয়ী মযহাবের অনুসারী। তাঁর ছেলের নাম কামালুদ্দীন আবুল মা'আলী মুহাম্মদ (হিজরী ৬৬৭–৭২৭)। ইনি ছিলেন শাফেয়ী মযহাবের অন্যতম বিশিষ্ট ইমাম এবং আল্লামা যাহাবীর ওসতাদ মুকাররম। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তানই বটে। আল্লামা ইমাম ইবনু তাইমিয়াও (হিজরী ৬৬১—৭২৮) তাঁর সমসাময়িক ছিলেন এবং পঞ্চমুখে তাঁর প্রশংসা করে গেছেন।

আল-কাযভিনী

জালালউদ্দীন মুহাম্মদ বিন্ আবদুর রহমান বিন্ উমার আল কাযভিনী আল শাফেয়ী খাতীবে দামেশক্ (ওফাত ৭৩৯ হিজরী) অলংকার শাস্ত্রে হিজরী অষ্টম শতকের একজন অন্যতম খ্যাতিমান লেখক। ই'জাযুল কুরআনের প্রশ্ন নিয়ে তিনি খাস করে আলাদাভাবে যে কোন পুস্তক প্রণয়ন করেছেন তা নয়। তবে ই'জায সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হলে অলংকার শাস্ত্রে ভালোভাবে জ্ঞানলাভ করা ছাড়া যে কোন উপায় নেই—এই সত্যকে নিজেই একনিষ্ঠভাবে খুব জোরালোভাবে কলম চালিয়েছেন তিনি। এই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়েই তিনি ইমাম সাক্কাকীর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'মিফতাহুল উলুমের' তৃতীয় অধ্যায়ের সরল ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অলংকার শাস্ত্রের উপর দুটো সুন্দর ও সার্থক গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করে ফেলেন। একটির নাম হচ্ছে—'কিতাবুল ইযাহ ফী

উলমিল বালাগা' (মিসরের বুলাক প্রেসে ১৩১৭ হিজরীতে মুদ্রিত) আর দ্বিতীয়টির নাম 'তালখীসুল মিফতাহ' (কলিকাতা আস্তানা, বাইরুত এবং পাক-ভারতের বহু স্থানে মুদ্রিত)। এই শেষোক্ত গ্রন্থটি স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এতদূর জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, পরবর্তী যুগে আল্লামা তাফ্তাযানী (ওফাত ৭৯১ হিঃ ১৩৮৮ খৃীঃ) একাই এর তিনটি শারাহ লিখেন। শারাহ তিনটির নাম যথাক্রমে 'মুতাওয়াল', 'আতওয়াল' ও 'মুখতাসারুল মা'আনী'। পরে আমরা ইন্শাআল্লাহ এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করবো। আবদুর রহমান বারকুকীও এই 'তালখীসুল মিফতাহর সুন্দর শারাহ লিখেছেন এবং নিজেই সম্পাদনা করে তা মিসর থেকে সুন্দর ভূমিকাসহ প্রকাশ করেছেন ১৯০৪ খৃীস্টাব্দে।

আল্-খাতীব কাযভিনী তাঁর তালখীসুল মিফতাহ' নামক পুস্তকের ভূমিকায় বলেন : অলংকার শাস্ত্র এমন একটা সুচিন্তিত শিক্ষণীয় বিজ্ঞান যা ই'জায শাস্ত্রের বিভিন্নমুখী অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য সাহায্য করে। অতএব আল-খাতীব কাযভিনীর মতে কুর-আনের ই'জায নির্ভর করে এর আলংকারিক গুণাবলীর উপর।

তাঁকে খতীব বলা হয় এজন্য যে, দামাশকের জামে মসজিদে বহুদিন ধরে তিনি খাতীব বা বক্তার খিদমাত আঞ্জাম দিয়েছিলেন। এক সময় তিনি অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। খলীফা নাসের তাই স্বীয় দরবারে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর সমস্ত ঋণ পরিশোধ করেন এবং মিসরের সম্মানিত বিচারকের পদে তাঁকে অভিষিক্ত করেন। দীর্ঘ ১১ বছর ধরে তিনি কাযীর পদে অধিষ্ঠিত থেকে নিঃস্ব ও গরীব মিসকীনদের প্রতি ওয়াক্ফ এস্টেটের টাকা-পয়সা ও ধন-মাল অকাতরে বিতরণ করেন।

ইয়াহইয়া বিন্ হামযা আল্-আলাভী

তাঁহার পুরা নাম ইয়াহইয়া বিন্ হামযা বিন্ আলী বিন্ ইবরাহীম

১. বিস্তারিতের জন্য দেখুন হাফিয ইবনু হাজার আল্ আস্কালানী কৃত 'আদ-দুরারাতুল কামিলা : পৃষ্ঠা ১০৫। তাশকোপরা যাদাহ কৃত মিফতা-হুস্ সা'আদা : ১ম খণ্ড; পৃষ্ঠা ১৬৮।

আল্ আলাভী আল্ ইয়ামেনী (ওফাত ৭৪৯ হিঃ)। ৭২৯ হিজরীতে তিনি ইয়ামেনের 'আমিরুল মু'মিনীন' পদে অভিষিক্ত হন। অলংকার ও ই'জায শাস্ত্রের মৌলিক নীতি সম্পর্কে তাঁর অন্যতম বিশিষ্ট অবদান হচ্ছে 'আত্-তিরায'। এর পুরো নাম ঃ

الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز —

সাইয়েদ বিন্ আলী আল্ মারসাফী ১৩৩২ হিজরীতে এই গ্রন্থটিকে তিন খণ্ডে সম্পাদনা করে অতি সুন্দরভাবে মিসর থেকে প্রকাশ করেন।

এই অনুপম গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে কুরআনের ই'জায সম্পর্কে বিস্তৃত ও বিশেষভাবে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি এ প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী বিভিন্ন মনীষীর অকুণ্ঠ কার্যক্রম এবং মতামতের বরাতও দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এগুলো অত্যন্ত অভিনিবেশসহকারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার-বিশ্লেষণের পর পরিশেষে তিনি স্বীয় ব্যক্তিগত অভিমতও প্রকাশ করেছেন। এই ই'জায শাস্ত্রের সঙ্গে অলংকার বিজ্ঞানকে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি একটির সাথে অপরটিকে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িভূত করেছেন এবং এর প্রতি বেশ গুরুত্বও আরোপ করেছেন। তিনি বলেন ঃ কুরআনের ই'জায শাস্ত্রকে ভালোভাবে জানতে হলে অলংকার সাহিত্যের আলোকেই জানতে হবে। কারণ যে অলংকারের ভিত্তিমূলে ই'জায প্রতিষ্ঠিত, সে অলংকার শাস্ত্রে যথাযথরূপে ব্যুৎপত্তি হাসিল না করলে ই'জায শাস্ত্রকে অনুধাবন করা সম্ভব হবে কিরূপে?

আল্-আলাভীর মতে কুরআনের আলংকারিক শিল্পকলার অনুপমত্ব দুটো মানদণ্ড দিয়ে যাচাই করা যেতে পারে। প্রথমটা হচ্ছে স্বয়ং কুরআনুল করীম। কারণ কুরআনের উপর ভিত্তি করেই ইহা প্রতিষ্ঠিত। কুরআন নিজেই পেশ করে থাকে এর দৃষ্টান্ত।

পবিত্র কুরআনের যথাযথ মূল্যায়নের জন্য দ্বিতীয় কষ্টিপাথর বা মাপকাঠি কায়েম করেছেন ঐ সব প্রতিভাবান মনীষী, যাঁরা অলংকারশাস্ত্রে হাসিল করেছেন অগাধ পাণ্ডিত্য। এই দু'ভাবেই কুরআনের উচ্চতম গুণাবলীকে লোকসমক্ষে পেশ করা যেতে পারে। পবিত্র কুরআনের আলংকারিক

ও উচ্চতর বাগ্মিতা সম্পর্কে আল্-আলাভী তাঁর ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করার মানসে কুরআন পাক থেকে বহু আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, নবুওতে মুহাম্মদীর (সঃ) জন্য কুরআনে ই'জায একটা অন্যতম মৌলিক সূত্র এবং অকাট্য দলীল ও জ্বলন্ত স্বাক্ষর। তিনি ঐ সমস্ত পূর্ববর্তী পণ্ডিতদের খুব সমালোচনা করেন যাঁরা একথা বলেছেন যে, কুরআনের ই'জায নিহিত রয়েছে এর ব্যবহৃত পরিভাষার আকারে। এ প্রসংগে তিনি সাক্কাকী, ইবনুল আমীর, যামালকানী, খাতীব কাযভিনী, ফখরুদ্দীন রাযী প্রমুখ মনীষীর কথাও উল্লেখ করেছেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে আমীর ইয়াহইয়া আল্-আলাভী ইজাযের প্রশ্ন নিয়ে নতুন কোন মতবাদের অবতারণা করেন নি। পূর্ববর্তী লেখকদের মতামতকে তিনি একত্রিভূত করেছেন মাত্র। শুধু এই নয়, তিনি তাঁদের অভিমতসমূহের সুন্দর শ্রেণীবিভাগ করে অতি সুচারুরূপে সন্নিবেশিত করেছেন সেগুলোকে। আবার কতকগুলোকে তিনি নিজস্ব অভিমতরূপেও গ্রহণ করেছেন। আল্-আলাভীর মতে কুরআনের ই'জায শুধু যে এর অপ্রতিদ্বন্দ্বী চিরন্তন চ্যালেঞ্জের মাঝেই আবদ্ধ রয়েছে তা নয়, বরং এর অতুলনীয় বাগ্মিতা এবং অলংকারপূর্ণ বাক্রীতি ও স্টাইলের মধ্যেও তা নিহিত রয়েছে পূর্ণমাত্রায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি কুরআনের সুন্দর সুন্দর উপমা, অনুপম প্রবাদবাক্য, আকর্ষণীয় বিধি-নিষেধ এবং মনোজ্ঞ উপদেশমালার কথাও পেশ করেছেন।

পবিত্র কুরআনের মুকাবিলার জন্য তদানীন্তন আরবদের যে ব্যর্থহীন ভাষার চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছিল সে কথাও তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেন।[১]

অতঃপর তিনি বলেনঃ আল্লাহ্ পাক তাঁর নবীর (সঃ) মাধ্যমে আরবদের চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন বিভিন্ন তিনটি পর্যায়ে। প্রথম চ্যালেঞ্জ পেশ করা হয়েছিল কুরআনের একটা বৃহত্তর অংশের মুকাবিলার জন্য। তারপর

১. আত্-তিরায্ আসরারিল বালাগা ওয়া উলূমি হাকাইকিল ইজাযঃ ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭০।

বর্ণটি সূরার মুকাবিলার জন্য এবং সর্বশেষে একটা ক্ষুদ্রতম সূরার মুকাবিলার জন্য। কিন্তু তারা এর মুকাবিলা করতে কোনক্রমেই সাহস করেনি।

এই চ্যালেঞ্জে আরবদের মনের গোপনপুরে কি যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাদেরকে যে চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছিলো তার মুকাবিলা করতে না পারার পেছনে যে সমস্ত বাধাবন্ধন ও অন্তরায় ছিল সেগুলোকে তিনি অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন। কুরআন যে একটা অমর মু'জিযা—একথার প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে যে সমস্ত উক্তি করা হয়েছে, তিনি (আত-তিরায গ্রন্থে) সেগুলোর যথাযথরূপে জবাবও দিয়েছেন। নিম্নে আমরা এই উক্তিগুলো ও তার জবাবের একটা সার-সংক্ষেপ পেশ করছি।

১. "যে সমস্ত আয়াতের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ পেশ করা হয়েছিল, সেগুলো নবুওতের চরম সত্যতার স্বাক্ষর নয়। আর সেই চ্যালেঞ্জকে যথাযথভাবে গ্রহণ করাই যে আয়াতগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তাও নয়। যেমন জ্বালাময়ী ভাষণের সময় বক্তাগণও তাঁদের নিজেদের চ্যালেঞ্জ পেশ করে থাকেন। এতে তাদের একটা অতিরঞ্জিত ভাব ছাড়া আন্তরিকতা বা গাম্ভীর্য (Seriousness) বলতে তেমন কিছুই থাকে না।"

আমীর ইয়াহইয়া বিন হামযা আল-আলাভী এ সম্পর্কের যাবতীয় উক্তি ও প্রশ্নধারার জবাব দিতে গিয়ে এই কথাই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন যে, তদানীন্তন আরবরা নবী (সঃ)-এর মুখ থেকে এ মুহুর্মুহু চ্যালেঞ্জের যথার্থ মূল্য নিরূপণ এবং এগুলোর যথোচিত বিচার করতে সক্ষম হয়েছিল বলে মনে হয় না। তারা এর যথাযোগ্য মর্যাদা দানও করেছিল সে সময়ে। শুধু তাই নয়, তারা সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, এই চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে একটা পূর্ণ আন্তরিকতা ও গাম্ভীর্য।

২. তখনকার দিনে কুরআনের চিরন্তন চ্যালেঞ্জের মুকাবিলার খবর বিশ্বচরাচর ব্যাপী কোথাও প্রচার করা হয়েছিল বলে মনে হয় না।

আর কতিপয় মুষ্টিমেয় লোক মিলে সেই চ্যালেঞ্জের সদুত্তর দিতে অপারগ হয়েছে বলে যে বিশ্বজোড়া লোক অপারগ হবে এর কোন মানে নেই। আর এ দ্বারা যে কুরআনের অবিসংবাদিত সত্যতা প্রতিপন্ন হয় তাও নয়।

আল্-আলাভী এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন: পবিত্র কুরআনের চ্যালেঞ্জের উত্তর দিতে যদি আরবরাই অপারগ হয়, তবে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি সক্ষম হবে কি করে? তাছাড়া কুরআন নাযিল হওয়ার প্রাক্কালে ইহা নিখিল বিশ্ববাসীর গোচরীভূত হতে পারেনি বটে; কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যেই এর নামধাম ছড়িয়ে পড়েছিল দুনিয়ার সবখানে— এমন কি প্রতিটি কোণে কোণে। তাই পরিণামে ইহা কারুরই অগোচরে থাকতে পারেনি। এতদসত্ত্বেও এর চ্যালেঞ্জকে কেউ গ্রহণ করার সাহস করতে পারেনি।"

৩. 'যদিও চ্যালেঞ্জ সহকারে কুরআনের ব্যাপক প্রচার হয়েছিল দুনিয়ার সর্বত্রই, তথাপি এই চ্যালেঞ্জের উত্তর দিতে কেউ সাহস করেনি। কারণ চ্যালেঞ্জের জবাব দিলেই তো আর সেটা কার্যকরী বা ফলপ্রসূ হয়ে উঠতো না। তখন কুরআনের বিরুদ্ধাচারীরাও হয়তো যুদ্ধের আশ্রয় খুজতো। তখন অবশ্যম্ভাবীরূপে এর বিচার বিবেচনা বা চরম ফয়সালার জন্য এটা করা হতো। সুতরাং এটা একটা দীর্ঘতর বাদানুবাদ, তৃতীয় পক্ষকে কায়েম এবং সুদীর্ঘ কাল যাবত প্রতীক্ষার একমাত্র কারণ হয়ে দাঁড়াতো। এদিকে নবী মুস্তফাও (সঃ) হয়তো এই দীর্ঘসময়ের সুযোগে নিজের তরফকে অত্যন্ত শক্তিশালী করে তুলতেন। তখন তলোয়ারই এর একমাত্র ফায়সালা বলে সাব্যস্ত হতো। যাই হোক, একথাও বলা মুশকিল যে, কুরআনের মুকাবিলার জন্য এই চ্যালেঞ্জকে কোন দিক দিয়ে এবং কিভাবে নেয়া হতো অলংকার শাস্ত্রের দিক দিয়ে, বাকরীতি ও বাগিতার দিক দিয়ে, না এর অর্থের দিক দিয়ে?

এই সব উক্তি ও প্রস্তাবনার জবাব দিতে গিয়ে আল-আলাভী বলেন, এই চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করে কুরআনের মুকাবিলা করাই ছিল তখন নিরাপত্তার একমাত্র প্রতীক। কারণ তলওয়ারের মাধ্যমে ফায়সালা চাইতে গেলে

এমন একটা ভয়াবহ যুদ্ধের সূত্রপাত হতো যার পরিণাম সম্বন্ধে কারুর কিছু জানা ছিল না। আর চ্যালেঞ্জের অর্থ এও নয় যে, যতটা দিক সম্ভব সব দিক দিয়েই এর মুকাবিলা করতে হবে। বরং তুলনীয়, যে দিকটা সম্ভবপর বলে মনে করা হবে শুধু সেই দিকে স্থির লক্ষ্য রেখে মুকাবিলা করলেই চলবে। কুরআনের মুকাবিলার জন্য এর কোন দিককে বেছে নিতে হবে এ কথার জবাবে আল-আলাভী বলেন যে, যেহেতু রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তখন তাদের মাঝে ছিলেন জলজ্যান্তভাবে বিদ্যমান। তাই তাঁকে জিজ্ঞেস করে নেওয়াও তেমন অসম্ভব কিছু ছিল না। তিনি আরও বলেন, আঁ হযরত কুরআনের এই চ্যালেঞ্জকে প্রকাশ্যভাবে জনসমক্ষে প্রচার করেই ক্ষান্ত ছিলেন। এর পরে তিনি আর কিছুই করতে যান নি। তাই এর চাইতে বেশী আর কি করা যেতে পারে? কারণ তখনকার দিনে কবি-বক্তাদের মাঝে এ ধরনের চ্যালেঞ্জ প্রথাটা ছিল সর্বজনবিদিত এবং অত্যন্ত ব্যাপক ধরনের। তাই এর চাইতে বেশী আর কি করা যেতো?"

৪. "কুরআনের এই চ্যালেঞ্জকে পুরাপুরিভাবে গ্রহণ করে আরবরা এর মুকাবিলায় প্রবৃত্ত হয়নি। এর একমাত্র কারণ এই যে, তারা দৈনন্দিন যুদ্ধ-বিগ্রহে ছিল আকণ্ঠনিমজ্জিত। আর তাছাড়া তারা মুহাম্মদ (সঃ)-কে দেখে ও তাঁর ভক্ত অনুরক্ত সাহাবায়ে কিরামকে দেখে বেশ ভয় করতো।"

ইয়াহিয়া বিন হামযা আল-আলাভী এই উক্তির সদুত্তর দিতে গিয়ে বলেন: কুরআনের চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করে এর মুকাবিলায় দাঁড়ালে আরবদের যোগ্যতা বা বীরত্বপনায় এতটুকুও ব্যাঘাত ঘটত না। আর দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের তুলনায় এতে তাদের সুনামও কম অর্জন হতো না। এই তুমুল যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় যখন সিপাহীদের রণহুংকার আর অস্ত্রশস্ত্রের ঝনঝনানিতে রণপ্রান্তর মুখরিত থাকে—তখনও কতো গরম গরম ভাষণ আর উচ্ছ্বসিত কবিতা আবৃত্তি করে যুদ্ধের অনুপ্রেরণা দেয়া হয়েছে। আর শত্রুদের দিকে সিপাহীদের লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। তাছাড়া

যুদ্ধ-বিগ্রহকে কেন্দ্র করেই যদি এত ওজুহাত, তবে সন্ধি ও শান্তির সময়েতো তারা অনায়াসে ও নিঃসন্দেহে মুকাবিলা চালাতে পারতো।

৫. "কুরআনের প্রতিযোগিতা ও এর বিরোধিতা একান্ত সম্ভাব্য। আর আরবরা যে এর প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হয়নি, এর মানে এই নয় যে, তারা ইচ্ছা করলেও তা করতে পারতো না।

এর উত্তরে আল্-আলাভী বলেন, যদি মুকাবিলা করা সম্ভবই হতো তবে তা সংগে সংগেই করা হতো। কিন্তু কোন অবস্থাতেই যখন মুকাবিলা করা হয়নি, তখন এর অর্থ একমাত্র এই দাঁড়ায় যে, ইহা তাদের আয়ত্তের সম্পূর্ণ বহির্ভূত ছিল।

৬. কুরআনের বিরুদ্ধে কোন আপত্তিকর প্রস্তাব হয়তো নিশ্চয়ই পেশ করা হয়েছিল। তাছাড়া এই চ্যালেঞ্জ আদৌ গ্রহণ করা হয়নি—এ কথাও তো নিশ্চয়তার সংগে বলা চলে না।

আল্-আলাভী এ উক্তির তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন এবং বলেন: যদি কোন ব্যক্তি সাহস করে কুরআনের চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করে নিত তবে তা' একটা দুঃসাহসিক গুরুত্বপূর্ণ কার্য হয়ে দাঁড়াতো। আর এ সংবাদ ঠিক যেন জংগলের আগুনের মতোই এক নিমেষে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তো। সত্যি কথা বলতে কি, যদি কোন বস্তুকে কুরআনের প্রতি-দ্বন্দ্বী হিসাবে অলীক কল্পনা করে নেয়া হতো তাহলে কুরআনের তুলনায় সেই বিশিষ্ট বস্তুটির খ্যাতিই বেশী ছড়িয়ে পড়তো দুনিয়ার সর্বত্রই। আর সে যুগে ইসলামের প্রবল শত্রুদের পক্ষ থেকে সেই কাল্পনিক কুর-আনখানিকে কতোই না শক্তিশালী করা হতো। এর জন্য কতোই না স্তুতি-বাক্য আওড়ানো হতো। শুধু কি তাই? নবী মুস্তফার (সঃ) বিরুদ্ধা-চরণের একটা প্রধান উপায় হিসাবে একে দুনিয়ার দিকে দিকে ছড়িয়ে দেয়া হতো অনতিবিলম্বে।

৭. কুরআনের চ্যালেঞ্জকে প্রকৃতই গ্রহণ করা হয়েছিল এর মুকাবিলার জন্য। কিন্তু সেটা ছিল কবিতার আকারে। যেমন—মুসায়লামা কাযযাবের

কুরআন, নাযর বিন হ্যারিসের লিখিত বস্তু.[১] 'ইবনুল মুকাফফা, কাবুস বিন অসামকীর এবং আবুল আল-মাআররীর কুরআনের অনুরূপ লিখিত বস্তুসমূহ। আল-আলাভী এ উক্তির জবাব দিতে গিয়ে বলেন ঃ এই উপরিউক্ত লিখিত বস্তুগুলোর কোন ক্রমেই কুরআনের সাথে তুলনা বা মুকাবিলা করা যেতে পারে না।

৮. আরবরা কুরআনের মুকাবিলার জন্য যে প্রচেষ্টা নেয়নি তার কারণ হচ্ছে এই যে, আকাশ ও আকাশবিহারী ফিরিশতা, অতীতের ইতিহাস এবং জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে তারা আদৌ অবহিত ছিল না।

আল-আলাভী এর উত্তরে বলেন ঃ হতে পারে তখনকার দিনে আরবরা এই সমস্ত বিষয়ে অজ্ঞ ছিল; কিন্তু তাদের প্রতিবেশী সমসাময়িক য়াহুদীরা এ বিষয়ে ছিল অতি সুক্ষ্মদর্শী ও সুবিজ্ঞ। আরবরা তাই অন্ততঃপক্ষে য়াহুদীদের সাথে পরামর্শ করেও এ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করতে পারতো।

এই উপরোল্লিখিত উক্তিসমূহ এবং আল-আলাভীর পেশকৃত অকাট্য দলীল-প্রমাণসহ খণ্ডগুলো ততটা মৌলিক না হলেও তদ্দ্বারা কুরআনের ই'জাযকে প্রতিপাদনকল্পে প্রামাণিক পথ ও মতের সন্ধান দেওয়া হয়েছে। এই দলীল প্রমাণগুলো আপাতদৃষ্টিতে অনেক সময় অতি লম্বা ও বিস্তারিত বলে প্রতীয়-মান হয়; কিন্তু পয়েন্টগুলো সত্যিই বৈজ্ঞানিক এবং স্বতঃসিদ্ধ সত্যেরই শামিল।

পূর্বোল্লিখিত উক্তিসমূহের একটা লম্বা ফিরিস্তি দান ও তৎপর তার খণ্ডনকল্পে অকাট্য দলীল-প্রমাণ পেশ করার পর আল-আলাভী ই'জায শাস্ত্রের মতবাদকে এভাবে সমর্থন ও প্রমাণ করে দেখিয়েছেন ঃ

কুরআনের কোন একটা সূরার মুকাবিলা করা হয়তো একটা সাধারণ ব্যাপার হবে। আর না হয় তা হবে একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ অনন্য সাধারণ ব্যাপার। যদি ইহা সাধারণ ব্যাপার হয়, তবে মুহাম্মদ্ (সঃ) চ্যালেঞ্জ দেওয়া

১. বিস্তারিতের জন্য দেখুন—যামাখশারী কৃত আল-কাশশাফ ঃ ২য় খণ্ড, সূরা লুকমান; পৃঃ ৪১১।

সত্ত্বেও আরবদের নিশ্চুপ ও নিশ্চেষ্ট থাকাই ছিল কুরআন অপ্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার প্রকৃষ্ট স্বাক্ষর। পক্ষান্তরে যদি ইহা সাধারণ হয়, তাহলেও হবে কুরআন অমর মু'জিযা হওয়ার ইহা সুস্পষ্ট ইংগিত। এই দলীল-প্রমাণগুলো পেশ করতে গিয়ে মনে হয় আল্-আলাভী সারাফা (deflection) মতবাদেরও সমর্থন যুগিয়েছেন। এ সম্পর্কে তাঁর মতামত যে অতি সুদৃঢ় এবং অকাট্য দলীল-প্রমাণের ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত তাও নয়।

আমীর ইয়াহইয়া বিন হামযা ঐ সমস্ত মতামতের ব্যাখ্যা, সমালোচনা ও পর্যালোচনা করেছেন, যেগুলো বিভিন্ন সময়ে কুরআনের ই'জায সম্পর্কে পেশ করা হয়েছে।

১. আবু ইসহাক আন্ নাসিবী ও নাযযাম প্রমুখ মু'তাযিলী নেতা এবং শারীফ মুরতাযা প্রমুখ দ্বারা কুরআনের 'সারাফা' মতবাদ পেশ করা হয়েছিল। এই মতবাদের তিনটি প্রকার-পদ্ধতি ছিল। প্রথম অভিমত পোষণ করেছিলেন আন্ নাযযাম, দ্বিতীয়টি আস্ শারীফ মুরতাযা আর তৃতীয় মতবাদটির ধারক হিসাবে তিনি বিশেষ কোন পণ্ডিতের নামই উল্লেখ করেন নি। অভিমতটি ছিল এই মর্মে যে, পবিত্র কুরআনের মুকাবিলা করতে আরবরা সব সময় এবং সব দিক দিয়েই সক্ষম ছিল, কিন্তু আল্লাহ পাকই যেন তাদেরকে এ থেকে সরিয়ে রেখেছিলেন।

আল্-আলাভী এই 'সারাফা' মতবাদের জবাব দিতে গিয়ে বলেন: যদি এই তথ্যই সত্য হতো তবে কুরআনের ন্যায় ইহাও একটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ মু'জিযা হয়ে দাঁড়াতো। আর কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে ও পরে আরবদের লিখিত বস্তু এবং প্রকাশ্য মজলিসে প্রদত্ত ভাষণগুলোও প্রায় পবিত্র বাণী কুরআনের সমপর্যায় হয়ে দাঁড়াতো।

২. অনুরূপভাবে তিনি ঐ সমস্ত পণ্ডিতের অভিমতের বিস্তারিত ব্যাখ্যাও করেন, যাঁরা এই মত পোষণ করে থাকেন যে, কুরআনের ই'জায এর অবিসম্বাদিত অথচ সম্পূর্ণ বোধগম্য বাকধারা ও সাহিত্যরীতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এ ছাড়াও এর আলংকারিক শিল্প চাতুর্য, অদৃশ্যের খবর প্রদান এবং অভিনব

বাগিয়্যাও এর অলৌকিকতার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছে। এই সব চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভংগীকে কেন্দ্র করে মৌলিক না হলেও বেশ একটা মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন আমীর আল্-আলাভী।

৩. কুরআন সমগ্র বৈজ্ঞানিক উপাদানের আকর। ই'জায সম্পর্কে কতিপয় পণ্ডিতের এই বৈজ্ঞানিক মতবাদের হাওয়ালা দিতে গিয়ে তিনি বলেন: যদি উক্ত মতবাদকে গ্রহণ করা হয়, তবে পবিত্র কুরআন হয়তো একটা বৈজ্ঞানিক কর্মপর্যায়ে গিয়ে উপনীত হবে, যেখান থেকে ভাবী বংশধর বা উত্তরপুরুষরা প্রচ্ছন্ন উপকার হাসিল করতে থাকবেন। পক্ষান্তরে কুরআন মজীদের সহজ-সরল ও দ্ব্যর্থহীন আয়াতগুলো মু'জিযা হবে কি? অন্যান্য আয়াতগুলো যদি উত্তরপুরুষদের বোধগম্য হওয়া সহজসাধ্য ও সম্ভাব্য হয়, তবে একই আয়াত এক সময়ে বিজ্ঞানসম্মত বলে সাব্যস্ত হবে এবং পরবর্তীকালে অনিশ্চিত ও অনধিগম্য বলে প্রতীয়মান হবে। আল্-আলাভী এ প্রসংগে বেশ লম্বা-চওড়া দলীল-প্রমাণেরও আশ্রয় নিয়েছেন। যাই হোক, আপাত দৃষ্টিতে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, কাউকে সম্মোহিত করা বা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গোপন রহস্যের মাধ্যমে কোন ব্যক্তিবিশেষের সাথে যোগসাজস করা কোনদিনই উসূলে কুরআনের উদ্দেশ্য ছিল না। বরং এর আসল উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র মানবগোষ্ঠীর জীবন পথকে আলোকোজ্জ্বল করা, তাদের হিদায়ত করা।

৪. আল্-আলাভী উল্লেখ করেন: কুরআনের ই'জায রয়েছে অলংকারশাস্ত্রে। এই মতবাদকে তিনি গ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু এই শর্তে ও অর্থে যে, যদি এই কুরআন তার বাকধারা ও তাৎপর্যের দিক দিয়ে আলংকারিক বৈশিষ্ট্য ও শিল্পকলার চরম সীমায় আরোহণ করে এবং পৃথিবীর কোন বস্তুর সাথেই এর তুলনা সম্ভবপর না হয়।

৫. কুরআন যে স্টাইলের উপর নির্ভরশীল' একথারও উল্লেখ করেছেন আল্-আলাভী। অতঃপর তিনি এই একতরফা মতবাদের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে বলেন: শুধুমাত্র স্টাইলই নয় বরং এর ভাব, তাৎপর্য এবং ফাসাহাত-বালাগাতের উপরও নির্ভর করে এর মু'জিযা।

আল্-আলাভীর কাছে স্টাইলের অর্থ অবিকল তাই নয়, যা ছিল শায়খ আব্দুল কাহির বা আবুবকর আল্ বাকিল্লানীর কাছে। যে সব চিন্তাধারা বা দৃষ্টিকোণ এ সমর্থন যোগায় যে, কুরআন সবদিক দিয়েই মু'জিযা, আল-আলাভী সে সবগুলোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন বেশ অভিনিবেশ সহকারে। অতঃপর তিনি প্রতিবাদ করেন যে, এই ই'জায প্রধানত কুরআনের অলংকার ও বাগ্মিতার মধ্যেই নিহিত। ই'জায শাস্ত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনার্থে কুরআনের অন্যান্য গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনাকে তিনি অনাবশ্যক বলে মনে করেন।

৬. পরিশেষে আল্-আলাভী আরও একটি মতবাদের উল্লেখ করেন। সেটি এই যে, কুরআনের ই'জায এর সূরাসমূহের প্রাথমিক ও প্রান্তিক অনুচ্ছেদেই বিদ্যমান রয়েছে। এ ছাড়া প্রতিটি আয়াতের শেষে এবং শুরুতে রক্ষিত রয়েছে কুরআনের ই'জায।

এতো গেলো আমীর ইয়াহইয়া আল্-আলাভীর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আত্-তিরাযের' বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ ও বিচার-বিশ্লেষণ এবং ই'জায সম্পর্কে তাঁর অমূল্য মতামত।

'আত্তিরায' গ্রন্থটি ছাড়া তিনি তাঁর জীবদ্দশায় আরও বহু অমূল্য গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কিতাবদ্বয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১. كتاب الخاص لفوائد مقدمة طاهر (কিতাবুল খাস্ লি ফাওয়াইদি মুকাদ্দামাতি তাহির)

২. كتاب الانتصار على علماء الامصار فى تقرير المختار من مذاهب الائمة واقاويل الامة —

(কিতাবুল ইন্তিসার আলা উলামায়িল আমসার ফী তাকরীরিল মুখতার মিন মাযাহিবিল আইম্মাতি ওয়া আকাবিলিল উম্মাতি)

এই শেষোক্ত বইয়ের নামটি যেমন বড়ো, ইহা আকারেও ঠিক তেমনি বৃহৎ। এটি মোট আঠারো খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। বস্তুত এই গ্রন্থগুলোতে আমীর আল্-আলাভীর অপূর্ব লিপিকুশলতা, অদ্ভুত বর্ণনাশৈলী ও উৎকৃষ্ট ভাষার পরিচয় মেলে।

আল-ইসপাহানী

ই'জায সম্পর্কে শায়খ আবু মুসলিম মুহাম্মাদ বিন্ বাহর আল্ ইস-পাহানীর (ওফাত ৩২২ হিজরী) মূল্যবান মতামত পাওয়া যায় তাঁর সুপ্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থে। এই তাফসীরের নাম 'মুলতাকাতু জামিইত তাভীলিল মুহকামিত্ তান্যীল।' ১১৩০ হিজরীতে মওলানা সাঈদ আনসারী এর বিক্ষিপ্ত অংশকে একত্রিত করে আল্-বালাগ প্রেস কলকাতা থেকে প্রকাশ করেছেন। আল্-ইস্পাহানী তাঁর এই তাফসীরে অন্যান্য মুফাস্সিরীনদের বিরোধিতা করেছেন বটে; কিন্তু তিনি এতে অন্যান্য মুফাস্সিরীনদের মতামতকেও আবার একত্রিত করেছেন। সম্প্রতি এই তাফসীরটি উর্দুতে ভাষান্তরিত হয়েছে। তরজমা করেছেন সাইয়েদ নাসীর শাহ এবং রাফী-উল্লাহ—দু'জন মিলে। লাহোরের 'ইদারায়ে সাকাফতে ইসলামিয়া' থেকে ইহা প্রকাশিত হয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী তাঁর 'আল্ ইত্কান' গ্রন্থে ই'জায শাস্ত্র সম্পর্কে 'আল্ ইস্পাহানীর মতামত সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করেছেন।[১]

উক্ত গ্রন্থে তিনি বলেন: হয়তো তোমরা অস্বীকার করবে না যে, কুর-আনের ই'জাযকে গ্রহণ করা হয়েছে দুটো কারণে। প্রথম কারণ এই যে, কেউ এর নকল করতে সক্ষম নয়। দ্বিতীয়ত, এর মুকাবিলা থেকে জনগণকে অপ-সারিত করা হয়েছিল। প্রথম অভিমতের বুনিয়াদ মনে হয় কুরআনের বাগ্মিতা অথবা এর তাৎপর্য ও আলংকারিক পাণ্ডিত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বাগ্মিতা ও অলংকারভিত্তিক এই ই'জায। কিন্তু পরিভাষার সঙ্গে ততটা সম্পৃক্ত নয়। কারণ সম্পূর্ণ কুরআনখানি নাযিল হয়েছে আরবী ভাষায়। আর এই আরবী হচ্ছে জনগণের মুখের ভাষা। স্বয়ং কুরআন মজীদেই এ ভাষা সম্বন্ধে ভূরি ভূরি আয়াতের সমাবেশ রয়েছে। যেমন আল্লাহ্ পাক সূরা ইউসুফে বলেন: নিশ্চয়ই আমি এই কুরআনকে অবতারণ করেছি আরবী ভাষায়, যেন তোমরা বুঝে দেখো (২য় আয়াত)।

---

১. আল্-ইত্কান ফী উলূমিল কুরআন: ২য় খণ্ড; পৃষ্ঠা ১৯৮।

অর্থাৎ যে মহামানবের উপর কুরআন পাক নাযিল হয়েছে, সেই রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ও তাঁর স্বদেশবাসী এবং ভক্ত অনুচরবৃন্দ সবাই ছিলেন আরববাসী ও আরবী ভাষাভাষী। এই আরবী ভাষায় রয়েছে অসাধারণ উপযোগিতার উপকরণ। কারণ আরব মনীষীরা দর্শন ও বিজ্ঞানের চর্চায় যে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, আরবী ভাষাই ছিল তার একমাত্র বাহন।

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ পাক সূরা রা'আদে বলেন ঃ

"আর এরূপে আমি ইহা (কুরআন পাক) চরম ফায়সালারূপে আরবী ভাষায় নাযিল করেছি। (আয়াত ৩৭, রুকু ৫)

প্রত্যেক রসূলের মাতৃভাষায় আল্লাহ্ পাকের প্রত্যাদেশ নাযিল হয়েছে।

"আর হে নবী, যাতে করে তুমি অনায়াসে জনগণের কাছে সমস্ত বিষয় বিবৃত করতে পারো এবং যাতে করে তারা উপদেশমালা কবুল করতে আর সংযমপরায়ণ ও সতর্ক হতে পারে; তজ্জন্য আমি কুরআন পাককে তোমার মাতৃভাষায় অবতারণ করে এতে উপদেশমূলক ও ভীতিপ্রদ বিষয়সমূহ একত্রিত করেছি।[১]

"বিশ্বজাহানের প্রভু, পরওয়ারদিগার চিরসত্য আল্লাহ্‌র কাছ থেকে বিশ্বাসী আত্মা" অর্থাৎ, ফিরিশতা শ্রেষ্ঠ হযরত জিবরাইল (আঃ) এই স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ কুরআন পাক নিয়ে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। আর তার নিকট থেকেই 'আল-আমীন' অর্থাৎ মহাসত্যপরায়ণ ও মহাবিশ্বাসভাজন হযরত রসূলে করীম (সঃ) উহা প্রাপ্ত হয়েছেন। অতএব এতে অবিশ্বাস বা সন্দেহ পোষণ করার কোনই সঙ্গত কারণ নেই। ইহা সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় অবতারিত। এর ভাব ও ভাষা বা শব্দ ও অর্থ—সবই আল্লাহ্‌র তরফ থেকে।"[২]

"এই আরবী কুরআনে কোনই দোষ ত্রুটি বা বক্রতা নেই, যেন তারা সংযত হয়।"[৩]

---

১. দেখুন ঃ তাফসীরে সূরা ত্বাহা ঃ আয়াত ১১৩; রুকু ৬।
২. তাফসীরে সূরা শু'আরা ঃ আয়াত ১৯২-১৯৫; রুকু ১১
৩. তাফসীরে সূরা হা-মীম সিজদা বা ফুসসিলাত ঃ আয়াত ২-৩, রুকু ৫।

"অভিজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য এই স্বর্গীয় মহাগ্রন্থ—আরবী কুরআন নাযিল হয়েছে। এর আয়াতসমূহ সরস ও সুস্পষ্ট। এতে কোনই জটিলতা বা অস্পষ্টতা নেই।"১

"আর যদি আমি এই কুরআনকে আযমী ভাষায় নাযিল করতাম, তবে তারা নিশ্চয়ই বলতো যে, (আমাদের বোধগম্যের জন্য) এর আয়াতসমূহকে সুস্পষ্টরূপে বিঘোষিত করা হয়নি কেন? তবে কি আরবীর জন্য আযমী ভাষা? অর্থাৎ কিতাব অনারবী আর রসূল নাকি আরবী, এ কেমনতর কথা?' ২

"হে রসূলে আরবী, আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ যোগে অনুপম আরবী কুরআন 'ওহী' করেছি, যেন তুমি আরবের 'জনপদ জননী' মক্কাবাসী ও তার পার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহের বাসিন্দাগণকে সেই অবশ্যম্ভাবী রোজ হাশর, পুনরুত্থান দিন ও দোযখের আগুন থেকে ভয় প্রদর্শন করো। আর তাদেরে তুমি বলে দাও যে, এই সব ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা সম্বন্ধে এতটুকুও শক-শুবাহ বা সন্দেহ নেই।" ৩

"নিশ্চয়ই আমি একে আরবী কুরআনরূপে প্রকাশ করেছি—যেন 'হে আরবের অধিবাসীবৃন্দ, তোমরা বুঝতে পারো (অনায়াসে)।"

"(কুরআনের) পূর্বে এসেছিলো হযরত মূসার (আঃ) কিতাব, পথ-প্রদর্শক ও রহমতের প্রতীকরূপে। আর আরবী ভাষার এই কুরআন হচ্ছে তার সত্যতার প্রতিপাদনকারী। যেন ইহা (আমার অবতারিত প্রদেশের চিরাচরিত নীতি অনুসারে) জালিমদের সতর্ক করে, আর নেক্কার বান্দাদের সমাচার প্রদানকারী।" সুতরাং রসূলে আরবীর (সঃ) প্রতি অবতারিত এই আরবী কুরআনে কোন অলীক উপকথা বা পুরাকালীন

---

১. তাফসীরে সূরা হা-মীম সিজদা: আয়াত ৪৪।

২. তাফসীরে সূরা শূরা: আয়াত ৭।

৩. সূরা যুখরফ: আয়াত ৩।

মিথ্যা কাহিনীর গুপজায়েশ বা সংমিশ্রণ থাকলে নিশ্চয়ই তারা তা জানতে পারতো।[১]

উদ্ধৃত আয়াতগুলো দ্বারা একথা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, আঁ হযরতের (সঃ) উপর ওহীযোগে যে পবিত্র কুরআন নাযিল হয়, তার সাথে আরবী ভাষা নিরবচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত। এইজন্যই ওলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে একমত যে, কুরআন বলতে এর ভাব ও ভাষা উভয়কেই বোঝায়। কুরআনের ভাব যেমন গুরুত্বপূর্ণ, এর আরবী ভাষাও ঠিক তেমনি গুরুত্বপূর্ণ।

এই তো গেলো আরবী ভাষার দিক দিয়ে কুরআনের ই'জায। এ ছাড়াও পবিত্র কুরআন যে সমস্ত স্বর্গীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, নীতিকথা আইন-কানুন ও অদৃশ্য সংবাদের ধারক, সেগুলোও নিজ নিজ স্থানে মু'জিযা।

কিন্তু আবু মুসলিম ইস্পাহানীর মতে কুরআনের ই'জায শুধুমাত্র কুরআন হিসেবে বা কুরআনের বরাত হিসেবে নয়; বরং এই হিসেবে যে এর সব খবরই দেয়া হয়েছে পূর্ববর্তী ইলম বা অধ্যয়ন ব্যতিরেকে। আরবী ভাষায় হোক অথবা অন্যান্য ভাষায়, শব্দমালার মাধ্যমে হোক, অথবা সংকেত দ্বারা, যে ভাবে ও যে স্টাইলে হোক না কেন, গায়েবের খবর সব সময়ই এক। তাই স্টাইলটা হচ্ছে কুরআনের একটা বাহ্যিক আবরণ। পক্ষান্তরে এর শব্দ ও অর্থসমূহ একটা উপাদান স্বরূপ। আকারের অসমতার দরুন অনেক সময় কোন বিশিষ্ট বস্তুর নাম বিভিন্ন রকমের হয়ে দাঁড়ায়। অথচ উপাদান একই থাকে। যেমন আংটি, ঝুমকো, কাংকন প্রভৃতি বিভিন্ন অলংকারের বিভিন্ন নাম; কিন্তু উপাদান বা উপকরণ সবগুলোরই এক। সেটা হচ্ছে স্বর্ণ।

কুরআনের ই'জায তাই এর বিশিষ্ট স্টাইলের সঙ্গেই সম্পৃক্ত। একে মু'জিযা হিসেবে প্রমাণ করতে হলে কুরআনের স্টাইল যে অন্যান্য স্টাইল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, তা দেখাতে হবে অবশ্যম্ভাবীরূপে। কারণ স্টাইল

---

১. তাফসীরে সূরা আহকাফ ঃ আয়াত ১২।

সম্বন্ধীয় যতগুলো উত্তম গুণাবলীর দরকার, তা সবই মওজুদ রয়েছে এই পবিত্র কুরআনে। এ ভাবেই কুরআন ও অন্যান্য সাহিত্যকর্মের মাঝে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে। এই তফাত উপলব্ধি করতে পারেন পণ্ডিতপ্রবর সুধী-সজ্জনরা; যাদের মধ্যে রয়েছে সুন্দর সাহিত্যিক অভিরুচি। আল্লাহ্ পাক স্বয়ং ঘোষণা করেছেন গুরুগম্ভীর স্বরে ঃ

"নিশ্চয় যারা সদুপদেশ (কুরআন) সমাগত হওয়ার পরও একে অমান্য করে (তারা এর প্রতিফল পাবে অবশ্যম্ভাবীরূপে) নিশ্চয় এই কুরআন হচ্ছে একটা মহাশক্তিশালী গ্রন্থ। সম্মুখ দিক দিয়ে অথবা পশ্চাদ্ভাগ দিয়ে অসত্য কোন দিন কুরআনের ত্রিসীমানায় অনুপ্রবেশ করতে পারে না। যিনি মহা-প্রজ্ঞাময় ও সদাবন্দিত, তাঁরই কাছ থেকে আগত এই ঐশী বাণী।[১]

অতঃপর আল-ইস্পাহানী বলেন ঃ পবিত্র (কুরআন) মুকাবিলা থেকে আরবদের প্রচ্ছন্নভাবে অপসারিত করা (সারাফা মতবাদ) ও একটা জ্বলন্ত মু'জিযা আর ইহা ঠিক দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। কারণ লব্ধ-প্রতিষ্ঠ বাগ্মী, স্বনামখ্যাত আলংকারিক পণ্ডিত যাদের রচনার নিপুণতা তখনকার দিনের সাহিত্যিক মজলিসগুলোকে সব সময় সরগরম করে রাখতো আর যারা বিভিন্নমুখী মুকাবিলায় অনবরত থাকতো উন্মুখ-উদগ্রীব, তারাও যখন কুরআনের অনুরূপ একটা ছোট সূরা, এমন কি একটা ছোট্ট আয়াতও রচনা করতে সক্ষম হলো না এবং এর মুখালিফাতও করতে পারলো না, তখন তারা বিজ্ঞের মতো ব্যাপারটাকে তলিয়ে দেখতে এবং চিন্তা করতে প্রয়াস পেলো। অবশেষে তারা এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, নেপথ্য থেকে হয়তো আল্লাহ্ প্রদত্ত হুকুমই তাদের এ কাজ থেকে বিরত রাখছে। অতএব যেখানে অলংকার শাস্ত্র ও বাগ্মিতার স্বতঃসিদ্ধ কর্ণধার ও সুধীসজ্জনরা প্রকাশ্য মজলিসে মুকাবিলা করতে বাহ্যিকভাবে অপারগ অথচ আভ্যন্তরীণভাবে তাদের জন্য এ পথে কতো দুর্লংঘ বাধাবিপত্তি আর কতো দুরতিক্রম্য প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করা হয়েছে, তখন এর চাইতে বড় মু'জিযা আর কি হতে পারে ?

---

১. সূরা হা-মীম আস্-সিজদা ঃ আয়াত ৪২ ।

আল-ইস্‌পাহানী এভাবে দুটো মতবাদকে একত্রিত করতে চেয়েছেন। একটা এই যে, কুরআনের স্টাইল হচ্ছে এর মু'জিযা। আর দ্বিতীয়টি সারাফা মতবাদ। মতবাদ দুটো পরস্পর বিরোধী। আল-ইস্‌পাহানীর মতে কুরআনের স্টাইল, এর অর্থ ও শব্দ—দু'য়ের সমন্বয়েই গঠিত। শুধু মাত্র শব্দ ই'জায সৃষ্টি করতে অক্ষম। কারণ শব্দগুলো আরবদের নিজস্বও তো হতো পারে। তাই অর্থ ও ভাবের তুলনায় কুরআনের ভাষার গুরুত্ব কোন অংশেই কম নয়।

কুরআনের ভাবগুলো অপর কোন ভাষায় তরজমা করলে যেমন সেই অনূদিত কুরআনকে আসল কুরআনের মর্যাদা দান করা যেতে পারে না ঠিক তদ্রূপ এর ভাবকে কুরআনের মূল বচন ছাড়া অন্য কোন আরবী বাক্যে প্রকাশ করলে তাকেও কুরআনের মর্যাদা দেয়া যেতে পারে না। কাজেই একথা স্বতঃসিদ্ধরূপে প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের ভাষাও কুরআন। আল-ইস্পাহানী এ কথাও মনে করেন না যে, শুধু অর্থই ই'জাযুল কুর-আনের মূল-ভিত্তি। কারণ তিনি বলেন: কুরআনের বহু ভাব ও বিষয়-বস্তু পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে তিনি এই আয়াতে কুরআনের উদ্ধৃতি দেন:

وانـه لـفـي زبـر الاولـيـن

নিশ্চয় এই কুরআন পূর্ববর্তী উম্মতদের গ্রন্থসমূহেও বিদ্যমান ছিল।

অনুরূপভাবে আল-ইস্পাহানী একথাও মনে করেন না যে, শুধুমাত্র গায়েবের খবর প্রদানই রয়েছে কুরআনের ই'জায।

এখন এ সত্য আমাদের কাছে অতি স্পষ্টভাবেই প্রতিভাত হয় যে আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ গ্রন্থরূপে কুরআন এক চিরন্তন মু'জিযার অধিকারী। স্টাইলের মধ্যে নিহিত রয়েছে এর ই'জায। এই স্টাইলের দিক দিয়ে মনে হয়, আল্ ইস্পাহানী অনেকটা আবদুল কাহির আল্-জুরজানীর অভিমতের অনুসারী। এ প্রসঙ্গে শায়খ আল্-জুরজানী বিভিন্ন উপাদানে গঠিত একটি আঙ্গুরীর উদাহরণ এবং একই উপাদান দিয়ে তৈরী বিভিন্ন প্রকারের অলংকারের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। এমন কি তিনি শায়খ

আল-জুরজানীর চয়নকৃত সেই একই শব্দের পুনরাবৃত্তি করেছেন। কিন্তু তাই বলে সব ব্যাপারেই যে তিনি শায়খ আল্-জুরজানীর অন্ধ অনুকরণ করেছেন, তা নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'সারাফা' মতবাদকে শায়খ আল্-জুরজানী সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে গেছেন। অথচ আল্-ইস্পাহানী উক্ত মতবাদকে স্বীকার করেছেন অতি জোর গলায় অকুণ্ঠ চিত্তে।

আল্-ইস্পাহানীর মতে পবিত্র কুরআনের অভিনব স্টাইলটা সম্পূর্ণ এর নিজস্ব। ইহা অন্য কোন গ্রন্থের বাক্যরীতি বা লিপিছন্দে আদৌ প্রাপ্তব্য নয় আর শোভনীয়ও নয়। তিনি মনে করেন যে, শিক্ষিত আলিম সমাজ কুরআনের ই'জাযকে উপলব্ধি করতে পারেন সাহিত্যিক অভিরুচির মধ্য দিয়ে। সেই নিরলস আলংকারিক কায়দা-কানুনের মাধ্যমে নয়।

'সারাফা' মতবাদ সম্পর্কে আল্-ইস্পাহানীর একটা অতি চিত্তাকর্ষক প্রমাণ হচ্ছে এই: "সে যুগের আলংকারিক পণ্ডিতরা প্রকাশ্য মজলিসে বাহ্যিকভাবে কুরআনের মুকাবিলা করতে পারেন নি। অথচ এ থেকে তাঁদের অপসারিত করে রাখা হয়েছে আভ্যন্তরীণভাবে।" মনে হয় তিনি পবিত্র কুরআনের তফসীর করতে গিয়ে 'ফিরকায়ে বাতেনিয়া'দের সেই জঘন্যতম আন্দোলনের দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। এই বাতেনীয়া সম্প্রদায়ের মতে কুরআনের নাকি একটা আভ্যন্তরীণ গূঢ় রহস্যও (Esoteric meaning) রয়েছে, যা তাদের ইমাম ছাড়া আর কারোর জানার উপায় নই। বস্তুত এই মতবাদের উপর ভিত্তি করে ইসলামের ইতিহাসে বহু ধর্মীয় রাজনীতিক (Politico-religious) আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে আর ইসলামের সমূহ ক্ষতি সাধিত হয়েছে। আসলে তিনি ছিলেন মু'তাযিলা পন্থী এবং তার তাফসীরখানিও ছিল অনুরূপ।

আস্-শাতিবী

আবু ইসহাক ইব্রাহীম বিন মূসা বিন মুহাম্মদ আস্-শাতিবী আল্-গারনাতী (ওফাত ৭৯০ হিঃ) সমকালীন প্রখ্যাত আলিমদের কাছ থেকে শিক্ষা

গ্রহণ করে নিজে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আলিম হিসেবে অভিহিত হন। জীবনে বহু চমৎকার গ্রন্থ প্রণয়ন করে গেছেন তিনি। তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১. 'কিতাবুল মুআফিকাত ফী উসূলিল ফিক্‌হি'।

২. 'কিতাবুল মাজালিস'।

৩. 'কিতাবুল ইফাদাত আল্‌-ইন্‌শাদাত্‌'।

৪. 'হিরযুল আমানী'।

এছাড়া তাওহীদ বা একত্ববাদের উপর তা'র 'আল্‌ ই'তিসাম' নামক অনুপম গ্রন্থটি মিসরের 'আল্‌-মীনার' প্রেস থেকে ১৯০৯ সালে তিন খণ্ডে মুদ্রিত হয়। এর ভূমিকা লিখেন আল্লামা সাইয়েদ মুহাম্মদ রাশীদ রিযা (ওফাত ১৩৬৫ হিজরী)।

ইমাম শাতিবীর এই বিভিন্ন গ্রন্থাবলীর পত্রান্তরালে বিক্ষিপ্ত আকারে ছড়িয়ে রয়েছে ই'জায শাস্ত্র সম্পর্কে তা'র মূল্যবান মতামত। তা'র আল-মুআফিকাত' নামক পুস্তকটি মিসরের সালাফিয়া প্রেসে ১৩৪১ হিজরী এবং পরে ১৩৫৬ হিজরীতে মুদ্রিত হয়। এতে কুরআন সম্বন্ধে তিনি একথা উল্লেখ করেছেন যে, উহা উম্মী নবীর উপর অবতীর্ণ উম্মী শারীয়ত সম্বলিত এক খানা ঐশী গ্রন্থ। ইমাম শাতিবী তা'র এই অমর গ্রন্থে জ্যোতির্বিদ্যা, সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং বাদল বরিষণের সময় ইত্যাদি সম্পর্কেও বেশ মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। এছাড়া আদি মানব জাতির ইতিহাস, ইলমে তিব এবং সর্বোপরি অলংকার শাস্ত্র সম্বন্ধেও তিনি আলোচনা করতে আদৌ কসুর করেন নি। কারণ এই অলংকার শাস্ত্রই ই'জাযুল কুরআনের মূলভিত্তি। কিন্তু যে বস্তুটির উপর ইমাম শাতিবী সবচাইতে বেশী গুরুত্ব আরোপ করতে চেয়েছেন সেটি হচ্ছে এই যে, পবিত্র কুরআনের বর্ণনাভঙ্গী ও বস্তুসমূহের মধ্যে বৈজ্ঞানিক উপাদান বা বিজ্ঞানসম্মত দলীল-প্রমাণ বলতে কিছু নেই। অবশ্য তাঁর এই উক্তির পেছনে যে কোনই যুক্তি নেই,

তা নয়। তাঁর যুক্তির প্রধান ভিত্তি হচ্ছে এই যে, কুরআনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্বসমূহের দাবি যদি সত্য হতো, তবে ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ তথা সাহাবায়ে কিরামও এ দাবী পেশ করতেন অকুণ্ঠচিত্তে। কিন্তু তাঁদের কেউ এ দাবী পেশ করেছেন বলে মনে হয় না। পক্ষান্তরে যাঁরা কুরআনকে বৈজ্ঞানিক উপাদানের ধারক বলে দাবী করেছেন তাঁদের দলীল-দস্তাবীজ নিম্নরূপঃ

(ক) কুরআনের আয়াত "বস্তুত তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি সকল বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনাকারীরূপে এবং (বিশ্ব-মানবের জন্য) হিদায়ত ও রহমতরূপে আর মুসলিম সমাজের জন্য সুসংবাদ হিসেবে।"[১]

(খ) "এই পৃথিবীর বুকে যত পশু বা পাখী রয়েছে, যারা পাখার উপর ভর করে উড়ে, তারা সব তোমাদের মতই উম্মত; আমি এই মহা-গ্রন্থে কোন বিষয় ব্যক্ত করতেই ত্রুটি করিনি।"[২]

(গ) সূরাসমূহের প্রাথমিক অংশগুলোও আরবদের অগোচরে ছিল।

(ঘ) হযরত আলী ইবনু আবু তালিবের অভিমত এর অনুকূলে ছিল অর্থাৎ তিনি নিজেই নাকি এই মতের সমর্থন করতেন।

ইমাম শাতিবী এই প্রমাণগুলোর পাল্টা জবাব দিতে ছাড়েন নি। তাই প্রথম দলীলের অর্থাৎ (ক)-এর খণ্ডন করতে গিয়ে তিনি বলেনঃ আয়াতে "সকল বিষয়" এর অর্থ হচ্ছে সকল ইবাদতের বিষয়। কুরআনের প্রাথমিক অংশগুলো সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, আরবরা সেগুলো সম্বন্ধেও নাকি অবহিত ছিল। য়াহুদী ও খ্রীস্টানদের ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যার চিরাচরিত অভ্যাস থেকেই আরবরা সূরাসমূহের প্রাথমিক অংশ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়েছিল। শেষোক্ত দলীল অর্থাৎ 'হযরত আলীর অভিমত' সম্পর্কে তিনি বলেন যে, পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা কোন ব্যক্তিগত মতামতের মধ্য হতে

১. সূরা নাহল: আয়াত ৮৯; রুকু ১২।
২. সূরা আন'আম: আয়াত ৩৮; রুকু ৪।

পারে না। যাই হোক, পবিত্র কুরআন বৈজ্ঞানিক উপাদান ও মূলতত্ত্বের ধারক কিনা, সে সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করতে ইচ্ছা করছি।

শায়খ সা'দুদ্দীন মাসউদ বিন উমর তাফ্তাযানী (ওফাত ৭৯৩ হিঃ—১৩৮৯ ঈসায়ী) শাফেয়ী মযহাবের অনুসারী হলেও আসলে তিনি ছিলেন মুক্তবুদ্ধির অনুরাগী। তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশলাভ ঘটেছিল অতি শৈশবকাল থেকেই। তাই ১৬ বছর বয়সেই তাঁর প্রথম অবদান 'যানজানীর শারাহ্' প্রকাশ পায়।[১]

তাঁর পাণ্ডিত্য, বিদ্যাবত্তা ও স্মৃতিশক্তি ছিল নিঃসন্দেহরূপে অত্যন্ত প্রখর। তাই তাঁর বিরচিত গ্রন্থমালা থেকে আমাদের পূর্বোক্ত মনীষী শরীফ জুরজানী জীবনের উষাকালে অকুণ্ঠচিত্তে সাহায্য নিয়েছিলেন।[২]

দিগ্বিজয়ী তৈমুরলঙ্গের রাজসভাকে বহুদিন ধরে অলংকৃত করে রেখে-ছিলেন আল্লামা তাফতাযানী। এছাড়া তিনি 'সারাখ স' নামক শিক্ষায়তনেও অধ্যাপনা করেন।[৩]

অতঃপর একদিন তৈমুরের প্রকাশ্য সুধী মজলিসে একটা বিতর্কমূলক অনুষ্ঠানে এই উভয় মনীষীর (তাফতাযানী ও শরীফ জুরজানী) মাঝে একটা তুমুল বাকযুদ্ধের সৃষ্টি হয়। উভয়েই উভয়কে বাজীমাত দেওয়ার প্রাণান্তকর চেষ্টা করেন।

---

১. দুররে কামিলা; হাফিয ইবনু হাজর বাদরুত্ তালে; ১ম খণ্ড; পৃষ্ঠা ৪৮৯।

২. হুকামায়ে ইসলাম: মওলানা আবদুস সালাম নদভী; ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৮।

৩. See Descriptive catalogue of Arabic, Persian and Hindu-stani manuscripts in Bombay University Library, P. 122. Also see Urdu and Arabic manuscripts in the Dacca Univ-ersity Library, Vol. 11, P. 480.

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, ই'জায শাস্ত্রে শায়খ তাফতাযানীর তেমন কোন অবদান নেই। তাই ই'জায শাস্ত্রজ্ঞদের নামের সুদীর্ঘ সূচীতে তাঁর নাম স্বভাবতই অন্তর্ভুক্ত হয় না। কিন্তু তবুও আমরা তাঁর নাম এখানে শুধুমাত্র এই কারণে অন্তর্ভুক্ত করছি যে, তিনি ই'জায শাস্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ অলংকার শাস্ত্রকে নিয়ে সুদীর্ঘ দিন ধরে একনিষ্ঠ সাধনা করেছেন। আর তার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতিস্বরূপ রেখে গেছেন বেশ কয়েকখানা উপাদেয় গ্রন্থ। আজ তাই উপমহাদেশের প্রায় প্রতিটি শিক্ষা নিকেতনে শায়খ তাফতাযানীর অলংকারশাস্ত্রের গ্রন্থাবলী যতটা পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েছে, ততটা আর অন্য কারোর হয়েছে বলে মনে হয় না।

এই অলংকারশাস্ত্র বা ফাসাহাত বালাগাতকে কেন্দ্র করে তিনি সর্বপ্রথম খতীব কাযভিনী কৃত 'তালখীসুল মিফতাহের' এক চমৎকার শারাহ লিখেন। এর নাম 'মুতাওয়াল'। অচিরেই ইহা এই উপমহাদেশ ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এর আভ্যন্তরীণ আলোচনা বা বিষয়বস্তুগুলো ছিল অত্যন্ত লম্বা-চওড়া। তাই চারদিক থেকে, বিশেষ করে ছাত্র মহলের দিক থেকে মুহুর্মুহু অনুযোগ অভিযোগের পালা শুরু হয়। অবশেষে উপর্যুপরি অনুরোধ আসতে থাকে এর সংক্ষিপ্তকরণের জন্য। তাই আর কালবিলম্ব না করে এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ লিপিবদ্ধ করলেন শায়খ তাফতাযানী। এরই নাম 'মুখতাসারুল মা'আনী'। সৌভাগ্যক্রমে এটি প্রথমটির চাইতেও বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এমন কি প্রতিটি আরবী শিক্ষাকেন্দ্রে এই গ্রন্থখানি পাঠ্যতালিকাভুক্ত বই হিসেবে এর পঠন ও পাঠন অতি ব্যাপক ও দিগন্তপ্রসারী হয়ে পড়ে।

শায়খ তাফতাযানীর প্রথম শারাহ অর্থাৎ 'মুতাওয়ালের হাশিয়া' লিখেছেন আরবী ও ফারসী ভাষায় শরীফ জুরজানী, কাসিমী সমরকন্দী, হাসান চেলপী, মুহাম্মদ রিযা, মওলানা হাকীম মুহাম্মদ মুস্লেহুদ্দীন এবং আরও অনেকে। এগুলো যথাক্রমে প্রকাশ পেয়েছে কুসতুনতুনিয়া থেকে ১২৬০, লক্ষ্মৌ থেকে ১২৬৫, তেহরান থেকে ১২৭০, তাবরীয থেকে ১২৭২, ভূপাল থেকে ১৩১১ এবং কায়রো থেকে ১৯১০ সালে।

অনুরূপভাবে তাঁর দ্বিতীয় শারাহ অর্থাৎ 'মুখতাশারুল মা'আনীর হাশিয়া লিখেছেন আল্লামা ইব্রাহীম দাসুকী, শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান সাহেব, মোল্লা যাদাহ এবং আরও অনেকে। এটিকে তিনি উৎসর্গ করেছেন মোংগলদের শেষ শাসনকর্তা জালালউদ্দীন আবুল মুজাফফার খানের নামে।[১]

শায়খ তাফতাযানী এই অলংকারশাস্ত্রকে কেন্দ্র করে নাকি তালখীসুল মিফতাহে'র আরও একটি শারাহ লিখেছিলেন। এর নাম 'আতওয়াল'। এছাড়া ইবনু ইয়াকুব আল আলমাগরিবী 'মাওয়াহিবুল ফাত্তাহ' নামে এবং বাহাউদ্দীন সুবকী 'উরুসুল আফরাহ' নামেও এর শারাহ লিখেন। অলংকারশাস্ত্রে ক্রমোন্নতির এই সিলসিলা যে এখানেই খতম হয়েছে তা নয়।

উনবিংশ শতকের প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক শায়খ নাসিফ ইয়াজিবী (ওফাত ১৮৭১ ঈসায়ী) 'মাজামাউল আদাব' নামে এবং মিশরের মনীষীবৃন্দ 'দুরুসুল বালাগা' নামে এ প্রসংগে সুন্দর সুন্দর পুস্তক প্রণয়ন করেন। মওলানা ফাযলে হক রামপুরী এই শেষোক্ত বইয়ের সুন্দর আরবী শারাহ লিখেন। ফারসী ভাষায় এ প্রসংগে হাদায়েকে বালাহ'ও একটা অমূল্য সংযোজন। ফারসী ভাষায় তালখীসুল মিফতাহের আর একটি শারাহ লিখেন মওলানা খান জামান সাহেব। এটি কানপুর কাইউমী প্রেস থেকে একবার প্রকাশ পেয়েছিল। জনাব মোল্লা মাহমুদ সাহেব জৌনপুরী অলংকারশাস্ত্রে আর একটি কিতাব লিখেন। এর নাম 'ফারাইদ আলা শারহিল ফাওয়াইদ'। এটিও কানপুর থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হয়। আলী জরিম ও এম. আমীনের 'বালাগাতুল অযিহাহ' মওলানা জুলফাকার আলী সাহেবের 'তায্কিরাতুল বালাগা' ইত্যাদি পুস্তকও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মওলানা আবদুল হাকীম শিয়ালকোটি, মীর জামাল, নূরে মুহাম্মদ লাহোরী প্রমুখ মনীষীও শায়খ তাফতাযানীর 'মুতাওয়াল' ও 'মুখতাসার' নামক কিতাবদ্বয়ের হাশিয়া লিখে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন।

১. Descriptive Catalogue of Manuscripts in the Dacca University Library by Dr. A. B. M. Habibullah; Vol. 11, P. 482.

আল্লামা মাস্‌উদ তাফ্‌তাযানী শুধুমাত্র ফাসাহাত-বালাগাতকে কেন্দ্র করেই যে তিন তিনটি কিতাব লিখে ক্ষান্ত হয়েছেন, তা নয়। তাঁর ফারসী ভাষায় লিখিত তাফসীর বিজ্ঞানেও একখানা অতি উপাদেয় কুরআন মজীদের ভাষ্য রয়েছে। কুরআন মজীদের আরও বিশিষ্ট খিদমাত আঞ্জাম দিতে গিয়ে তিনি তাফসীর কাশশাফের একখানা অতি উৎকৃষ্টতম শারাহ লিখেন। পরিতাপের বিষয় যে, একে সমাপ্ত করার পূর্বেই তাঁর জীবনের কৃষ্ণসন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে এবং এই নশ্বর জগতের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে তিনি অবিনশ্বর লোকে গমন করেন।[১]

তাই তাঁর প্রিয় শাগরিদ শায়খ বুরহানুদ্দীন (ওফাত ৮৩০হিঃ)-এর হাশিয়া লিখে সমাপ্ত করেন। হয়তো এগুলোতেও ই'জায সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান মতামত পাওয়া যেতে পারে।

উপরিউক্ত গ্রন্থাবলী ছাড়াও শায়খ তাফ্‌তাযানীর নিম্নলিখিত কিতাবগুলো বেশ প্রণিধানযোগ্য।

১. নিয়ামুস্ সাওয়াবিগ ফী শারহিল কালিমিন নওয়াবিগ।
২. শারাহ আকায়িদে নাসাফিয়া।
৩. শারাহ মাকাসিদুত তালিবীন।
৪. শারাহ রিসালাহ শামসিয়া।
৫. আত্‌তালবীহ ফী হাকায়িকিত তানকীহ।
৬. জাবিতাতু ইনতাজিবুল আশকাল।
৭. শারহুল আরবাঈন আন নববীয়া।
৮. তাহযীবুল মানতিক ওয়াল কালাম।
৯. শারহুস্ তাসরীফ।

---

১. মওলানা আবদুস সামাদ সারিম কৃত তারিখে তাফসীর, পৃষ্ঠা ১০৬।

বস্তুত উল্লিখিত কিতাবসমূলোতে শায়খ তাফ্তাযানীর মননশীল লিপি-কুশলতা, তাঁর স্বচ্ছ, সাবলীল ও সুমার্জিত ভাষা, মুনশীয়ানা বর্ণনাভঙ্গী এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাবিন্যাসের সম্যক পরিচয় মেলে। কবিত্বচর্চার প্রতিও তার ঝোঁক কম ছিল না। এক জায়গায় তিনি আবৃত্তি করেন ঃ

طويت باحراز العلوم ونيلها - رداء شبابى والجنون فنون -

প্রজ্ঞার চর্চাও জ্ঞানানুশীলনের জন্য আমি আমার জীবন-যৌবন-কে শেষ করেছি আর এই জ্ঞান চর্চার উন্মাদনাই হচ্ছে শিল্পকলার নামান্তর। ১

যারকাশী

শায়খ বদরুদ্দিন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন্ আবদুল্লাহ যারকাশী তুর্কী আল মিসরী (ওফাত—৭৯৪ হিঃ—১৩৯১ খৃঃ) মুসলের অধিবাসী এবং শাফেয়ী মযহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করে গেছেন। তন্মধ্যে একটা অনন্য ও অনবদ্য গ্রন্থের নাম 'আল-বুরহান ফী উলুমিল কুরআন।' পবিত্র কুরআনে যত প্রকার ইলম আছে সমস্তই তিনি এতে জমা করেছেন। শুধু তাই নয়, ইলমের এই প্রকার পদ্ধতিগুলোকে তিনি ৪৭ ভাগে তাক্সীম করেছেন। আল্লামা জালালউদ্দীন সুয়ূতীও 'আল-ইতকান' গ্রন্থে শায়খ যারকাশীর বরাত দিয়ে এগুলোর উল্লেখ করেন।২ যারকাশীর এই 'আল্-বুরহান ফী উলুমিল কুরআন' নামক উপাদেয় গ্রন্থটির এক কপি এখন মদীনা মুনাওয়ারায় সংরক্ষিত রয়েছে।৩

---

১. নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁ কৃত 'আত্-তাজুল মুকাল্লাল' ঃ পৃষ্ঠা ৩২৬।

২. আল্লামা সুয়ূতীর 'আল্-ইতকান ফী উলুমুল কুরআন' ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৮।

৩. দেখুন মাজাল্লাতুল মা'আরিফ্ ঃ ১৮ শ সংখ্যা ঃ ডিসেম্বর ১৯২৬, পৃষ্ঠা ৪১১, কায়রো।

ই'জায শাস্ত্র সম্পর্কে শায়খ যারকাশী যে কোন মৌলিক ধারণা বা অভিমত পেশ করেছেন, তা নয়। এ সম্পর্কে তিনি বলেন: কুরআনের ই'জায কোন দলীল-প্রমাণ বা সিফাতের (বিশেষণ) উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আর পূর্ববর্তী লেখকরাও ই'জাযের মূল ভিত্তিক পূর্ণ তাশরীহ করেন নি। এদিক দিয়ে মনে হয় যারকাশী ই'জায শাস্ত্রের বিজ্ঞানসম্মত মতবাদকে সমর্থন করেন অর্থাৎ তাঁর মতে কুরআন মজীদের এখনও কতগুলো এমন অজ্ঞাত অখ্যাত দিক বা অবস্থা রয়ে গেছে—যদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন অলৌকিক।

শায়খ যারকাশীর পিতা ছিলেন জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির গোলাম। তাই শৈশবে পড়ালেখার কোন সুযোগ না পেয়ে তাঁকে যারদোযী বা হাতের সোনালী কারুকার্য শিখতে হয়েছিল। বড় হয়ে তিনি আলেমোর শায়খ শাহাবুদ্দীনের কাছে পড়তে যান। হাদীসশাস্ত্রে তিনি শায়খ মুগলতাঈর ছাত্র। তাছাড়া আল্লামা বালকীনীর কাছেও কিছুদিন ধরে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। দিমাশকের বিচারপতি নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি সিরাজুদ্দীন বালকীনির কাছ থেকে 'রওযা' নামক গ্রন্থটির এক খণ্ড চেয়ে নিয়ে তার উপর হাশিয়া লিখতে শুরু করেন। এভাবে তিনিই সর্বপ্রথম 'রওযা' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের পাদটীকা এবং হাশিয়া লেখেন। এ ছাড়াও নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলো তাঁর ইসলামী মনীষা ও একনিষ্ঠ সাধনার জ্বলন্ত স্বাক্ষর।

১. আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন।

২. তাসনীফুল, মাসামে ওয়া বি জামইল জাওয়াবিস (১৩৩২ সালে মুদ্রিত)।

৩। 'লুকতাতুল ইসলাম' (জামালুদ্দীন কাসেমীর শারাহসহ মিসর থেকে ১৩৩৭ হিজরীতে মুদ্রিত)।

নবম হিজরীতে যে সমস্ত খ্যাতনামা মনীষী তাঁদের পশ্চাতে ছেড়ে গেছেন ই'জায শাস্ত্র সম্পর্কে শ্রেষ্ঠতম অবদান, তাঁদের নাম হচ্ছে ইবনু খালদুন, আল-মারাকেশী এবং জালালউদ্দীন সুয়ূতী।

ইবনু খালদুন

পুরো নাম আবু যায়েদ আবদুর রহমান ওয়ালীউদ্দীন বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ ইবনু খালদুন (ওফাত ৮০৮ হিঃ—১৪০৬ খৃঃ)। তিনি নিঃসন্দেহে মুসলিম জাহানের অদ্বিতীয় চিন্তানায়ক, শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক এবং সমাজবিজ্ঞানের জন্মদাতা। ছোট বড় বহু কিতাবের তিনি রচয়িতা। তন্মধ্যে 'কিতাবুল ইবার' নামক ইতিহাস এবং এর মুকাদ্দিমা তাঁর মহান কীর্তি। বস্তুত এ গ্রন্থই তাঁকে অমর জীবন দান করেছে।

ইবনু খাল্দুনের আসল কৃতিত্ব হচ্ছে ইতিহাসের বিবর্তনশীল রূপকে আবিষ্কার করা। তাঁর মতে তারীখ বা ইতিহাস শুধু যে দীন-ধর্মের সন্ধান দান করে তা নয়, এ হচ্ছে মানবের কর্মসূচীর যথাযথ বিবরণী, মানব সভ্যতা ও ভব্যতা বিকাশের অমর কাহিনী। তাই মু'আররিখ বা ইতিহাসবেত্তার প্রধান কাজ—মানব সমাজের প্রকৃতিতে যে নিত্য নতুন আবর্তন অলক্ষ্যে সাধিত হচ্ছে তা সম্যকরূপে উপলব্ধি করা এবং অকুণ্ঠচিত্তে, অপকটে ও একান্ত নিরপেক্ষভাবে তার নিরংকুশ বিবরণ দান করা। ঊনবিংশ শতকের ডারউইন (ওফাত ১৮৮২ ঈসায়ী) বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদের সূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন ইবনু খালদুনেরই লেখনী থেকে উৎসারিত প্রেরণা নিয়ে।

ইবনু খালদুন তাঁর তারীখ রচনার সর্বপ্রধান হাতিয়াররূপে সমাজ-বিজ্ঞানের সূত্রপাত করেন এবং এ করতে গিয়ে তিনি অতীত ও বর্তমান জীবনযাত্রার সংগৃহীত তথ্যের সাথে তুলনা করে সমাজ ও রাষ্ট্রের ঘটনা-প্রবাহের যে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তা থেকে সাধারণ সূত্র বের করেন। এভাবে জীবনের একনিষ্ঠ সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের সঙ্গে তাঁর অনন্যসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী ও অপূর্ব চিন্তাশক্তির সমন্বয়ে সারা বিশ্ব-জাহানের জ্ঞানভাণ্ডারকে তিনি সমৃদ্ধ করে রেখে গেছেন। তারীখ রচনায় ইবনু খালদুন যে আলোচনা পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তন করেন, তার উপর ভিত্তি করে সুদীর্ঘ পাঁচশো বছর পরে সুপ্রসিদ্ধ English Sociologist বাক্‌ল তাঁর বিরাট History of Civilization প্রণয়ন করেছিলেন। এই দিক দিয়ে ইবনু

খালদ্ন বাক্লের (Buckle) পথিকৃত। কিন্তু শ্ধ্ বাক্ল কেন, পাশ্চাত্য মহলের বহ্ মনীষী, বহ্ দিক দিয়েই ইবন্ খালদ্নের কাছে অশেষভাবে ঋণী। তাই উনবিংশ শতকের শ্র্তেই ইবন্ খালদ্ন ও তাঁর সামাজিক আদর্শের প্রতি ইউরোপীয় পণ্ডিতদের বিশেষ আগ্রহ ও বিভিন্নমুখী অন্রাগ দেখা যায়। অবশেষে তাঁরা সবাই মিলে অবাক বিস্ময়ে এই সত্য উদঘাটন করতে সক্ষম হন যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিকালো ম্যাকিয়াভেলী (Machiavell), ভিক্টোর হিউগো (Victor Hugo), গীবন (Gibbon), ভল্টেয়ার (Voltaire), মনতেসকিউ (Montesquieu), অ্যাডাম স্মীথ্ প্রম্খ মনীষীর রচনা ও চিন্তাধারায় ইবন্ খালদ্নেরই ভাব প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ঐতিহাসিক আলোচনার অপরিহার্য অঙ্গ এই সমাজ বিজ্ঞান ও দর্শন যে পাশ্চাত্য লেখকের মৌলিক অবদান নয়, তা তাঁরা ইবন্ খালদ্নের রচনা পড়ে বেশ ভালোভাবেই ব্ঝতে পেরেছেন।

এ ছাড়া অস্ট্রিয়ান লেখক ভন ক্রেমার ও ওলন্দাজ পণ্ডিত দ্য বোয়ার এ সম্পর্কে ইউরোপীয়ান স্ধীসমাজের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

৪৫ বছর বয়সে ইবন্ খালদ্ন রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কারণ বারংবার নানা বিপদের সম্ম্খীন হয়ে এই ন্যক্কারজনক রাজনীতির প্রতি তিনি ইতিপূর্বেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। একটা দ্র্বার বিতৃষ্ণা ও ধিক্কার এসে তার দেহ ও মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। ইতিমধ্যে বানী আরিফ উপজাতির মধ্যে তিনি অবস্থান করতে শ্র্ করেন। বানী আরিফ সর্দার তাঁকে তুজিন নগরের সন্নিকটে সালামা দ্র্গের মধ্যে বসবাস করার জন্য একটি প্রাসাদ দান করেন। এই নির্পদ্রব, নির্জন ও শান্তিপূর্ণ জীবনকে কাজে লাগাতে গিয়ে দীর্ঘ চার বছর ধরে তিনি একাগ্রচিত্তে জ্ঞানচর্চায় লেগে যান। কারণ রাজনীতির ঝামেলায় নিরবচ্ছিন্ন শান্তি তাঁর ভাগ্যে কোনদিনই জোটেনি। দীর্ঘ দিনের বাস্তব অভিজ্ঞতা, অগাধ পাণ্ডিত্য এবং নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান সাধনায় অমৃতময় ফলস্বরূপ এখানেই তাঁর বিশ্ববিশ্র্ত ইতিহাসের পরিকল্পনা সূচিত হয় এবং এখানেই তাঁর অমরকীর্তি ম্কাদ্দিমা অর্থাৎ ইতিহাসের ম্খবন্ধ বা অবতরণিকার প্রণয়ন শ্র্ হয়।

আশ্চর্যের বিষয় যে, মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই একে সমাপ্ত করে তিনি মূল গ্রন্থ 'কিতাবুল ইবার' (The Book of admonitions) প্রণয়নে হাত দেন। এর পুরো নাম 'কিতাবুল ইবার ওয়া দিউয়ানুল মুবতাদা ওয়াল খাবার ফী আইয়্যামিল আরাব ওয়াল আজাম ওয়াল বারবার ওয়া মান আসারাহুম মিন যাবিস সুলতানিল আকবার'।

মাল-মসলা ও তথ্যানুসন্ধানের জন্য অবশ্য তাঁর জ্ঞান পিপাসু ও অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে মাঝে মাঝে তাঁকে বিভিন্ন শিক্ষায়তনে ও গ্রন্থাগারে গিয়ে হাযির হতে হয়েছে। ৭৮২ হিজরী মুতাবিক ১৩৮০ ঈসায়ীতে তিনি তিউনিসের যাইতুন ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে উপনীত হন এবং সেখানকার গ্রন্থাগারে বসেই তিনি ইতিহাস রচনা খতম করেন। সমাপ্তির পর ইবনু খালদুন ইহার এক কপি তিউনিসের সুলতান আবুল আব্বাসকে উপহার দেন। দিগ্বিজয়ী আমীর তাইমুরের মিসর অভিযান প্রাক্কালে ইবনু খালদুন দামেশ্‌ক নগরীতে উপনীত হন সন্ধির পয়গাম নিয়ে। তাইমুর সসম্মানে এই বিশ্ব ঐতিহাসিকের ইস্তিকবাল করেন। আর ঐতিহাসিকও তাইমুর স্বরচিত গ্রন্থ উপহার দেন। অতঃপর উভয়ের মাঝে সুদীর্ঘ আলোচনা শুরু হয় এবং তাইমুর উত্তর আফ্রিকা অভিযানে বিরতি দিয়ে প্রত্যাগমন করেন।

বস্তুত সুদীর্ঘ দিন ধরে সামাজিক জীবন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা তথা সর্বতোমুখী অতুলনীয় প্রতিভাই তাঁকে ইতিহাস রচনার কাজে সাহায্য করেছিল সবচাইতে বেশী। এ ছাড়া ব্যক্তিগত বাস্তব অভিজ্ঞতাও তাঁকে কম সাহায্য করেনি। কারণ মুসলিম জাতির সেই পতনোম্মুখ যুগে শতধা বিচ্ছিন্ন মুসলিম সমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ও রাজ্যাধিপতিদের ক্ষমতার রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্বের তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী। শুধু সাক্ষীই নন, বরং একাধিক সুলতানের শাসনকার্যের সঙ্গে ওতপোতভাবে ছিলেন সম্পৃক্ত। অনন্য সাধারণ বুদ্ধিমত্তার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি উচ্চতম মর্যাদার একাধিক রাজকীয় পদে অধিষ্ঠিত থেকে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

ইবনু খালদূনের এই বৈচিত্র্যময় পূর্ণ ইতিহাসটিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে।

১. 'মুকাদ্দিমা' অর্থাৎ মুখবন্ধ বা উপক্রমণিকা।[১]

২. মুসলিম আরব ও তৎপার্শ্ববর্তী অধিবাসীবৃন্দের ইতিকাহিনী এবং তৎসংগে অনারব রাজবংশগুলোর প্রামাণ্য ইতিহাস।

৩. বারবার ও উত্তর আফ্রিকায় অধ্যুষিত রাজবংশের পূর্বাঞ্চল ও ইউরোপীয় রাজ্যসমূহের ইতিহাস।

এই তো গেলো গোটা ইতিহাসটির শ্রেণীবিভাগ। এছাড়া শুধুমাত্র মুকাদ্দিমাকেই সাতটি বিভিন্ন পর্যায়ে বা অনুচ্ছেদে বিভক্ত করে অগণিত বিষয়-বস্তুকে নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি। এই বিভক্তিকরণ ও অনুচ্ছেদের বিন্যাসেও ইবনু খালদূনের বৈজ্ঞানিক মন সমভাবে তৎপর।

সত্যি বলতে কি, ইবনু খালদূনের এই 'মুকাদ্দিমা' পৃথিবীতে সমাজ-বিজ্ঞানের সর্বপ্রথম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, বরং বিশ্ব-জাহানের বুদ্ধিভিত্তিক ইতিহাসে এক বিস্ময়কর অবদান।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও কবি হিসেবেও ইবনু খালদূনের যোগ্যতা কোন অংশেই কম ছিল না। কিন্তু একজন কামিয়াব সমালোচক হিসেবেই বোধ করি তাঁর সাফল্য সন্দেহাতীত। যে কোন সমালোচনায় তাঁর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-শক্তি ও সামাজিক দৃষ্টিভংগীর পরিচয় অতি সুস্পষ্ট ও সুপ্রকট। এই মুকাদ্দিমায় শুধু যে তিনি ই'জাযের প্রশ্ন নিয়েই মূল্যবান আলোচনা করেছেন তা নয়, বরং ধর্মের খুঁটিনাটি বিষয় ও কুরআনের জটিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যগুলোর সঠিক যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা ও জবাব দিয়ে গেছেন। ই'জায শাস্ত্র সম্পর্কে ইবনু খালদূন তাঁর সুপ্রসিদ্ধ মুকাদ্দিমায় বলেন ঃ অলংকার শিল্পের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহা কুরআনের ই'জাযকে যথাযথরূপে উপলব্ধি করতে

১. Prolegomena: Translated into English by Frana Rosenthal and Shortened by Charles Issawi.

সহায়তা করে এবং প্রেরণা যোগায়। কারণ কুরআনের এই ই'জায সর্ব অবস্থাতেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে বর্ণনার অনবদ্যতায় সমৃদ্ধ। অপূর্ব বাক্য বিন্যাস ও শব্দ যোজনায় ঝংকৃত কুরআন আরবী সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। কোটি কোটি মুসলিম নর-নারীর পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। শব্দের গঠনপ্রণালী, সৌন্দর্য ও চয়নের দিক দিয়ে ইহা পূর্ণতার এক উচ্চতম অনুপম রূপ।

কুরআনের এই ই'জায শাস্ত্রকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করা আপাতদৃষ্টিতে দুঃসাধ্যই বটে; কিন্তু এ সম্বন্ধে যাদের ভালো অভিরুচি ও প্রবণতা রয়েছে, তাদের জন্য একে অনুধাবন করা আদৌ কঠিন কাজ নয়। তাই সাধারণত এ কারণেই আরবরা ইহা শোনামাত্রই এর যথাযথ মূল্যায়নে পূর্ণমাত্রায় সক্ষম হয়েছিল। কারণ তাদের অধিকাংশই ছিল অতি সুন্দর সাহিত্যিক অভিরুচির মালিক।

পবিত্র কুরআনের ভাষ্যে যাঁরা ব্রতী হন তাঁদের জন্য এই সাহিত্যিক অভিরুচি এবং আলংকারিক শিল্পকলা অত্যাবশক ও অনস্বীকার্য। দুঃখের বিষয়, অতীতের অধিকাংশ ভাষ্যকারই এই শিল্পকলাবর্জিত ছিলেন। অতঃপর আল্লামা জারুল্লাহ যামাখ্শারী তাঁর প্রসিদ্ধ তাফসীর কাশ্শাফ লিখেছেনঃ পবিত্র কুরআনের প্রতিটি বিষয়বস্তু উক্ত শিল্পকলার আলোকে আলোচনা-পর্যালোচনা ও বিচার বিশ্লেষণ করেন। এতে করে কুরআনের ই'জায শাস্ত্রের দিকটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও সুপ্রকট হয়ে ওঠে। এদিক দিয়ে তাই আল্লামা যামাখ্শারীর অবদান অতুল্য, অনন্য।

এক কথায়, অলংকারশাস্ত্রের মাধ্যমে কুরআনের ই'জায শাস্ত্র যে ক্রমবর্ধমান তরক্কী হাসিল করেছে তৎপ্রতি ইবনু খালদুন পূর্ণ আস্থাবান। তিনি বলেনঃ এই ফাসাহাত বালাগাত বা অলংকার শাস্ত্রে যারা যত ভালো অভিরুচির মালিক, তারা কুরআনের ই'জায শাস্ত্রকে ততোধিক পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করতে সক্ষম। তিনি আরও বলেনঃ নবী মুস্তফার (সঃ) যুগে তদানীন্তন আরবরা এদিক দিয়ে ছিল অধিকতর উন্নত। সুতরাং কুরআনের ই'জায সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করতেও তারা ছিল বিপুল পারদর্শী ও পূর্ণতর যোগ্যতার মালিক।

বস্তুত ইবনু খালদুন কুরআনের জটিল বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলোর নির্ভুল, সন্তোষজনক ও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দান করতে অত্যন্ত তৎপর ও পারদর্শী ছিলেন। তাই তাঁর কায়রোস্থিত বাড়ীটাতে আল্-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সব সময় এত বেশী ভিড় জমে যে, তাকে বিরাট শিক্ষাকেন্দ্র বললে আদৌ অত্যুক্তি হয় না।

ইবনু খালদুন তাঁর প্রসিদ্ধ মুকাদ্দিমার এক স্থানে কবিতার মান নির্ণয় করতে গিয়ে বললেনঃ শুধুমাত্র ব্যাকরণগত বাক্যবিন্যাসে কবিতা হয় না। বাচনভঙ্গীর শব্দসমন্বয় ও বিভিন্ন শব্দের পারস্পরিক অবস্থানে কবিতার আধার নির্মিত হয়।'

শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ও অদ্বিতীয় চিন্তানায়ক হিসাবে পাশ্চাত্য জগতের সুধীমহলে ইবনু খালদুনের নাম বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা-অর্ঘের সাথে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু প্রাচ্যে তাঁর মনীষী ও মেধার পূর্ণ স্বীকৃতি হাসিল হয়েছে অনেক দেরীতে। ইউরোপিয়ান মনীষীদের কাছ থেকে ভূরি ভূরি প্রশংসা ও উচ্চতর সাধুবাদ পাওয়ার বহুদিন পর ইবনু খালদুন সম্বন্ধে প্রাচ্যদেশেও ধীরে ধীরে একটা অদম্য কৌতূহলের সাড়া পড়ে যায়। ১৩৩২ ঈসায়ীতে মিসরে তাঁর ৬০০ তম জন্ম বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয় মহা-সমারোহে। এ উপলক্ষে আরব জগতের সর্বত্রই ইবনু খালদুন সম্পর্কে একটা অপূর্ব আলোড়ন ও উদ্দীপনার ঢেউ খেলে যায় এবং তার স্মৃতির প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন ও মৃত আত্মার প্রতি মাগফিরাত জ্ঞাপন করা হয়।

আগেই বলেছি, ইউরোপীয় ভাষায় অনেক আগেই ইবনু খালদুনের বইগুলো ভাষান্তরিত এবং সংক্ষেপিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, সমালোচকদের কাছ থেকেও খেরাজে তাহসীন বা প্রশংসা লাভ করেছে। এদিক দিয়ে আমাদের বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য তেমন নির্ভরযোগ্য পুস্তক-পুস্তিকার যে একান্ত অভাব—তা' বলাই বাহুল্য।

ইবনু খালদুনের ইন্তিকালের প্রায় তিনশ' বছর পর ১৬৯৭ সালে তাঁর প্রথম ইউরোপীয় জীবনী প্রকাশ করেন D' Herbelot তাঁর Biblitheque-

Orientale নামক গ্রন্থে। এরপর ইবনু খালদুনের নির্ভরযোগ্য ও পূর্ণতর জীবনী গ্রন্থ ফরাসী ভাষায় রচনা করেন পন্ডিত সিলভেস্টার দ্য সাসী। তিনি ইবনু খালদুনের বইয়ের অংশ বিশেষের ফরাসী ভাষায় তরজমাও করেন। ইবনু খালদুনের বিস্তৃততম ও নির্ভরযোগ্য জীবনবৃত্তান্ত ও চিন্তাধারা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়ার জন্য আমার মনে হয় তাঁর হস্তলিখিত 'আত্মচরিত' খানিই সবচাইতে উৎকৃষ্ট। এর নাম 'আত্‌তারীফ বি ইবনে খালদুন'।

প্রফেসর এ. জি. টয়নবি বলেন: "This prolegomena is the greatest work of its kind that has ever been created by any time or place." এই মুখবন্ধ বিশ্ব-ভুবনের মাঝে এমন একটা সুন্দরতম সৃষ্টি, যা কোন মানব-শক্তির দ্বারা কোনকালে বা কোন স্থানে কখনো সম্ভব হতে পেরেছে।[১] বারুন দে স্ল্যান ফরাসী ভাষায় ইবনু খালদুনের সমস্ত বইয়েরই তরজমা করেছেন।[২]

শায়খ আল-মারাকেশী

'আল মিসবাহ' নামক কিতাবের শারাহ লিখেছেন আল্লামা শায়খ আল-মারাকেশী। তিনি এতে ই'জাযের প্রশ্ন নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী এই মনোজ্ঞ আলোচনার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন:

"الجهة المعجزة في القران تعرف بأدنى تفكير في علم البيان وهو كما اختارة جماعة في تعريفه ما يحترز به عن الخطاء في تادية المعنى وعن تعقيده ويعرف به وجوه

১. See—A Study of History : by Prof. A. I. Toynbee ; Oxford, 1935, 2nd Edition, P. 322.

২. ইউসুফ সারকেস কৃত মু'জামুল মাতবু'আত—১৯২৪ সালে মিসর থেকে মুদ্রিত।

تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه المقتضى الحال لان جهة اعجازه ليست مفردات الفاظه والا لكانت قبل نزوله معجزة ولا مجردتا عليها ـ

পবিত্র কুরআনের মু'জিযার যে সংজ্ঞাকে বিশেষ একটা গ্রুপ পছন্দ করেছে তা' হচ্ছে এই যে, ইলমে বায়ান' বা কুরআনের অপূর্ব আলংকারিক বর্ণনারীতির প্রতি গভীর গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে এর ই'জায নয়নসমক্ষে প্রতিভাত হয়ে উঠে। কারণ এই 'ইলমে বায়ান' বা আলংকারিক বর্ণনারীতিই কোন প্রকার জটিলতা বা দুর্ভেদ্যতা ব্যতিরেকে অন্তরের অন্তঃস্থিত মনোভাবকে ব্যক্ত করার একমাত্র বাহন। এর মাধ্যমে যে অর্থ প্রকাশ করা হয় তাতে মানুষ ত্রুটি, প্রমাদ বা কাঠিন্য থেকে রক্ষা পেতে পারে। কুরআনের ই'জায তাই কোন শব্দ বিশেষ বা শব্দের সংযোজন ধারায় আবদ্ধ নয়। কোন পৃথক শব্দ সম্ভারের প্রতি নির্ভরশীলও নয়। কেননা, তাহলে তো কুরআন নাযিল হওয়ার আগে বা এর শব্দগুলোর যোজনার পূর্বেই তা' মু'জিযা হয়ে দাঁড়াতো। শুধু তাই নয়, মুসায়লামা কায্যাবের অপবিত্র মুখের শব্দগুলোও মু'জিযা হয়ে দাঁড়াতো।

(আল-ইতকান : ২য় খণ্ড ; পৃষ্ঠা ১১০)

আল-মারাকেশী বলেন : কুরআনের ই'জায সারাফা মতবাদের মধ্যেও নিহিত নয়। আর একথাও স্বতঃসিদ্ধ যে, আরবদের মুখের ভাষা হওয়া সত্ত্বেও তারা কুরআনের মুকাবিলা করতে সক্ষম হয়নি।

এদিক দিয়ে আল-মারাকেশীর অভিমত ঠিক যেন ইয়াহিয়া আল আলাভীর মতই, যে অভিমত তিনি ব্যক্ত করেছেন তাঁর 'আত-তিরায নামক অমর গ্রন্থে। ই'জায শাস্ত্র সম্পর্কে পরবর্তী মনীষীদের অভিমতও প্রায় অনুরূপ। অবশ্য অলংকার বিজ্ঞান বলতে এই আলংকারিক মনীষীরা যা বোঝাতে চেয়েছেন, এতে কিছুটা যে পার্থক্যও না আছে এমন নয়। আল-মারাকেশী মনে করেন যে, অলংকার শাস্ত্র শব্দের নির্মলতা,

স্বচ্ছতা ও যথার্থতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, অথচ আল-আলাভীর মতে আলংকারিক সদগুণে ভূষিত হওয়ার জন্যে সাহিত্যকর্মের কতগুলো অতিরিক্ত সদগুণের সমাবেশ থাকাই যথেষ্ট। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, আল-মারাকেশী 'সারাফা' মতবাদকে সম্পূর্ণরূপেই অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করতে চেয়েছেন, যে মতবাদকে ইতিপূর্বে আল-ইস্‌পাহানী কুরআনের আলংকারিক গুণাগুণ সম্পর্কে দলীল-প্রমাণের ক্ষেত্রে একটা অতিরিক্ত অথচ অন্যতম কারণ হিসেবে স্বতঃসিদ্ধরূপে দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করে গেছেন। পাক-ভারতের আর একজন মনীষী 'মিসবাহী' গ্রন্থের শারাহ লিখে অমরতা লাভ করেছেন। তিনি হচ্ছেন সা'দুদ্দীন খায়রাবাদী (ওফাত ৮৮২ হিঃ—১৪১৭ ঈসায়ী)। (See Zubaid Ahmad's Contribution of Indo-Pakistan to Arabic Literature : P. 454)

কাসেম বিন্ কোতলুবাগা

'হিদায়ার' শারাহ ফাতহুল কাদীরের লেখক শায়খ ইবনু হোমাম আল-হানাফী আল-ইস্‌কান্দারী (ওফাত ৮৬১ হিঃ) 'তাহরীর ফী উসূলিদ-দ্বীন' এবং 'আল মুসায়ারাহ ফী উসূলিদ-দ্বীন নামক দু'টি কিতাব প্রণয়ন করেন। এই শেষোক্ত গ্রন্থ অর্থাৎ 'আল-মুসায়ারা'র ব্যাখ্যা লিখেছেন কামালুদ্দীন বিন্ আবী শরীফ আল-মাক্‌দিসী আশ'শাফেয়ী (ওফাত ৯০৫ হিঃ) এবং শায়খ জাইনুদ্দীন কাসেম বিন্ কোতলুবাগা (ওফাত ৮৭৯ হিঃ)—এই দু'জন মিলে।[১]

এতে ইসলাম ধর্মের মূল সূত্র সম্বন্ধে আলোচনা থাকলেও কুরআনের বাকরীতি, মু'জিযা এবং এর সাহিত্যিক মানের যথার্থ মর্যাদা সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত অথচ মনোজ্ঞ ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিতাবটি ১৩১৭ হিজরীতে বুলাক প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। কাসেম বিন্ কোতলুবাগা

১. দেখুন আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী কৃত মুশকিলাতুল কুরআনের ভূমিকা এবং ইউসুফ সারকেস কৃত মুজামুল মাতবু'আত।

ছিলেন হানাফী মযহাব এবং মাতুরিদীয়া আকীদার অনুসারী। প্রথমোক্ত শারিহ অর্থাৎ শায়খ কামালুদ্দীন বিন আবী শরীফ আশ্-শাফেয়ীর লিখিত 'আল-মুসায়ারা' ছাড়া আরও কতকগুলো কিতাব রয়েছে। যেমন—

১. আল-ইস্‌আদ বি-শারহিল ইরশাদ।

২. আল-ফারাইদ ফী হাল্লি শারহিল আকাইদ।

৩. আদ-দুরারুল লাওয়ামি বি তাহরীরি জামইল জাওয়ামি।

আস-সুয়ূতী

হিজরীর দশম শতক আর ঈসায়ীর ষোল শতকের খ্যাতিমান লেখক ও শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক আল্লামা জালালউদ্দীন সুয়ূতী। তাঁর পুরো নাম আবুল ফজল আবদুর রহমান বিন আবু বাক্‌র কামালউদ্দীন বিন মুহাম্মদ বিন সাবেকুদ্দীন বিন উসমান আল খুযরী আশ্-শাফেয়ী (ওফাত ৯১১ হিঃ—১৬০২ খৃঃ)। জালালউদ্দীন ছিল তাঁর লকব আর সুয়ূতী ছিল নিসবাত। তাঁর আম্মা ছিলেন একজন বিদুষী রমণী। তাই পিতৃহারা হওয়ার পর তিনি এই বুদ্ধিদীপ্ত ছেলের অতি শৈশবেই যথোপযুক্ত বিদ্যানুশীলনের সব রকমের সুবন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। আট বছর বয়সেই তিনি 'হাফিজে কুরআন' নামে অভিহিত হন। অতঃপর সমকালীন সকল জ্ঞানীগুণীর কাছ থেকে তাফসীর, হাদীস, তারীখ, অলংকারশাস্ত্র, ভাষাতত্ত্ব, দর্শন, ইলমুল কালাম প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তিনি অনন্য মনে অধ্যয়ন করেন এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন। ইতিহাস ও কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যায় তাঁর অনুসন্ধিৎসু চিত্তের আকুল আবেগ নিয়ে ছোট্ট থেকেই তিনি গভীরভাবে চিন্তা করতে ভালবাসতেন।

মুতাআখখিরীন বা ইসলাম জগতের পরবর্তী আলিমকুলের মধ্যে আল্লামা সুয়ূতী নিঃসন্দেহে এমন একটা সুউচ্চ স্থান অধিকার করে রয়েছেন, যেখানে

অন্য কেউ শরীক হতে পারবে বলে মনে হয় না। তাঁর এক একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান এমন রয়েছে, যা কালের আবর্তনেও কোনদিন মুছে যাবার নয়। মুসলিম জনগণের মনের কোণে চিরদিন তা' উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় ভাস্বর হয়ে থাকবে।

শিক্ষার্থী জীবন সমাপনান্তে আল্লামা জালালউদ্দীন সুয়ূতী শিক্ষাদানকেই জীবনের সুমহান ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। কায়রো ইনিভার্সিটির অধ্যাপক রূপেই তাঁর এই কর্মবহুল জীবনের সূচনা হয়। প্রায় সারাটি জীবন ধরে অধ্যাপনার এই মহান দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও অবসর সময়ে তিনি লেখনী চালাতে থাকেন আনত নয়নে এবং অস্থির ও অবিশ্রান্ত গতিতে। এভাবেই তাঁর কর্মবহুল জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। তাঁর লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা একটা দুটো নয়, বরং একেবারে ৫০০ খানি। এদিক দিয়ে সত্যিই তিনি একটা নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।

'দিয়ানুল ইসলাম' নামক গ্রন্থে সুয়ূতী সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য পেশ করা হয়েছে :

صاحب المؤلفات الحافلة الجامعة النافعة المتقنة التى تزيد على خمس مائة مصنف وقد تداولها الناس وتلقوها بالقبول واشتهرت وعم النفع بها —

ব্রকম্যান লিখেছেন যে, ইমাম সুয়ূতীর গ্রন্থের সংখ্যা ৪১৫ খানি। মনীষী এইচ. জি. ফ্লুগেল বলেছেন ৫৬০ খানি। জামীল বেগ আয়াম তাঁর 'উকদুল জাওয়াহির' নামক গ্রন্থে বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা ও মাকামাত ইত্যাদি দিয়ে মোট সংখ্যা নির্ণয় করেছেন ৫৭৬ খানি। স্বয়ং আল্লামা সুয়ূতী তাঁর 'হুসনুল মুহাযিরা' নামক পুস্তকে স্বীয় গ্রন্থের যথার্থ সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করেন। নিম্নে আমরা কতকগুলোর নাম দিচ্ছি :

১. ইত্‌মামুদ দিরায়া লি কিরাআতিন নিকায়া (এর হাশিয়ায় রয়েছে ইমাম সাক্কাকীর 'মিফতাহুল উলূম')

২. নুবাবুস সুকুল ফী আসবাবিন নুযুল (তাফসীর জালালাইনের হাশিয়ায় মুদ্রিত)

৩. আল-ইকলিল ফী ইসতিমবাতিন তানযীল (এর হাশিয়ায় রয়েছে মুঈনুদ্দীন আইজি সাফাদীর লিখিত তাফসীর জামেউল বায়ান)

৪. 'আল-ইযাহ ফী ইলমিন নিকা'।

৫. 'আল্-বুদূরুস সাফিরা ফী আহওয়ালিল আখিরা'।

৬. তুহফাতুল মাজালিস ওয়া নুযহাতুল মাজালিস।

৭. তরজমাতুল কুরআন ফী তাফসীরিল মুসনাদ।

৮. আদ-দুরারুল মুনতাসারা ফী আহাদীসিল মুশতাহারা।

৯. আদ-দীবাজ আল সাহীহ মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ।

১০. নারহুদ শাওয়াহিদি মুগনি আল-লাবীব (মূল গ্রন্থের লেখক ইবনু হিশাম)

১১. আশ-শামারীখ ফী ইলমিত-তারীখ (বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত সীবাল্ড এর বিস্তারিত ভূমিকা লিখে লেইডেন থেকে ১৮৯৪ সালে প্রকাশ করেন)

১২. আল-কানযুল মাদফুন ওয়াল ফুলকুল মাশহুন (অনেকের মতে ইহা শারফুদ্দীন ইউনুস মালেকীর লেখা)

১৩. আল-মুকামাতুস সনদুনিয়া ফিন নিসবাতিশ শারীফা আস্-মুস-লাফাভীয়া।

১৪. আল-ইতকান ফী উলুমিল কুরআন।

এই শেষোক্ত গ্রন্থটিই বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এতে উলুমে কুরআন ও উলুমে তাফসীর সম্পর্কে ৮০ রকমের প্রকার-পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। Dr. Sprenger এর শারাহ লিখেছেন। এটি

কলকাতায় মুদ্রিত হয়েছে। মিসর থেকে মুদ্রিত এডিশনের হাশিয়ায় রয়েছে আবু বাকর আল-বাকিল্লানীর অমর অবদান 'ই'জাযুল কুরআন'। এটি কায়রোর মুসতাফা হালাবী প্রেস থেকে ১৩৭ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাস এবং ১৯৫১ ঈসায়ীর জানুয়ারী মাসে দুই খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৪ নং প্রকারে তিনি 'ই'জাযুল কুরআন' নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেন।

আল্লামা জালালউদ্দীন সুয়ূতীর এই 'ইত্‌কান' গ্রন্থটি আসলে তাঁর 'মাজ-মাউল বাহরাইন' নামক সুবিখ্যাত তাফসীরের মুখবন্ধ। বলা বাহুল্য, এই মুখবন্ধটি এতদূর জনপ্রিয়তা হাসিল করতে সক্ষম হয়েছে যে, সুদূর মরক্কো থেকে নিয়ে পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলিম জনসমাজে অতি আগ্রহের সাথে পঠিত হয়। শুধু 'আল্‌-ইত্‌কান' কেন, সুয়ূতীর প্রতিটি গ্রন্থই অতি উপাদেয় এবং সুখপাঠ্য। যেহেতু তাঁর রচনাবলীর মাঝে জনগণের প্রকৃত চাহিদার সকল উপকরণ ছিল পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, তাই তাঁর ছোট পুস্তক-পুস্তিকা অতি সহজেই জনসাধারণের শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। আর তাঁর খ্যাতি শোহরাত মুসলিম জাহানের প্রতিটি আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি, মুসলিম সভ্যতা ও তমদ্দুন বৈজ্ঞানিক উপায়ে জনগণের মাঝে প্রসার লাভ করার পক্ষে তাঁর লেখনীই হয়েছে সর্বদিক দিয়ে কার্যকরী। গণকল্যাণের দিক দিয়ে তাই তাঁর দান অত্যন্ত মহৎ। আর এইজন্য তিনি আজ ইতিহাসের পাতায় লাভ করতে পেরেছেন অমর জীবন।

আল্লামা জালালউদ্দীন সুয়ূতী তাঁর 'আল্‌-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন' নামক অমর গ্রন্থে ই'জাযুল কুরআনের প্রশ্নগুলোকে সামনে নিয়ে অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রয়াস পেয়েছেন। উক্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কে সমস্ত পূর্বসূরির মতামতকে পুনর-ৎপাদিত করে তিনি পরস্পরের সাথে যোগসূত্রকে মিলিয়ে দেখেছেন এবং তুলনাও করেছেন। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত কোন চূড়ান্ত মতামতকে তিনি ব্যক্ত করতে চান নি। এমন কি কোন সাবেক অভিমতের সমালোচনা করতে প্রবৃত্ত হন নি তিনি। ই'জায

শাস্ত্র সম্বন্ধীয় অন্যান্য সিদ্ধান্তগুলোর সাথে সারাফা মতবাদেরও তিনি উল্লেখ করতে কসুর করেন নি। এ প্রসংগে তিনি কুরআনের আলংকারিক অভিনবত্ব, এর অদৃশ্য সংবাদ প্রদান এবং এর বিশেষ বিশেষ গুণাবলীর কথাও ব্যক্ত করেছেন অকুণ্ঠচিত্তে। অবশ্য তাঁর লেখা থেকে এটুকু জানবার উপায় নেই যে, কোন্ মতটিকে তিনি সাদরে কবুল করেছেন, আর কোন্‌টিকে করেছেন সমূলে প্রত্যাখ্যান।

ইমাম সুয়ূতীর মতে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সবক নেয়া যেতে পারে কুরআন থেকে। এই আলোচনায় তিনি বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন আল্-ইতকানের 'ই'জাযুল কুরআন' শীর্ষক অধ্যায়ে। বিভিন্ন অভিমতের প্রতিপাদনকল্পে কুরআনের আয়াত এবং রসূল (সঃ)-এর বিভিন্ন হাদীসেরও উদ্ধৃতি দিয়েছেন তিনি। ইমাম সুয়ূতী এই অভিমত পোষণ করেন যে, কুরআন সর্বপ্রকার ধর্মীয় ও প্রাকৃতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং বিদ্যা-বুদ্ধির আকর। এদিক দিয়ে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী মনীষী ইমাম গাযযালী ও ইমাম যারকাশীর অভিমতকেও যেন অতিক্রম করে গেছেন। অথচ আস-শাতিবী ইতিপূর্বেই এ মতের বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে জোরসে কলম চালিয়েছেন।

ই'জায ও মু'জিযার অর্থ সম্পর্কে ইবনুল আরাবীর মতামতের বিবরণ সহ ইমাম সুয়ূতী কৃত আল-ইতকানের এই অধ্যায় শুরু হয়েছে। উক্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কে হাফেজ ইবনু হাজর আল-আসকালানী (ওফাত ৮৫২ হিঃ) কৃত 'ফাতহুল বারী' নামক সহীহ্ বুখারী শরীফের অনুপম ও বিশদ ব্যাখ্যা-গ্রন্থে বর্ণিত মতামতেরও তিনি উল্লেখ করেন। কিন্তু মনে হয় যে এক্ষেত্রে ইবনুল আরাবীর মতামতকেই বেশ প্রবণতা সহকারে তিনি পেশ করতে চেয়েছেন। অতঃপর তিনি কুরআন করীমের ঐ সমস্ত আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যেগুলো আরবদের কাছে পেশ করা হয়েছিল মুকাবিলার জন্য।

ইমাম সুয়ূতী তাঁর উদ্ধৃত চ্যালেঞ্জ সম্বন্ধীয় কুরআনী আয়াত-গুলোকে শৃংখলা করতে গিয়ে বলেন যে, সর্বপ্রথমে মুকাবিলার জন্য

কুরআনের বৃহদাংশকে পেশ করা হয়েছিল। অতঃপর কুরায়শ কওমের তদানীন্তন অবস্থা এবং প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পাঠকবৃন্দের শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে কতকগুলো ঐতিহাসিক রিওয়ায়েতের তিনি উল্লেখ করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ওয়ালীদ বিন মুগীরা আঁ হযরত (সঃ)-এর মুখে পবিত্র কুরআনের আয়াত শুনে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেছিল যে, ইহা মানব রচিত নয়।[১]

খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) প্রমুখ অন্যান্যদের সাথেও ঠিক এই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। কুরআন নাযিল হওয়ার অব্যবহিত পর আরবদের মাঝে যে একটা শব্দগত সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়েছিল, সে সম্পর্কে ইমাম সুয়ূতী আল-জাহিযের মতামতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। 'সারাফা' মতবাদ সম্পর্কে আন-নাযযামের অভিমতের কথাও তিনি ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু আন-নাযযামের অভিমতকে তিনি এভাবে অস্বীকার করেছেন, যেমনভাবে তাঁর পূর্ববর্তী মনীষীরা অস্বীকার করেছেন। অতঃপর তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সমসাময়িকরাও কুরআনকে তাঁর নবুওতের বৃহত্তর মু'জিযা হিসাবে দেখেছিলেন।

আল্লামা জালালউদ্দীন সুয়ূতী একথাও তায্‌কিরাহ করেন যে, কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী এর মু'জিযার এক জ্বলন্ত প্রতীক। কারণ আরবরা কত শত সাধ্য-সাধনা সত্ত্বেও ভবিষ্যদ্বাণী করতে অপারগ ছিল। অনুরূপভাবে বিগত দিনের ঘটনাপ্রবাহের হুবহু বর্ণনার মধ্যেও কুরআনের মু'জিযা নিহিত রয়েছে। কারণ ইহাও ছিল সম্পূর্ণরূপে আরবদের নাগালের বাইরে।

আল্লামা-জালালউদ্দীন সুয়ূতী এ প্রসংগে আবু হাইয়ান তাওহিদীর বর্ণনা অনুসারে আবু বকর আল-বাকিল্লানী, ইমাম ফাখ্‌র রাযী, আল যামালকানী, ইবনু আতীয়া, হালিম আল-কারতাজান্নী, আল-মারাকেশী, আল-ইসপাহানী, আল-সাক্কাকী, বিনদার, আল-ফারেসী প্রমুখ মনীষীর দ্বারা বর্ণিত মতামতের কথাও ব্যক্ত করেছেন। তিনি উক্ত গ্রন্থের ই'জায অধ্যায়ে এই সিদ্ধান্তে

১. আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন : ২য় খণ্ড; পৃষ্ঠা ১১৭।

উপনীত হয়েছেন যে, চ্যালেঞ্জের ধরণ এবং ই'জাযের প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীর মতামত বিভিন্ন ধরনের। আবার তারা এ বিষয়েও ইখতিলাফ করেছেন যে, কুরআনের চিরন্তন চ্যালেঞ্জ পেশ করা হয়েছিল জিনদের প্রতি, না ফিরিশতামণ্ডলীর প্রতি, না মানবজাতির প্রতি। আরবদের শব্দ প্রয়োগের সঙ্গে কুরআনের শব্দ প্রয়োগকে যাচাই করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, তুলনামূলকভাবে উভয়ের প্রয়োগের মধ্যে কতো আকাশ-পাতাল তফাত রয়েছে এবং আরবদের শব্দসম্ভারের তুলনায় কুরআনের শব্দসম্ভার কতো বেশী উৎকৃষ্ট, অনুপম এবং উপাদেয়। পরিশেষে তিনি কুরআনের শব্দসম্ভারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে এর পরিভাষার ঐক্যতানবিশিষ্ট ছান্দিক গুণাগুণ ও কমনীয়তার উদাহরণ দিয়ে এই প্রসংগের ছেদ টানেন। উপসংহারে তিনি বলেন: পবিত্র কুরআনের ইহাও একটা মু'জিযা যে, এর অল্পসংখ্যক শব্দের মধ্যে এত অর্থসম্পদ নিহিত রয়েছে, যা মানুষের অসম্পূর্ণ জ্ঞান কোনদিন অনুধাবন করতে পারে না বা এই মরজগতের কোন উপকরণই পূর্ণতা দান করতে পারে না। আল্লাহ্ পাক তাই বলেন: দুনিয়ার সব গাছ-পালা যদি লেখনী হয় আর সাগরের অথৈ পানির সাথে আরও সপ্তসিন্ধু মিলিত হয়ে কালিতে পরিণত হয়, তবুও আল্লাহ্‌র বাণী কোনদিন শেষ হবার নয়। (সূরা আল্-কাহাফ: ১০৯ আয়াত)

كالبدر من حيث التفت رأيته
يهدي الى عينيك نورا ثاقبا
كالشمس في كبد السماء وضوؤها
يغشى البلاد مشارقا ومغاربا

পবিত্র কুরআন জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রজনীতে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায়। তুমি যে দিক দিয়েই লক্ষ্য কর, দেখতে পাবে যে তোমার নয়নযুগলকে আলোকে পুলকে উদ্ভাসিত করছে। কুরআন ঠিক যেন আকাশের গায় হিরন্ময় সূর্যের ন্যায়; যার বিমল আলোক প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমগ্র দেশকে ছেয়ে ফেলে।[১]

---

১. আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন; ২য় খণ্ড: পৃষ্ঠা ১২৮, মুস্তাফা হালাবী প্রেস।

আল্লামা জালালউদ্দীন সুয়ূতীর 'আল-ইতকান' নামক এই অনুপম গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

আগেই বলেছি সুয়ূতীর এই 'ইতকান' গ্রন্থটি তাঁর এক তাফসীর গ্রন্থের মুখবন্ধ মাত্র। এই বিরাট তাফসীর গ্রন্থের পুরো নাম হচ্ছে 'মাজমাউল বাহ-রাইন ওয়া মাতলাউল বাদরাইন তাহরীর রিওয়ায়াত-ওয়াতাকরীরুদ-দিরা-য়াত'।[১] এটি আল্লামা মুহাম্মদ বিন জারীর তাবারীর (ওফাত ৩১০ হিঃ) সুপ্রসিদ্ধ তাফসীর 'জামেউল বায়ান ফী তাভীলিল কুরআন'-এর অনুসরণে লিখিত। ইমাম সুয়ূতী স্বয়ং বলেছেন যে, বরং জারীর তাবারীর তাফসীরের চাইতেও ইহা অনেক গুণে উৎকৃষ্ট। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এর প্রণয়নকার্য ৮৭২ হিজরীর প্রথমেই শুরু হয়েছিল। কারণ ৮৭২ হিজরীতে তিনি 'আত্-তাহবীর ফী উলুমিত তাফসীর' নামে এর একটা বিস্তারিত মুখবন্ধ লিখেন এবং এতে কুরআন মজীদের ১০২ প্রকারের ইলম সম্পর্কে নেহায়েত ব্যাপক আলোচনা করেন। তারপর একদিন আল্লামা বদরুদ্দীন যারকাশী (ওফাত ৭৯৪ হিঃ) এর চমৎকার গ্রন্থ 'আল্ বুরহান ফী উলুমিল কুরআন' তাঁর হাতে আসে। তাই একে সামনে রেখে আল্লামা সুয়ূতী ৮৭৮ হিজরীতে আবার সেই মুখবন্ধকে নতুনভাবে তারতীব দিতে গিয়ে নতুন রূপ দান করেন। বলা বাহুল্য, এই অভিনব কিতাবটিই 'আল-ইতকান ফী উলুমিল কুরআন' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সুয়ূতী তাঁর 'আল-মাজমাউল বাহরাইন' নামক তাফসীর গ্রন্থটি আগে থেকেই তারতীব দিয়ে আসছিলেন। তাই 'আল-ইতকানে'র শেষ অধ্যায়ের দিকে তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ তাফসীরটির এমন-ভাবে উল্লেখ করেন এবং তার সুষ্ঠু সম্পাদনার্থে আল্লাহ্র দরবারে আকুল মুনাজাত করেন, যাতে করে পাঠকবৃন্দ এর উপকারিতা ও অনবদ্যতার কথা অতি সহজেই অনুধাবন করতে পারেন।[২]

---

১. হাজী খলীফা কৃত 'কাশফুজ জুনুন' ১ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা, ১৫৯৯ (ইস্তাম্বুলে মুদ্রিত)।

২. হায়দরাবাদ থেকে প্রকাশিত মাসিক উর্দু পত্রিকা 'আর-রাহীম' জুন ঃ ১৯৬৫, পৃষ্ঠা ৪৮।

আল্লামা সয়ূতী বলেন :

قد شرعت فى تفسير جامع لجميع المحتاج اليه من التفاسير المنقولة والاقوال المقولة والاستنباطات والاشارات والاعاريب واللغات ونكت البلاغة ومحاسن البدائع وغير ذالك بحيث لا يحتاج معه الى غيره اصلا وسميته بمجمع البحرين ومطلع البدرين وهو الذى جعلت هذا الكتاب مقدمة له واسال الله ان يعين على اكماله بمحمد واله —

আমি একটা বিস্তৃত তাফসীর লিখতে শুরু করেছি, যা হবে সবদিক দিয়েই উত্তম আর সর্বগুণে গুণান্বিত। এতে থাকবে তাফসীরী রিওয়ায়েত, মতামত, ইঙ্গিত হারাকাত, অভিধানগত অর্থ, আলংকারিক সূক্ষ্ম তাৎপর্য ইত্যাদি সমস্ত বিষয়, যা তাফসীরের জন্য অপরিহার্য। তাফসীরটি এত ভালো ও গুণসম্পন্ন হবে যে, এর সাথে অন্য কোন তাফসীরের প্রয়োজন বা অভাব অনুভূত হবে বলে আমি মনে করি না। আমি এর নাম দিয়েছি 'মাজমাউল বাহরাইন ওয়া মাতলাউল বাদ্‌রাইন'। উক্ত গ্রন্থেরই মুখবন্ধ বা অবতরণিকা হিসেবে এই আল-ইত্‌কান গ্রন্থকে লিপিবদ্ধ করেছি। এখন তাই আল্লাহ্‌র সমীপে মুনাজাত করি, যেন তিনি আঁ হযরত (সঃ) ও তাঁর বংশধরের উসিলায় একে সমাপ্ত করার তাওফীক দান করেন।[১]

আল্লামা সয়ূতীর এই তাফসীর প্রণয়নের গবেষণারীতি বা পদ্ধতির দিকে একটা নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে একথা অতি সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, ইহা পূর্ববর্তী সমস্ত মানকুল ও মা'কুল তাফসীরের সার্থক

১. আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন : পৃষ্ঠা ৫৫৭। আহমদী প্রেস থেকে ১২৮০ হিজরীতে মুদ্রিত।

সারমর্ম'। আপাতদৃষ্টিতে এ কথাও মনে হয় যে, এই তাফসীরের কতকাংশ অসম্পূর্ণই রয়ে গেছে। এই তাফসীর কাশফুয-যুনূনের লেখক হাজী খলীফার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতেও পড়েনি। এইজন্যই তিনি এর সমাপ্তি সম্পর্কে কতকটা সন্দেহ পোষণ করেছেন।[১]

স্বয়ং আল্লামা সুয়ূতী তাঁর 'হুসনুল মুহাযারা' নামক স্বীয় গ্রন্থ-মালার যে ফিরিস্তি দিয়েছেন, তাতেও এই গ্রন্থের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। সুয়ূতীর অপর তাফসীরের নাম 'তরজমানুল কুরআন ফী তাফসীরিল মুসনাদ'।

অতি ব্যাপক ও বিস্তারিত এই তাফসীরটি ৮৯৮ হিজরীরও পূর্বেকার লেখা। ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতির দিক দিয়ে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এতে সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীন প্রমুখাৎ সমস্ত তাফসীরী রিওয়া-য়েতগুলো এবং তাঁদের বর্ণিত আকওয়াল ও আসার—সমস্তই তিনিও রিওয়ায়েতের মরতবা, মান-মর্যাদা এবং তা কতদূর সহীহ্ বা সহীহ্ নয়, সে সম্পর্কেও আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। হাজী খলীফা এই তাফসীর সম্পর্কে বলেন : هو كبير فى خمس مجلدات

এটি ৫ম খণ্ডবিশিষ্ট একটি বিরাট তাফসীর।[২]

ইমাম সুয়ূতীর আর এক তাফসীরের নাম 'দুররুল মানসুর ফিত্‌তাফ-সীর বিল-মাসূর'। ইহা ছয় খণ্ডবিশিষ্ট এক বিরাট তাফসীর। হিজরী ১৩১৪ সালে মিসর থেকে প্রকাশ পেয়েছিল। সম্প্রতি ইরান থেকেও নাকি দ্বিতীয়বার প্রকাশ পেয়েছে।

এই সর্বজনস্বীকৃত তাফসীরটি আমাদের পূর্বোল্লিখিত তাফসীর তর-জমানুল কুরআনেরই একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। এর পাণ্ডুলিপি ৮৯৮ হিজ-রীতে সম্পন্ন হয়েছিল।

---

১. দেখুন হাজী খলীফা কৃত কাশফুয-যুনূন ; ২য় খণ্ড : পৃষ্ঠা ১৫৯৯।
২. See Ibid.

শুরুতেই সারসংক্ষেপের তিনি নিম্নরূপ কারণ দর্শিয়েছেন :

لما الفت كتاب ترجمان القران وهو التفسير المسند عن رسول الله صلعم واصحابه رضى الله عنهم وتم بحمد الله فى مجلدات فكان ما اوردته فيه من الاثار باسانيد الكتب المخرج منها والرواة ورأيت قصور اكثرهم الهمم عن تحصيله ورغبتهم فى الاقتصار على متون الاحاديث دون الاسناد وتطويلة فلخصت منه هذا المختصر مقتصرا فيه على متن الاثر والتخريج الى كل كتاب معتبر وسميته بالدر المنثور فى التفسير بالماثور ـ

যখন আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ) পর্যন্ত সনদ সহকারে তাফসীরী রিওয়ায়েত সম্বলিত 'তরজমানুল কুরআন' নামক এই তাফসীরখানা বেশ কয়েকটি খণ্ডে সম্পন্ন করি এবং যেহেতু এতে গ্রন্থরাজির বরাত এবং সিলসিলায়ে সনদ সহ প্রতি ঘটনার উল্লেখ ছিল, তাই অধিকাংশ লোকই এ থেকে কোন উপকার হাসিল করতে পারে নি। কারণ তাদের সর্বাঙ্গীণ প্রবণতা ছিল হাদীসের মতনের (Text) দিকে; ইসনাদ ও রাবির দিকে নয়। তাই আমি এই মুখতাসার বা সংক্ষিপ্তসার লিখতে বাধ্য হই। এতে আমি শুধু হাদীসের মতন (Text) বর্ণনা করেই যথেষ্ট করেছি তাই নয়, বর্ণনাকারীর নাম ও কিতাবের হাওয়ালাও দিয়েছি। অতঃপর এই খুলাসার নাম আমি 'আদ-দুররুল মানসুর ফিত তাফসীর বিল্ মাসুর' রেখেছি।[১]

আল্লামা জালালউদ্দীন সুয়ূতী উক্ত তাফসীরে আহাদীস সম্পর্কে কোনই সমালোচনা করেন নি এবং এর শেষে হাফিয ইবনু হাজর আল-আসকালানীর

---

১. আল্লামা সুয়ূতী কৃত 'আদ-দুররুল মনসুরের উপক্রমণিকা'; মিসর থেকে ১৩১৪ হিজরীতে মুদ্রিত।

(ওফাত ৮৫২ হিঃ—১৪৫৯ ঈসায়ী) 'কিতাবুল উজাব ফী বায়ানিল আসবাব' থেকে একটা অতি বিস্তৃত উদ্ধৃতি দিয়েছেন তিনি। এই মূল্যবান উদ্ধৃতি বা ইকতিবাসের দরুন তাফসীরের গুরুত্ব ও উপকারিতা বর্ধিত হয়েছে এতে সন্দেহ নেই, কিন্তু ইমাম সুয়ূতীর 'তরজমানুল কুরআন' নামক তাফসীরের জন্য এই ইকতিবাসের যতটুকু গুরুত্ব ততটুকু এই দুররে মানসূরের জন্য নয়। কারণ 'দুররে মানসূরের মধ্য থেকে রিওয়ায়েতের সমালোচনা এবং সনদের সিলসিলাকে বাদ দেওয়া হয়েছে একেবারে।

সম্ভবত এইজন্যই নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁ কন্নৌজী (ওফাত ১৩০৭ হিজরী) তাঁর 'আল-আকসীর ফী উসূলিত তাফসীর' নামক অমর গ্রন্থের মাধ্যমে সুয়ূতীর এই তাফসীর গ্রন্থটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। কিন্তু তৎসঙ্গে স্থানে স্থানে তিনি তীব্র সমালোচনা করতেও কুণ্ঠিত হন নি।[১]

হাফেজ সুয়ূতী তাঁর এই তাফসীর 'দুররুল মানসূরে' যে সিলসিলায়ে সনদ ও সমালোচনার উল্লেখ করেন নি, তার কারণ সম্ভবত ইহাই যে, তিনি উক্ত তাফসীরে সমস্তই প্রামাণ্য গ্রন্থের হাওয়ালা দিয়েছেন। তাই একজন হাদীসবেত্তার জন্য এই সনদবিহীন হাদীসগুলোর মান-মর্যাদা নির্ণয় করা আদৌ মুশকিল নয়। হয়ত এইজন্যই তিনি কোন রিওয়ায়েতের সমালোচনা করতে প্রবৃত্ত হন নি।

প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা শাহ ওয়ালীউল্লাহ দিহলভীও (ওফাত ১১৭৬ হিঃ ১৭৫৮ ঈসায়ী) একথার প্রতি স্পষ্ট ইংগিত জানিয়েছেন।[২]

সে যাই হোক, রিওয়ায়েত, তারীখ এবং বনী ইসরাঈলদের কাহিনীর আলোকে কুরআন মজীদকে জানবার জন্য এই তাফসীরটি সত্যিই বেশ গুরুত্বপূর্ণ ও সহায়ক। এর মাধ্যমে তাফসীর বিজ্ঞানে হাফেজ সুয়ূতীর

---

১. নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁ ভূপালী কৃত 'আল-আকসীর ফী উসূলিত-তাফসীর' পৃঃ ৭৯।

২. শাহ ওয়ালীউল্লাহর 'কুররাতুল আইনাইন ফী তাফযীলিস্ শাইখাইন: পৃষ্ঠা ২৮০; মুজতাবাই প্রেস, দিল্লী, হিজরী ১৩১০।

সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, অগাধ জ্ঞান ও তাফসীরী রিওয়ায়েতের উপর তাঁর দিগন্ত-প্রসারী জ্ঞানের সম্যক পরিচয় মেলে। এর গুরুত্ব সম্পর্কে এ থেকেও আমাদের মোটামুটি একটা ধারণা জন্মে যে, তাফসীর সম্বন্ধীয় যে সমস্ত অসংখ্য রিওয়ায়েতের এতে সমাবেশ রয়েছে, তার পরিমাণ দশ সহস্রেরও অধিক। স্বয়ং আল্লামা সুয়ূতী বলেন :

قد اعتنيت بما ورد عن النبى صلعم فى التفسير ومن اصحابه فجمعت فى ذالك كتابا فيه اكثر من عشرة الاف حديث -

হুযূরে আকরাম (সঃ) ও সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত কুরআনের তাফসীর সম্বন্ধীয় কতকগুলো হাদীস রয়েছে, তার প্রায় সবগুলোকেই আমি এই কিতাবে একত্রিত করেছি। তাই তাফসীরে বর্ণিত হাদীস-গুলোর সংখ্যা দশ হাজারেরও অধিক।[১]

শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দিহলভী (ওফাত ১২ ৭ হিজরী) বলেন : "তাফসীর সম্পর্কিত হাদীসগুলোই হচ্ছে উত্তম তাফসীর। যেমন, তাফসীর ইবনু মারদভীয়া, তাফসীর দায়লামী, তাফসীর ইবনু জারীর তাবারী ইত্যাদি। আল্লামা জালালউদ্দীন সুয়ূতীর 'দুররুল মানসুর'-এ কিন্তু সবগুলোর অপূর্ব সমাবেশ রয়েছে।[২]

আল্লামা মুহাম্মদ শাওকানী (ওফাত ১২৫৫ হিজরী) তাঁর 'ফাতহুল কাদীর ফী আর-রিওয়াত ওয়াদ-দিরায়িত মিন ইলমিত তাফসীর' নামক সুপ্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থে বলেন :

اعلم ان تفسير السيوطى المسمى بالدر المنثور قد

---

১. সুয়ূতী কৃত 'তাদ্‌বীবুর রাভী ফী শারহি তাকরীবুন নওয়াভী : পৃষ্ঠা ৬৫, খাইরিয়া প্রেস, মিসর, ১৩০৭ সাল।

২. শাহ আবদুল আযীয কৃত 'উজালাই নাফিয়া' : পৃষ্ঠা ১৭; মুজতা-বাই প্রেস, দিল্লী।

اشتمل على غالب ما فى تفاسير السلف من التفاسير المرفوعة الى النبى صلعم وتفاسير الصحابة ومن بعدهم وما فاته الا القليل النادر ـ

জেনে রাখা ভালো যে, হাফেজ সুয়ূতীর তাফসীর 'দুররে মানসুর সালফে সালেহিনদের এই ধরনের বহু তাফসীরেরই শামিল। এর মাঝে রসূ-লুল্লাহ্ (সঃ) সাহাবা ও তাবেয়ীন প্রমুখাৎ বহু হাদীসের সমাবেশ রয়েছে। আর যদি এতে উপরিউক্ত মারফু হাদীসগুলো থেকে কোন কিছু বাদ পড়ে থাকে তবে তার সংখ্যা অতি নগণ্য।[১]

কোন কিছু ছুটে যাওয়ার মানে এই নয় যে, হাফেজ সুয়ূতী সে সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। বরং তার কারণ হচ্ছে এই যে, তিনি সে যুগে মিসরের বুকে কতকগুলো অতি প্রয়োজনীয় তাফসীর বহু অনুসন্ধান সত্ত্বেও খুঁজে পান নি। নিম্নের বর্ণনা থেকেও এই অক্লান্ত অনুসন্ধানের কিছুটা আভাস পাওয়া যায় যে ইমাম অকীর (ওফাত ১৯৬ হিজরী) শাগরিদ শায়খ সিন্দ বিন আবদুল্লাহ (ওফাত ২২৬ হিজরী)-এর তাফসীর মুসনাদকে সুদীর্ঘ ২০ বছর ধরে তিনি তল্লাশ করেছিলেন। কিন্তু তবুও পান নি। তাই সুয়ূতীর প্রিয় শাগরিদ শায়খ আবদুল ওয়াহাব শা'আরানী (ওফাত ৯৭৩ হিজরী) উক্ত ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন:

طالعت تفسير الامام سندوبن عبد الله الازدى روى عن وكيع وهو تفسير نفيس وقد تطلبه الشيخ جلال الدين السيوطى عشرين سنة فلم يظفر بنسخة منه ثم جردت احاديثه واثاره فى مجلد ـ

আমি ইমাম সিন্দ বিন আবদুল্লাহ্‌র তাফসীর পড়েছি। তিনি স্বীয় ওসতাদ অকীয় থেকে রিওয়ায়েত করেছেন। উক্ত তাফসীরটি বেশ সুন্দর।

---

১. আল্লামা শাওকানী কৃত 'ফাতহুল কাদীর' ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪; ১ম মুদ্রণ, মুসতাবা হালাবী প্রেস, মিসর, হিজরী ১৩৪৭।

শায়খ জালাল সুদীর্ঘ ২০ বছর ধরে তল্লাশ করেছেন। তবুও এর কোন একটি কপি তাঁর হাতে আসে নি। এই তাফসীর পড়ার পর আমি এর হাদীস ও আসারগুলোকে এক খণ্ডে সংক্ষিপ্ত করেছি।[১]

হাফেজ সাইয়েদ আবদুল হাই কাত্তানী (ওফাত ১৩৮২ হিজরী) তাঁর 'ফিহরিসুল ফাহারিসওয়াল আসবাত' নামক গ্রন্থে এই 'দুররুল মানসুর' তাফসীর সম্পর্কে যে তাবসিরা ও আলোচনা করেছেন, তা সত্যিই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

الدر المنثور...وهو مطبوع فى ست مجلدات ضخمة من طالعه بتعمق ادهشه وابهته واسكته ومن لا يطالعه او طالعه منه حريفات النقد واستمراء يراه غيره حدوا ولو سكت من لا يعلمه ليسقط الخلاف —

তাফসীর 'দুররুল মানসুর' প্রকাণ্ড ছয় খণ্ডে প্রকাশিত। যে ব্যক্তি মনোযোগ সহকারে একে অধ্যয়ন করবে, সে আশ্চর্যান্বিত, রোমাঞ্চিত এবং নিশ্চুপ হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি এর অধ্যয়ন করেনি কিংবা সমালোচনার জন্য দু'চারটি শব্দ পড়েছে মাত্র, সে তাফসীরকে ছেড়ে ঐ বস্তুকে উত্তম ও সুমিষ্ট মনে করবে যা অন্যান্যরা করেছে। আর না জেনে যদি কেউ চুপ করে, তবে বাকবিতণ্ডারই অবকাশ থাকে না।[২]

একজন তুর্কী আলিম তাফসীর দুররুল মানসুরের সুন্দর সংক্ষিপ্তসার লিপিবদ্ধ করেছেন। এটি এক খণ্ডে সমাপ্ত। এর পাণ্ডুলিপি কায়রোর তাইমুরিয়া লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রয়েছে।

এই তো গেলো তাফসীর 'দুররুল মানসুরে'র কথা। এক্ষণে আমরা শায়খ জালালউদ্দীন সুয়ূতীর আর একটি সর্বজনপ্রিয় তাফসীর সম্পর্কে আলোকপাত করছি। এর নাম 'জালালাইন' বা দুই জালালের তাফসীর। এটি অত্যন্ত

---

১. দেখুন আল্লামা শা'রানী কৃত লাতাইফুল মিনান ঃ পৃষ্ঠা ৫৩।
২. ফিহরিসুল ফাহরিস ওয়াল আসবাত ঃ ২য় খণ্ড; পৃঃ ৩৫৮, ১৩৪৬ হিজরীতে মুদ্রিত।

সংক্ষিপ্ত হলেও এক অবিস্মরণীয় ও অনবদ্য অবদান। প্রথমে এই সুপ্রসিদ্ধ অমর তাফসীরকে সূরা কাহাফ থেকে লিখিতে শুরু করেন জালালুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ শাফেয়ী মাহাল্লী (ওফাত ৮৬৪ হিজরী)। এই শেষার্ধ থেকে তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন সম্ভবত একে অপেক্ষাকৃত সহজতর মনে করে। এভাবে এই শেষাংশের তাফসীরকে সমাপ্ত করে সূরা আল-ফাতিহা ও সূরাতুল বাকারার তাফসীরে হাত দেন। এমন সময় তাঁকে এই নশ্বর জগতের সাথে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে মৃত্যুকে আলিংগন করতে হয়। এইজন্যেই এই সর্বাংগসুন্দর তাফসীরটি অসমাপ্তই রয়ে যায়। এই অসম্পূর্ণতার প্রবল অনুভূতি সমসাময়িক আলিমদের প্রাণে একটা দারুণ ব্যথার অনুভূতি এনে দেয়। কারণ এই তাফসীরটি ছিল শায়খ জালাল মাহাল্লীর সর্বশেষ ও সর্বোত্তম অবদান। সৌভাগ্যের বিষয় যে, এই অসম্পূর্ণ কার্য সমাপ্ত করার গুরুদায়িত্ব গিয়ে পড়লো সুযোগ্য পাত্র শায়খ সুয়ূতীর স্কন্ধে। কারণ এই ঘটনার পর বহুদিন অতীতের পথে অনন্ত কালসাগরে বিলীন হয়েছে।...১

একদিন হঠাৎ করে শায়খ কামালুদ্দীন মাহাল্লী স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর সহোদর ভ্রাতা শায়খ জালাল মাহাল্লী ও জালাল সুয়ূতী কোন এক মজলিসে সামনাসামনি উপবিষ্ট রয়েছেন। আর সুয়ূতীর পবিত্র হাতে রয়েছে জালাল মাহাল্লীর ছেড়ে যাওয়া সেই প্রথমার্ধের অসম্পূর্ণ তাফসীরখানি। জালালউদ্দীন সুয়ূতী তখন মাহাল্লী মরহুমকে জিজ্ঞেস করলেন যে, রচনাশৈলীর দিক দিয়ে কোন্ তাফসীরটি উৎকৃষ্ট? প্রশ্ন শুনে শায়খ জালাল মাহাল্লী শায়খ সুয়ূতীকে আরও কতকগুলো প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন এবং তাঁর মুখ থেকে সে সব প্রশ্নের বেশ সন্তোষজনক জবাব শুনে ঈষৎ হাস্য করলেন। এতে করে স্বপ্নে একথা বুঝতে আর বাকী রইলো না যে, আল্লামা জালাল মাহাল্লী সুয়ূতীর লিখিত তাফসীরের এই প্রথমার্ধকে অনুমোদন করলেন সর্বান্তকরণে।

আল্লামা কামাল মাহাল্লীর মারফত স্বপ্নের এই বৃত্তান্ত শুনে সুয়ূতী তৎক্ষণাৎ এই অসম্পূর্ণ তাফসীরকে লিপিবদ্ধ করতে উঠে পড়ে লেগে

১. ফিহ্‌রিসুল খিয়াসাতিত তাইমুরিয়া: ১ম খণ্ড; পৃষ্ঠা ৫৬।

গেলেন। প্রখ্যাত মুফাসসির শায়খ সুলায়মান শাফেয়ী তাঁর 'ফুতুহাতুল ইলাহিয়া' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে সুয়ূতীর আসল পাণ্ডুলিপি থেকে এই ঘটনাটির আনুপূর্বিক নকল করেছেন।[১]

শায়খ সুয়ূতী নিজেও একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে, যদিও তিনি এই তাফসীর লিখতে গিয়ে শায়খ মাহাল্লীর বেশ অনুকরণ করেছেন, কিন্তু তবুও রচনাপদ্ধতি ও বাকরীতির দিক দিয়ে নিঃসন্দেহে ইহা উত্তম তাফসীর। তাই 'হুসনুল মুহাযিরা' নামক গ্রন্থে তিনি বলেন ঃ

واجل كتبه التى لم تكمل تفسير القران...وهو مزوج
محرر فى غاية الحسن وكتب على الفاتحة وايات يسيرة
من البقرة وقد اكملته بتكملة على نمطه من اول بقرة
الى اخرا الاسراء —

জালালউদ্দীন মাহাল্লীর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে তাঁর তাফসীর, যা সম্পূর্ণ হয়নি। ইহা নিখুঁত সৌন্দর্যে সংমিশ্রিত ও লিপিবদ্ধ। তিনি কিন্তু এর দ্বিতীয়ার্ধকে খতম করে সূরা আল-ফাতিহা ও সূরাতুল বাকারার অতি সামান্য অংশই লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। (এমন সময় মালাকুল মওতের আহবানে সাড়া দিতে গিয়ে তাঁকে চিরবিদায় নিতে হয়েছিল) তাই তাঁর রচনা পদ্ধতিকে অবলম্বন করে আমি 'সূরাতুল বাকারা' থেকে নিয়ে সূরা বনী ইসরাইলের শেষ পর্যন্ত তাফসীর লিখে একে সম্পূর্ণ করেছি।[২]

---

১. দেখুন 'আল্ ফুতুহাতুল ইলাহিয়া' ঃ ২য় খণ্ড; পৃষ্ঠা ২৭০—২৭১ (মিসরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত)।

২. হুসনুল মুহাযিরা ফী আখবারি মিসর ওয়াল-কাহিরাহ ঃ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫২-৫৩, মিসরের ইদারাতুল ওয়াতান প্রেস থেকে ১২৯৯ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আশ্চর্যের বিষয় যে, এত গুরুত্বপূর্ণ তাফসীরের অর্ধেকাংশ তিনি মাত্র চল্লিশ দিনে শেষ করেন। তাই তিনি তাফসীরের শেষে লিখেছেন :

الفته في مدة قدر ميعاد الكليم -

আমি এই তাফসীরকে হযরত মূসা কালীমুল্লাহ্ (আঃ)-এর মিয়াদ মুতাবিক অর্থাৎ চল্লিশ দিনে প্রণয়ন করেছি।[১]

তিনি ৮৭১ হিজরীর ৬ই সফর বুধবার দিন এই তাফসীর লিখে ফারিগ হয়েছিলেন। এখন তাই আমাদের একথা আর বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আল্লামা জালাল মাহাল্লীর ইন্তিকালের ছয় বছর পর এই তাকমিলাহ বা অবশিষ্টাংশ সংকলিত হয়। তখন শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতীর বয়স মাত্র বাইশ বছর। তাফসীর বিজ্ঞানে সুয়ূতীর ইহাই ছিল প্রথম অনবদ্য অবদান। এর সংকলনে তাই সুয়ূতীর পক্ষ থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম ও একনিষ্ঠ সাধনার আদৌ কোন ত্রুটি ছিল না। তিনি স্বয়ং বলেছেন :

قد افرغت فيه من جهدي وبذلت فيه فكري في نفائس
اراها ان شاء الله تعالى تجدي -

এই তাফসীর প্রণয়নে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করতে আদৌ ত্রুটি করিনি। আর সুন্দরতম বস্তুসমূহ সম্পর্কে গবেষণাও কম করিনি। তাই আমি এখন দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি যে, পাঠকের জন্য ফায়েদা হবে সুনিশ্চিত।[২]

অল্পসংখ্যক শব্দে বেশী কথা বলার দিক দিয়ে এই তাফসীর জালালাইনের সত্যিই জুড়ি মেলা ভার। এহেন সংক্ষিপ্ত কলেবরে এত সার্থক

১. তাফসীর জালালাইন মা'আল কামালাইন ওয়াব যুলালাইন : পৃষ্ঠা ২৩৮, পাক-ভারতের প্রসিদ্ধ নওল কিশোর প্রেস থেকে ১৩১৭ হিজরীতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২. দেখুন তাফসীর জালালাইন মা'আল কামালাইন : পৃষ্ঠা ২৩৮; নওল কিশোর প্রেস, ১৩১৭ হিজরী।

ও নিখুঁত ব্যাখ্যা, আর এক কথায় কূপে সাগরকে ঠাঁই দেবার কামিয়াব প্রচেষ্টা শুধুমাত্র ইমাম সুয়ূতীর ন্যায় যুগান্তকারী মনীষার অধিকারী ব্যক্তিদের পক্ষেই সম্ভবপর। উর্দুতে একেই বলে 'দারিয়া কো কুযে মে বন্দ করনা'।

তের শতক হিজরী-উনিশ শতক ঈসায়ী

ইজায শাস্ত্রকে কেন্দ্র করে আল্লামা সুয়ূতী ও তাঁর পরবর্তী লেখকদের বিরাট শূন্যতা ও বিরতির অবকাশ দেখা দেয়। কারণ আল্লামা সুয়ূতী এই বিরাট বস্তুকে নিয়ে বহুদিন যাবত অর্থাৎ উনিশ শতক পর্যন্ত তাঁর কলম ধরেন নি আর তেমন চিন্তা গবেষণাও করেন নি। একমাত্র আবুস সউদ তাফসীরের মাধ্যমে দশ শতকের প্রান্তভাগে এই ইজায শাস্ত্রকে কেন্দ্র করে কিছুটা কাজ করেছেন, কিন্তু তাও ততটা উল্লেখযোগ্য নয়।

এই বিরাট শূন্যতা ও বিরতির কারণ হচ্ছে এই যে, উসমানীয়া খিলাফতের আমলে মুসলিম জগতের শিক্ষিত সম্প্রদায় তথা বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিক মহলে একটা বিরাট অবসাদ ও জড়তা দেখা দিয়েছিল। তারপর হঠাৎ করে ইজায শাস্ত্রের এই সুবিস্তৃত ময়দানে যে মহামনীষী তাঁর বলিষ্ঠ লেখনী হাতে নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁর নাম আল্লামা মাহমূদ আলূসী।

মাহমুদ আলুসী

তাঁর পুরো নাম আবুল ফযল শিহাবুদ্দীন আস-সাইয়্যেদ মাহমূদ আল-আলূসী বাগদাদী (ওফাত ১২৭০ হিজরী—১৮৫৭ ঈসায়ী)।

আলূস ফোরাত নদের পশ্চিম তীরে ইরাকের এক সুপ্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধশালী গ্রাম। বহু প্রতিভাশালী মশহুর ব্যক্তির জন্ম এই গ্রামে। তন্মধ্যে আল্লামা আলূসী হচ্ছেন অন্যতম। স্বীয় পিতার কাছেই তাঁর হাতেখড়ি।

তারপর ইরাক নগরীর নামকরা আলিমদের খিদমতে তাঁকে সোপর্দ করা হয়। এভাবেই তিনি মুতাদাওল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিদ্যাবুদ্ধিতে বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেন।

১২৫০ হিজরীতে এক বক্তৃতা উপলক্ষে আমন্ত্রিত হয়ে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি এক ভাষণ দেন। এতেই তাঁর ভাগ্যের মোড় অন্যদিকে ফিরে যায়। কারণ ঘটনাক্রমে সেই ওয়াজ মাহফিলে বাগদাদের তদানীন্তন শাসনকর্তা রিয়ায পাশার পরামর্শদাতাও হাযির ছিলেন। তিনি অতি-মাত্রায় মুগ্ধ হয়ে শাহী দরবারে আহবান জানিয়ে তাঁকে হানাফী মযহাবের মুফতী নিযুক্ত করেন। অবশ্য সাইয়েদ আলুসী ছিলেন পুরুষানুক্রমে শাফেয়ী মযহাবের অনুসারী। মুফতী ছাড়াও তিনি একজন খ্যাতিমান শিক্ষক, চিন্তানায়ক এবং শীর্ষস্থানীয় তর্কবাগীশ ছিলেন।

আল্লামা আলুসী ই'জায শাস্ত্র সম্পর্কে যে আলাদা কোন বই লিখে-ছেন তা নয়। বরং তাঁর সুপ্রসিদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ অবদান 'তফসীরে রুহুল মা'আনী'। এর শুরুতে ৩০ পৃষ্ঠা ব্যাপী তিনি একটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লিপিবদ্ধ করেন। এ ভূমিকা বা মুখবন্ধের মধ্যেই তিনি ই'জায শাস্ত্রকে নিয়ে বেশ সুন্দর ও সার্থক আলোচনা করেছেন। তাছাড়া তাঁর বিস্তৃততম তাফসীরের পত্রান্তরালেও মাঝে মাঝে প্রসঙ্গক্রমে কুরআনের চিরন্তন চ্যালেঞ্জ, ই'জায শাস্ত্র ও আলংকারিক শিল্পকলা সম্পর্কে বেশ সুন্দর আলোচনা পাওয়া যায়। এ তাফসীরের পুরো নাম 'রুহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস সাবইল মাসানী'। এর দ্বিতীয় সংস্করণ দামেশকের 'ইদারাতুল মুনীরীয়া' নামক প্রেস থেকে ৯ খণ্ডে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। বুলাক প্রেস থেকেও ইহা ১৩০১ হিজরীতে ৯ খণ্ডে প্রকাশ পেয়েছিল।

তাফসীর বিজ্ঞানে আল্লামা আলুসীর এই বিজ্ঞজনোচিত সাহিত্যকর্মে তিনি কুরআনের ঐ সমস্ত আয়াতগুলোকে বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, যদ্দ্বারা কুরআনের মুকাবিলার জন্য আরবদের চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়ে-ছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লামা আলুসী বহু পূর্ববর্তী মনীষীর নামও উল্লেখ

করেছেন, যাঁরা ইতিপূর্বেই এ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে গেছেন। আর নিজেদের মতামতের সমর্থনে তাঁরা কুরআনের যে রচনারীতি, ভাষাশৈলী, সাহিত্যিক মানের উচ্চতা, আলংকারিক শিল্পকলা, অদৃশ্যের খবর প্রদান, সারাফা মতবাদ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, আলূসী সে সবগুলোরও ভূরি ভূরি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মনে হয় এ ব্যাপারে তিনি আমীর আল-আলাভীর 'আত্-তিরায্' নামক গ্রন্থ দ্বারা অতিমাত্রায় প্রভাবান্বিত ও পরিচালিত হয়েছেন। অতঃপর তিনি স্বীয় পূর্বসূরী আলী-আল আমিদীর অভিমত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, কুরআনের বিভিন্নমুখী বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর সমষ্টির নাম হচ্ছে এর ই'জায। আল্লামা আলূসী আল-কুরআনের ই'জায সম্পর্কে তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করতেও কার্পণ্য করেন নি আদৌ। এ প্রসঙ্গে তাই তিনি বলেন: কুরআন সমষ্টিগতভাবে যেমন একটা অমর মু'জিযা, এর ক্ষুদ্রতম অংশও ঠিক তেমনি চিরন্তন। শুধু তাই নয়, অর্থের যথার্থতা, আলংকারিক শিল্পকলা, ভূত-ভবিষ্যতের খবর প্রদান, স্টাইলের সৌন্দর্য, অগাধ জ্ঞান-গরিমা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও-এর অমর মু'জিযা কোন ক্রমেই কম নয়।

তিনি আরও বলেন: এই সব গুণ একটি মাত্র আয়াতের মধ্যেও পাওয়া যেতে পারে কিংবা হয়তো একাধিক গুণাবলীর সমাবেশ কোন বিশিষ্ট মুহূর্তে একত্রে উপলব্ধি করতে নাও পাওয়া যেতে পারে। তবুও যেন প্রতিটি আয়াতের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে মু'জিযার অনন্ত সম্ভাবনা। স্থানে স্থানে অনুসন্ধিৎসু মনে এবং স্বীয় উক্তির সমর্থনে তিনি তাঁর পূর্বসূরী ইমাম সুয়ূতীরও ভূরি ভূরি বরাত দিয়েছেন। এ সম্পর্কে আলূসীর কাছে সব চাইতে ব্যাপক ও জনপ্রিয় অভিমত হচ্ছে এই যে, কুরআনের অনুপম স্টাইল ও আলংকারিক উৎকর্ষের মধ্যে নিহিত রয়েছে এর ই'জায বা অলৌকিকতা। এ দিক দিয়ে, কিন্তু কুরআন মজীদ ও অন্যান্য সাহিত্যকর্মের মাঝে একটা বড় রকমের বৈষম্য বিরাজ করছে।

আল্লামা মাহমূদ আলূসী স্বীয় তাফসীরের মুকাদ্দিমায় ই'জায সম্পর্কে বাহাস বা আলোচনা শুরু করতে গিয়ে বলেন:

اعلم ان اعجاز القران مما لا مرية فيه ولا شبهة لعتريه وارى الاستدلال عليه مما لا يحتاج اليه والشبهة فيه تحزو باب او طنين ذباب والاهم بالنسبة الينا بيان وجه الاعجاز والكلام فيه على سبيل الايجاز فنقول قد اختلف الناس فى ذالك الخ -

পবিত্র কুরআনের ই'জায এমনই এক বস্তু, যার মধ্যে কোন শক-সন্দেহের অবকাশ পর্যন্ত নেই। আর আমি মনে করি যে, এর জন্য দলীল-দস্তাবিজ ও প্রমাণ তলব করা একান্তই নিষ্প্রয়োজন।[১]

আরবদের চ্যালেঞ্জ সম্বন্ধীয় কুরআনী আয়াতসমূহের তাশরীহ করতে গিয়ে আল-আলূসী ই'জায সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন, কুরআন পাকের সূরা তূরে যে আয়াতগুলো রয়েছেঃ 'হে রসূল! তুমি স্মরণ করিয়ে দাও যে, তোমার প্রভুর দয়ায় তুমি ভবিষ্যদ্বক্তাও নও আর পাগলাও নও। তারা কি বলে সে একজন কবি, যার সম্পর্কে আমরা কালচক্রের অপেক্ষা করি। হে রসূল। তুমি বলে দাওঃ হ্যাঁ। তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো; কারণ আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের সমঝদার লোকেরা কি তাদেরকে একথার হুকুম দিচ্ছে? না তারা সীমা লংঘনকারী কওম? তারা কি বলে, কুরআন নবীর (সঃ) কল্পিত উপাখ্যান? না, না, আসল কথা তাদের ঈমান নেই। অনন্তর তারাও কুরআনের অনুরূপ একটি বাণী উপস্থাপিত করুক; যদি তাদের দাবী সত্য হয়।'[২]

এই আয়াতসমূহের তিনি এভাবে তাশরীহ করেছেন যে, কুরায়শ কওম ছিল বেশী সুধী, জ্ঞানী-গুণী এবং বাহাদুর। তাদের এই বাহাদুরীর

১. তাফসীর রূহুল মা'আনীঃ ১ম খণ্ড; পৃষ্ঠা ২৭।

২. সূরা আত্-তুরঃ আয়াত ২৯—৩৪।

কথা 'আল-জাহিয'-ও উল্লেখ করেছেন অকুণ্ঠ চিত্তে। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সঃ) যখন তাদেরকে গম্ভীর স্বরে চ্যালেঞ্জ দিলেন কুরআনের মুকাবিলার জন্য, তখন কিন্তু এই কুরায়শ কওম তাদের বাহাদুরীর পরাকাষ্ঠা ততটা প্রদর্শন করতে পারেনি। তাছাড়া আরবরা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে কখনও কবি আবার কখনো উন্মাদ পাগল বলে আখ্যায়িত করতেও এতটুকু কসুর করেনি। অথচ পাগল হলে বুদ্ধি-বিবেক একেবারে লোপ পেয়ে যায়। পক্ষান্তরে কবি হতে গেলে অগাধ জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেকের আশু প্রয়োজন অনুভূত হয়।

অনুরূপভাবে সূরা বনী ইস্রাঈলের ৮৮ নম্বরে একটি আয়াত রয়েছে : "বল, কুরআনের অনুরূপ কালাম পেশ করার জন্য শুধু মানবকুল কেন, তাদের সাথে জিনরাও একত্রে সমবেত হয়, তা'হলেও এর অনুরূপ কালাম পেশ করতে পারবে না—পরস্পর পরস্পরের সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা করলেও না।"[১]

আল্লামা আলূসী এই উপযুক্ত আয়াতটি সম্পর্কে বলেন যে, এটা নাযিল হয়েছিল আরবদের তদানীন্তন দাবী-দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে। কারণ তারা কুরআনের মুকাবিলা করতে পারবে বলে জোর গলায় দাবী জানিয়েছিল। তাই তাদের এই ভিত্তিহীন দাবী ও অসার আস্ফালনের প্রতিউত্তরেই একাধিকবার মুহম্মদুর চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছিল।[২] এই স্পষ্টাক্ষরের চ্যালেঞ্জ শুনে আরবের প্রখ্যাতনামা সাহিত্যরথী কবি ও প্রথিতযশা বাগ্মীরা উঠে পড়ে লেগেছিল কুরআনের অনুরূপ সূরা রচনা করতে। তারা কত সাধ্য সাধনা করলো, কত মাথা খুঁড়ে মরলো, কিন্তু তবু পারলো না। সুতরাং তাদের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণে সম্পূর্ণ অক্ষমতা ও পবিত্র কুরআনের অলৌকিকতা এবং এর অনুরূপ একটা ছোট্ট সূরা বরং একটা ছোট্ট বাক্য রচনা করে

---

১. দেখুন সূরা বনী ইস্রাঈল : আয়াত ৮৮; আরও দেখুন খান বাহাদুর মৌলভী ইদ্রিস আহমদ পি. ই. এস. কৃত মু'জিযা-ই কুরআন : পৃষ্ঠা ৮২।

২. সূরা ইউনুস : পঞ্চম রুকু; আয়াত ৩৮।

নিয়ে আসার অসমর্থতার কথা প্রকাশ্যভাবে বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ্ পাক সূরা বনী ইসরাইলের উপরিউক্ত আয়াতটি নাযিল করেছিলেন।

কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার যে, এতদসত্ত্বেও সেই বেওকূফ মুশরিক-দের জ্ঞান ফিরে আসেনি। তাই তারা করে কি, পূর্ববর্তী নবীরা যেমন মু'জিযা দেখিয়েছিলেন, তদ্রূপ আমাদের নবী মুস্তফা (সঃ)-কেও তারা শারীরিক মু'জিযা বা অলৌকিকতা প্রদর্শন করার জন্য জেদ্ ধরলো।

আল্লামা আলূসী এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করেন যে, আল্লাহ্ পাকের কাছ থেকে নবী মুস্তফা (সঃ)-এর মুখে প্রথম চ্যালেঞ্জ এসেছিল বিশিষ্ট দশটি সূরার মুকাবিলার জন্য। চ্যালেঞ্জের আয়াতটি এই—'তারা কি বলতে চায় যে, মুহম্মদ (সঃ) নিজেই কুরআনকে আল্লাহ্ পাকের নামকরণে জাল করে নিয়েছেন? তুমি বল—তা'হলে তোমরাও এর অনুরূপ দশটা জাল সূরা রচনা করে ফেল এবং এজন্য আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যত লোককে সাধ্যে কুলায় ডেকে আনো—যদি তোমরা সত্যবাদী হও। কিন্তু তারা যদি তোমাদের এই আহবানেও সাড়া না দেয় তবে জেনে রেখো যে, 'নিশ্চয়ই কুরআন নাযিল হয়েছে আল্লাহ্‌র ইলম সহকারে।' (আল-কুরআন)

এখন প্রশ্ন জাগে কুরআনের এই দশটি সূরা কোন্ দিক থেকে? প্রথম দিক থেকে, শেষ দিক থেকে, না মাঝের অংশ থেকে?

এ প্রশ্নের জবাবে আল্লামা মাহমুদ আলূসী প্রথমে ইবনু আব্বাসের (রাঃ) রিওয়ায়েতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কুরআনের বর্তমান ক্রম অনুসারে প্রথম দিকে দশটি সূরা থেকে। অতঃপর তিনি এই উক্তির প্রতিবাদ জানান এইভাবে যে, সূরা হূদ মক্কা মুয়াযযামায় নাযিল হয়েছিল বটে, কিন্তু এই দশটি সূরার মধ্যে পরে যেগুলো মদীনা মুনাওয়ারায় নাযিল হয়েছিল, সেগুলোর দ্বারা মক্কায় বসে চ্যালেঞ্জ দেওয়া সম্ভব হয় কিরূপে?

এরপর চ্যালেঞ্জের আয়াতগুলোর ক্রম সম্পর্কে ইবনু আতীয়া আলগার-

নাভী (ওফাত ঃ ৫৪৬ হিজরী) এবং আবুল আব্বাস আল্ মুবাররাদ (ওফাত ঃ ৬৮৬ হিজরী) এর মতামত নিয়েও তিনি বাহাস বা আলোচনা করেছেন।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রমুখাৎ অপর এক বাচনিক রিওয়ায়েতে প্রকাশ যে, আরবদের প্রথমে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছিল একটি সূরার মুকাবিলার জন্য। কিন্তু সেই একটি সূরার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ আলংকারিক সৌন্দর্য, সাহিত্যিক উৎকর্ষতা, বাগ্মিতা, অনুপমত্ব, অদৃশ্যের খবর প্রদান ইত্যাদি সমস্ত গুণাবলীর সমাবেশ থাকতে হবে তাদের সেই নিজস্ব তৈরি করা সূরার মধ্যে। আরবরা যখন এতে অপারগ হলো তখন তাদেরকে শুধু কুরআনের স্টাইল সম্বলিত দশটি সূরা নিয়ে আসতে বলা হল। কিন্তু এতেও তারা হলো অপারগ। তখন তাদের শেষ চ্যালেঞ্জ দেয়া হল এভাবে ঃ

"হে অবিশ্বাসী মুশরিকগণ! কুরআন যে আমার বান্দার প্রতি অবতারিত গ্রন্থ, এ সম্বন্ধে যদি তোমরা বিন্দুমাত্রও সন্দিহান হও তবে ভালো কথা, এমন তাৎপর্যপূর্ণ, সুন্দর ও স্বাভাবিক উপদেশাবলী এবং উজ্জ্বল ও অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত একটি সূরা তোমাদের নিজস্ব প্রয়াসে অথবা দেশবিখ্যাত কবিকুল নন্দিত মুরব্বী ও সম্পূজিত দেবদেবীগণের সহায়তায় উপস্থাপিত কর দেখি, কারণ তোমরাই তো ভাষাবিজ্ঞ সুদক্ষ পণ্ডিত আর তিনি তো উম্মী নিরক্ষর, তাহলেই বুঝবো যে তোমরা সত্যবাদী।[১]

এই চ্যালেঞ্জকেও তখন কেউ গ্রহণ করতে সাহস করেনি। আর করলেও তাদের সাধ্যে কুলোয় নি। তাদের প্রখ্যাতনামা সমসাময়িক সাহিত্যিক এবং কবি ও বাগ্মীদের সকল প্রচেষ্টাই নিষ্ফল হয়েছিল, তাদের সব সাধ্য-সাধনা একান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। অবশেষে একটা দুর্বার লজ্জায় নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে তারা মাথা হেট করে বললো এবং সবাই অবনত মস্তকে এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হল যে, কুরআনের ভাষাশৈলী কোনদিনই মানব রচিত নয়।

১. দেখুন তাফসীর সূরাতুল বাকারা ঃ আয়াত ২৩-২৪।

অনেকেই আবার এই দুর্বার লজ্জা ও পরাজয়ের গ্লানি দূর করার মানসে এবং সর্ব সাধারণকে সম্মোহিত করে রাখার উদ্দেশ্যে কুরআনের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে অপপ্রচার চালাতে শুরু করলো।

মোটকথা, আল্লামা আলূসী মন-প্রাণ দিয়ে যুক্তিতর্কের দ্বারা একথা সমর্থন করেন যে, কুরআনের ই'জায নবী মুস্তফার (সঃ) আকুল পয়গামের সত্যতার জ্বলন্ত স্বাক্ষর।

তাফসীর রূহুল মা'আনী ছাড়াও আল্লামা মাহমুদ আলূসীর নিম্নলিখিত কিতাবগুলো বেশ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে।

১. 'আল আজভিবাতুল ইরাকীয়া আ'নিল অসইলাতিল ইরানীয়া।' এটি ১৩১৪ হিজরীতে মৌলভী আলীদাদা লিখিত 'খাওয়াতিমুল হিকাম' নামক কিতাবের হাশিয়ায় মুদ্রিত হয়েছে।

২. আল-আজভিবাতুল ইরাকীয়া 'আলাল আসইলাতিল লাহোরীয়া'। এটি ১৩০১ সালে বাগদাদের হামীদিয়া প্রেস থেকে মুদ্রিত।

৩. 'হাশিয়া আল শারহিল মুবাল্লাফ আলা কুত্‌বিন নাদা।'

৪. 'আল খারীদাতুল গায়বিয়াহ ফী তাফসীরিল কাসীদাতিল আইনিয়াহ। আবদুল বাকী আল মুসিলী আল্‌ উমরী যে কাসীদা লিখে হযরত আলী মুরতাযার (রাঃ) মাদাহ বা প্রশংসা করেছিলেন, এটা তারই শারাহ বা বিশদ ব্যাখ্যা। ১০১৭ সালে এটি মিসর থেকে প্রকাশ পায়।[১]

৫. সুফরাতুয-যাদ (বাগদাদে দারুস সালাম প্রেস থেকে ১৩০৩ সালে মুদ্রিত)।

৬. 'আত্‌তিরায আল মুযাহহাব'। ১৩১৩ হিজরীতে 'জারীদাতুস ফালা' নামক প্রেস থেকে এটি মুদ্রিত হয়েছে।

---

১. মুকাদ্দিমা রূহুল মা'আনী ফী আস সাবইল মাসানী।

৭. 'গারাইবুল ইগতিরাব ওয়া নুযহাতুল আলবাব।' এতে রয়েছে আল্লামা আলূসীর কনস্ট্যান্টিনোপলে ভ্রমণের সুন্দর বৃত্তান্ত এবং তাঁর সমসাময়িক বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও বিদ্বানমণ্ডলীর সংক্ষিপ্ত জীবন কথা। মাহমূদ আলূসীর যোগ্যতম পুত্র সাইয়েদ আহমাদ শাকির আলূসী কর্তৃক ১৩১৮ হিজরীতে বাগদাদ থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

৮. 'আল-ফাইযুল ওয়ারিদ আলা মারসিয়াতি খালিদ'।[১]

৯. 'কাশফুত্ তুররাহ' আল্লামা হারীরীর 'দুররাতুল গাওয়াসির শারা'।

১০. 'আল-মাকামাতুল খিয়ালীয়া'।

১১. 'নিশওয়াতুস শুমূল'। মুফতীর পদ থেকে বিচ্যুত হওয়ার পর ইস্তাম্বুল অভিমুখে যাত্রাকালীন বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহের কথা উল্লেখ করে তিনি এই কবিতাটি প্রণয়ন করেন।[২]

হিজরীর চৌদ্দ শতক এবং ঈসায়ীর বিশ শতকে ই'জাযুল কুরআনের ধ্যান-ধারণা এবং এই বিশিষ্ট বিষয়বস্তুর অধ্যয়ন ও বিচার-বিশ্লেষণ নিয়ে বেশ জোরদারভাবে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গরম গরম আলোচনা চলতে থাকে। শুধু তাই নয়, কার্যগত ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এই ই'জায শাস্ত্রকে অকাট্যভাবে প্রমাণ করার জন্যও একটা সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রবণতা দেখা দেয়। অবশ্য এ ধারার প্রথম পথিকৃত হচ্ছেন ইমাম ফাখরুদ্দীন রাযী, (ওফাত ৬০৬ হিজরী ১২১০ ঈসায়ী) ইমাম গাযযালী (ওফাত ৫০৫ হিজরী

---

১. তারাজিমি মাশহিরুস্ শারক: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৮ এবং 'জিলাউল আইনাইন: পৃষ্ঠা ২৭।

২. কিতাবু আদাবিল আরাবিয়া: ১ম খণ্ড; পৃষ্ঠা ৫৮। এছাড়া উর্দু ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম: ১ম খণ্ডের ২২৪—২৫ পৃষ্ঠায় আল্লামা মাহমূদ আলূসীর বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।

১১১১ ঈসায়ী) এবং আল্লামা আলূসী (ওফাত ১২৭০ হিজরী)। এমন কি ইমাম জালালউদ্দীন সুয়ূতীও (ওফাত ৯১১ হিজরী, ১৫০৫ ঈসায়ী) এই দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা অধিকতর প্রভাবান্বিত।

সে যাই হোক, সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে ই'জায শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও বিচার-বিশ্লেষণ উনিশ শতকের প্রান্তভাগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যতটা উৎকর্ষ লাভ করেছে এবং করছে ততটা বিগত দিনের কোন সময়ে লাভ করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। এ সম্পর্কে তাই মিসরের সুপ্রসিদ্ধ আধুনিক লেখক মরহুম আমীন আল-খাওলী বলেন: "এই যুগে বিশেষভাবে পবিত্র কুরআনের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ব্যাখ্যা করার একটি স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপক প্রবণতা দেখা দেয়। এতে করে একথা প্রমাণিত হয় যে, ই'জায শাস্ত্রকে সপ্রমাণ করার জন্য এই বিজ্ঞানই যেন একটা অন্যতম হাতিয়ার স্বরূপ। বিজ্ঞানের বলেই ইসলাম আজ আধুনিক জীবন যাপনের যাবতীয় প্রয়োজনীয়তার সম্পূরক।"

এই ধরনের ব্যাখ্যা অবশ্য ইতিপূর্বেই ইমাম ফাখরুদ্দীন রাযীর তাফসীরেও পাওয়া যায়। তাছাড়া পবিত্র কুরআন থেকে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করতে হবে বলে পরবর্তীকালে যে সমস্ত বই লেখা হয়েছে, সেগুলোতে এ ধরনের প্রচুর ব্যাখ্যা দৃষ্টিগোচর হয়। এ দৃষ্টিভংগী ও চিন্তাধারা অচিরেই যেন বেশ সুদূরপ্রসারী হয়ে উঠে। এ সম্পর্কে মুহাম্মদ বিন আহমাদ আল ইস্কান্দারী নামক তের শতক হিজরী ও আঠারো শতক ঈসায়ীর জনৈক প্রখ্যাত চিকিৎসক ও কামিয়াব লেখক একটি সুন্দর বই লিখেছেন। বইটির পুরো নাম:

كشف الأسرار النورانية القرآنية فيما يتعلق بالأجرام
السماوية والأرضية والحيوانات والنباتات والجواهر
المعدنية —

পার্থিব ও স্বর্গীয় গ্রহ-উপগ্রহ ও পশু-পাখী, উদ্ভিদ এবং খনিজ

সম্পদ ও পদার্থ সম্পর্কে কুরআনে হাকীমের প্রদীপ্ত রহস্যসমূহের দ্বারোদ্ঘাটন।

The exposition of the enlightened Quranic secrets regarding heavenly planets ahd earthly matters, the anim.ls, the plants and the mineral treasures).

এটি ১২৯৭ হিজরী মুতাবিক ১৮৯৭ ঈসায়ীতে কায়রোর ওহাবিয়া প্রেস থেকে তিন খণ্ডে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

এই লেখকেরই দ্বিতীয় বইয়ের নাম 'তিবইয়ানুল আসরার আররাব্বা নিয়্যাহ ফী আন্নাবাতাত ওয়াল মাআদিন ওয়াল খাওয়াস্সিল হাইওয়া-নিয়্যাহ'।

تبیان الاسرار الربانیة فی النباتات والمعادن والخواص الحیوانیة ـ

(The manifestation of the godly secrets in plants, minerals and animal characteristics) এটি দামেশক থেকে ১৩০০ হিজরী মুতাবিক ১৮৮২ ঈসায়ীতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।[১]

বস্তুত মুহাম্মদ আল ইসকানদারী ছিলেন একজন কামিয়াব লেখক। তিনি ১২৯৯ হিজরীতে এই শেষোক্ত বইয়ের পাণ্ডুলিপি খতম করেন। এর অব্যবহিত পরই মালাকুল মওত আযরাইল মিলনের মধুর রাগিনী বাজিয়ে তাঁর প্রাণের দুয়ারে আহ্বান জানান। তাঁর আর একটি বইয়ের নাম 'আযহারুল মাজনীয়া ফী মুদাওয়াতিল হাইজা'।

এভাবে পবিত্র কুরআন থেকে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সাবেত করার একটা বিশেষ ধরনের প্রবণতা দেখা দেয়, আর এ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের পুস্তক-পুস্তিকাও লিপিবদ্ধ হতে শুরু হয়। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন

১. উর্দু ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম : ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০৪।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত আয়াতসমূহকে পবিত্র কুরআনের শব্দাবলী থেকে অনুসন্ধান করে বের করা হয়। এভাবেই এক ব্যাপক দিগন্তপ্রসারী রীতির বিস্তার লাভ করে।

এ সম্পর্কে মিসরের শিক্ষামন্ত্রী জনাব আবদুল্লাহ ফিকরী পাশাও (ওফাত ১৩০৭ হিজরী) ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিজ্ঞানসম্মত বিভিন্ন দিককে জ্যোতির্বিদ্যার আলোকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একটি সুন্দর বই লিখেন। এটি কায়রো থেকে ১৩১৫ হিজরী মুতাবিক ১৮৯৭ ঈসায়ীতে মুদ্রিত হয়েছে। তার অন্যান্য কিতাবগুলো এই ঃ

১. 'মুকারানাতু বা'যি মাবাহিসিল হাইয়াত বিল ওয়ারিদি ফী আন নুসূসিস শারইয়া'।

مقارنة بعض مباحث الهيئة بالوارد فى النصوص الشرعية —
مطبع المدارس ١٢٩٢ ع —

২. 'আল ফাওয়াইদুল ফিকরিয়া লিল মাকাতিবুল মিসরিয়া'
— الفوائد الفكرية للمكاتب المصرية

এটা মিসরের হিজর প্রেস থেকে ১৩০০ সালে মুদ্রিত।

৩. নাযমুল লাআল ফিল হিকাম ওয়াল আমসাল।

৪. তা'বীবুল মায়লুকাতিল বাতিনীয়া।

এই শেষোক্ত কিতাবটি জনাব আবদুল্লাহ ফিকরী পাশা তুর্কী থেকে আরবীতে ভাষান্তরিত করেন।

আবদুর রহমান আল-কাওয়াকেবী

ইসলামে আধুনিকতার প্রবর্তকরূপে আর একজন মনীষী আবদুর রহমান আল কাওয়াকেবীও (ওফাত ১৩২০ হিজরী) এই ই'জাযুল কুরআনের ভাবধারাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তৎপ্রতি বৈজ্ঞানিক প্রবণতাকে

সম্পন্ন করেন সর্বান্তকরণে। এই ব্যাপারে তিনি পবিত্র কুরআন থেকে বহু নিত্য নতুন তথ্যও আবিষ্কার করেন।[১]

আবদুর রহমানের পিতার নাম ছিল শায়খ আহমদ আল-কাওয়াকেবী। 'কাওয়াকেবী' নামক এই পরিবারটা সারা আলেপ্পো ও কনস্ট্যান্টিনোপলের মধ্যে একটা অতি সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত খান্দানরূপে শুমার করা হতো। এই শিক্ষিত পরিবেশেই আবদুর রহমান জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১২৬৫ হিজরীতে। তিনি আরবী ও তুর্কী ভাষায় ছিলেন সমান পারদর্শী। এছাড়া আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি শাখায় সমান ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। সাংবাদিকতার সাথেও তিনি বহুদিন ধরে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন।

পবিত্র কুরআনের সাথে সম্পৃক্ত কতগুলো বৈজ্ঞানিক ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়ে আবদুর রহমান আল-কাওয়াকেবী বলেন: প্রত্যক্ষভাবেই হোক অথবা পরোক্ষভাবে, প্রায় ১৪ শো বছর আগে থেকে বহু বৈজ্ঞানিক তথ্যের সংবাদ নিহিত রয়েছে এই কুরআন মজীদের পত্রান্তরালে। কিন্তু এতদিন ধরে এগুলো প্রচ্ছন্ন থাকার কারণটাই বা কি?

কারণ এই যে, এগুলো প্রকাশ পাওয়ার উপযুক্ত সময় এলে এর চিরন্তন মু'জিযারূপে পবিত্র কুরআন স্বয়ং বজ্রগম্ভীর স্বরে সাক্ষ্য প্রদান করছে যে, ইহা নিঃসন্দেহরূপে বিশ্বজাহানের একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহ্ পাক পাকের কালাম, যে আল্লাহ্ ছাড়া গায়েবের খবর কেউ ঘুণাক্ষরেও দিতে পারে না।[২] কারণ এই গায়ব বা অদৃশ্যের সংবাদ দানের ক্ষমতা আল্লাহ্ নিজের মধ্যেই সীমিত রেখেছেন। এই ইল্ম তিনি অন্য কাউকে সোপর্দ করেন নি। এমন কি মানবমুকুট নবীকুল সম্রাট হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ)-কেও না।

বস্তুত আবদুর রহমান আল-কাওয়াকেবী হচ্ছেন বহু গ্রন্থের স্বনাম-ধন্য লেখক। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তাঁর লিখিত বহু গ্রন্থই অপ্রকাশিত

১. তাবাইউল ইসতিবদাদ: আবদুর রহমান আল-কাওয়াকেবী; পৃষ্ঠা ২৬—২৮।
২. উর্দু ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম: ৪র্থ খণ্ড; পৃষ্ঠা ৫০৪।

রয়ে গেছে। আর যেগুলো প্রকাশ পেয়ে বহির্বিশ্বের আলোর ছোঁয়াচ পেয়েছে সেগুলোর সংখ্যা আমার মনে হয় মাত্র দু'টি। একটির নাম 'উম্মুল কুরা' অপরটির নাম 'তাবাইউল ইস্তিবদাদ'। স্বনামখ্যাত লেখক মুহাম্মদ আহমাদ খালফুল্লাহ সাহেব কাওয়াকেবীর জীবনকথা লিপিবদ্ধ করেন।

মুস্তফা সাদিক আর-রাফেয়ী

মিসরের প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক ও কবি মুস্তফা সাদিক আর-রাফেয়ী তাঁর অমর গ্রন্থ 'ই'জাযুল কুরআনে' বিশেষভাবে একটা ফসল বা অনুচ্ছেদ কায়েম করেন। এই বিশেষ অনুচ্ছেদটির নাম 'আল-কুরআন ওয়াল উলুম'। এর মাধ্যমে পবিত্র কুরআনে যতগুলো জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তার বিচিত্র শাখা-প্রশাখার প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য বর্ণনা রয়েছে, প্রায় সবগুলোরই তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি একথাও প্রতিপাদন করেন যে, পবিত্র কুরআনে রয়েছে সব রকম বিদ্যার মূল সূত্র বা কায়দা কুল্লিয়া। এ সম্পর্কে তিনি 'আল্-ইতকান' গ্রন্থে বর্ণিত আল্লামা জালালউদ্দীন সুয়ূতীর অভিমতের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

মুস্তফা সাদিক আর-রাফেয়ী বলেনঃ পবিত্র কুরআনের পরিসংখ্যান, মূল্য বা হিসাবুল জুম্মালের (حساب الجمل) মাধ্যমে সকল যুগের আশ্চর্য বস্তু, তত্ত্ব ও তথ্য, প্রতি যুগের ইতিহাস ও গূঢ় রহস্য – সব কিছুই প্রকাশ পায়। বর্ণনার উপসংহার বা ছেদ টানতে গিয়ে তিনি বলেনঃ এ আলোচনা আমাদের এই পুস্তকের জন্য নেহায়েত অপ্রাসংগিক না হলে নিশ্চয়ই আমরা এ প্রসংগে আরও বহু নিত্য নতুন ও প্রাচীন তথ্য পেশ করতে সক্ষম হতাম।

শায়খ তানতাভী

আমার মনে হয় এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের বিজ্ঞানসম্মত বর্ণনা ধারাকে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যিনি সবচাইতে বেশী যাঁচাই করে

দেখেছেন এবং স্বীয় একনিষ্ঠ সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা সুন্দরতর রূপ দিতে প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি হচ্ছেন মিসরের প্রখ্যাতনামা মনীষী আল্লামা শায়খ তান্‌তাভী।

মুফতী মুহাম্মদ আবদুহুর কতগুলো রুহানী শিষ্য (Spiritual disciple) ছিলেন। তাঁর চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীর অনুপম আদর্শকে তাঁরা লোকচক্ষুর সামনে পুরোপুরিভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। এদের মধ্যে ওয়াকফ স্টেটের মন্ত্রী শায়খ মুস্তাফা আবদুর রাজ্জাক, শায়খ আবদুল করীম সালমান, শায়খ সাদ যগলুল, শায়খ মুস্তাফা আল্‌মারাগী এবং আল্লামা তান্‌তাভী জওহারী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই শেষোক্ত মনীষী শায়খ তান্‌তাভী (ওফাত ঃ ১৯৪০ ঈসায়ী) মিসরের তান্‌তাবিলায় জন্মগ্রহণ করেন। এখানেই তিনি মিসরের প্রখ্যাত ওয়ালী সাইয়েদ আহমদ বাদভীর সমাধি সংলগ্ন শিক্ষায়তনে তা'লীম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর পূর্ব-সূরী ও আধ্যাত্মিক গুরু মুফতী আবদুহু সাহেবও এই শিক্ষাগারে বসে শিক্ষালাভ করেন। আশ্চর্যের বিষয় যে, ওস্তাদ শাগরিদ উভয়েই এই শিক্ষা-য়তনের তা'লীম পদ্ধতির প্রতি অল্প দিনেই বিরাগভাজন হয়ে পড়েন। তাই এখান থেকে বিদায় নিয়ে উচ্চশিক্ষার মানসে জামে আযহারে ভর্তি হয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

বস্তুত শায়খ তান্‌তাভী ছিলেন অত্যন্ত অভিনব পন্থী। তাই আযহারের প্রাচীনপন্থী আলিমদের সাথে প্রায়ই তাঁর মতবৈষম্য যেন লেগেই থাকতো। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি মিসরের দারুল উলুমে, বর্তমানে যেটা কায়রো ইউ-নিভার্সিটির এক বিশিষ্ট কলেজে পরিণত হয়েছে, অধ্যাপনা শুরু করেন।

একবার জার্মান থেকে এক দার্শনিক পণ্ডিত শায়খ তান্‌তাভীর জীবন কথা ও জীবনাদর্শকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার মানসে মিসরের মাটিতে পা দিয়েছিলেন। তিনি প্রতিদিন শায়খ তান্‌তাভীর সান্নিধ্যে এসে খুঁটিনাটি-

সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। হয়তো এই জীবন কথাটি এখন জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

তুর্কিস্তানের মুসলমানরা চীন ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার পর যখন নিজেদের জন্য একটা স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করে, তখন তারা সেখানে একটা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েরও বুনিয়াদ পত্তন করে।[১]

অতঃপর সেখানের আলিমকুল যুগোপযোগী অনুসন্ধানের পর আল্লামা জওহারীর নির্দেশিত সিলেবাস ও শিক্ষাপদ্ধতিকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে সেই আন্তর্জাতিক শিক্ষায়তনের নাম রেখেছিলেন তানতাভী বিশ্ববিদ্যালয়।

শায়খ তানতাভীর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অতি উচ্চ, উন্মুক্ত ও উদার। তিনি এ দাবী করতেন এবং দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতেন যে, মুসলমানরা যদি এখনও কুরআনকে তাঁদের পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে মেনে নেয়, আর প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর নির্দেশকে বাস্তবে রূপ দান করতে প্রয়াস পায়, তাহলে আপনা আপনিই তাদের পারস্পরিক সব কলহ-দ্বন্দ্ব ও মতানৈক্যের অবসান ঘটবে।

এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, শায়খ তানতাভীর বিদ্যাবুদ্ধি ছিল অত্যন্ত প্রখর ও গভীর। তিনি প্রায় সমস্ত যুগোপযোগী বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করেই বই লিখেছেন। রাষ্ট্রনীতিতে তাঁর যুগান্তকারী অবদান 'আল-আহকাম ফী সিয়াসাত' গ্রন্থটির ইউরোপীয় ও প্রাচ্যের বহু ভাষায় তরজমা হয়েছে। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অনবদ্য অবদান হচ্ছে 'তাফসীরে জওহারী।'

এর পুরো নাম—'আততাজুল মুরাসসা ফী তাফসীরিল কুরআন'। ১৩২৪ হিজরীতে ইহা মিসরের তাসাদ্দুক প্রেসে মুদ্রিত হয়। যামীমা বা পরিশিষ্ট (Supplementary) সহকারে সুদীর্ঘ ২৬ খণ্ডে সমাপ্ত হয়ে ইহা প্রকাশ পায় অর্থাৎ এই তাফসীরের পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় বিশ হাজার। এর পত্রান্তরালে

১. প্রফেসর হাসান আযমী আযহারী কৃত দাঈয়ানে ইত্তেহাদে ইসলাম আওর কুরআনী যবান ঃ পৃষ্ঠা ১১৮।

অংকিত রয়েছে বিভিন্ন মানচিত্র এবং মাঝে মাঝে ছবিও রয়েছে। এদিক দিয়ে এ ধরনের ইহাই একমাত্র প্রথম তাফসীর।

ইমাম ফাখরুদ্দীন রাযীর 'তাফসীর কাবীর' যেমন সপ্তম শতক হিজরীর শ্রেষ্ঠ অবদান, ঠিক তেমনি শায়খ তান্‌তাভীর এই তাফসীরও মযহাব বা দল-মত নির্বিশেষে ১৪ শতকের শ্রেষ্ঠ অবদান। পাক-ভারতের ওমরাবাদ জামেয়া দারুস সালাম মাদ্রাসার যোগ্যতম শিক্ষক মৌলভী ওবায়দুর রহমান সাহেব আকেল রহমানী উর্দু ভাষায় এর অতি চমৎকার তরজমা করেন। ভারতের আর্কট নামক স্থান থেকেও নাকি এর একটা উর্দু তরজমা প্রকাশ পেয়েছিল। মওলানা ওবায়দুর রহমান আকেল সাহেবের কাছে এই তান্‌তাভী ছিল অত্যন্ত প্রিয় বস্তু। তাই সুদীর্ঘ দিন ধরে তিনি এর পঠন ও পাঠনে ছিলেন ব্যাপৃত। এমনকি সুদূরপ্রসারী গুরুত্বকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে গিয়ে শুধুমাত্র এর অধ্যয়ন অধ্যাপনায় ক্ষান্ত থাকতে পারেন নি। তাই এটাকে উর্দুতে ভাষান্তরিত করে তিনি একাধিক খণ্ডে প্রকাশ করেন, যা হাতে হাতেই বিক্রি হয়ে আবার দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছিল। তাই মওলানা সাহেবের অনুমতি নিয়ে আযমগড়ের দারুল মুসান্নিফিন থেকে এটি প্রকাশিত হয়েছিল। যাই হোক, এর প্রথম উর্দু তরজমাটি যখন পাক-ভারতের বুকে প্রকাশ পায় তখন তার 'পেশে লফ্য' বা মুখবন্ধ লিখতে গিয়ে আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী বলেন : শায়খ তান্‌তাভী জওহারী বহুদিন ধরে জামেয়া মিসরিয়াহ এবং দারুল উলুম মাদ্রাসার জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখায় অধ্যাপনা করেন। যে সমস্ত শিক্ষার্থী পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি অনুরক্ত, তাদের হিদায়তের পথ সুগম করার মানসে তিনি সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতিতে পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহের বিস্তৃত তাফসীর ও ব্যাখ্যা করেন। কুরআন পাকের প্রতি শিক্ষিত নব্য যুবক ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের আকীদা ও বিশ্বাস দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হয়ে উঠুক—এই ছিল হয়তো তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। তিনি অন্তর দিয়ে কামনা করতেন, যেন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র শাখার সাথে প্রতিটি মুসলিম সম্যক পরিচিতি হাসিল করতে পারে এবং তারা এ পথে এগিয়ে আসতে পারে ত্বরিৎ গতিতে। তাঁর মতে মুসলিম সমাজ যতদিন পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইউরোপের নিত্য নতুন আবিষ্কার ও যন্ত্রপাতির সাথে

সম্যকরূপে অবহিত না হয়, ততদিন তাদের এই অবনতি ও দুর্গতির অবসান হওয়া আদৌ সম্ভবপর নয়। শায়খ তানতাভী কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা-প্রশাখার প্রতিই অতি ব্যাপক ও বিস্তৃতরূপে আলোকপাত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। এদিক দিয়ে আমার মনে হয় তিনি কতকটা যেন বিজ্ঞানের সর্বত্র জয়যাত্রা দেখে অতিমাত্রায় সন্ত্রস্ত ও স্তম্ভিত। মনে হয় তিনি সব সময় যেন বিজ্ঞানের প্রতি একটা নমনীয় ও আত্মসমর্পণের ভাব পোষণ করে থাকতেন। যেমন সূরা নূরের একটি আয়াত — مثل نوره كمشكوة অর্থাৎ 'আল্লাহ্ পাকের নূরের মিসাল একটি তাকের ন্যায় যার মধ্যে রয়েছে দীপশিখা।[১] এই আয়াত দ্বারা তিনি বর্তমান বিজ্ঞান জগতের বৈদ্যুতিক বাল্বকে সাব্যস্ত করতে চেয়েছেন। অনুরূপভাবে সূরা নূহের একটি আয়াতে রয়েছে— وقد خلقكم اطوارا অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে মাটি, রক্ত, শুক্র ইত্যাদির সহযোগে বিভিন্ন পর্যায়ক্রমে পয়দা করেছেন।[২] এই আয়াতের মাধ্যমে তিনি প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে, ক্রমবিবর্তনের (evolution theory) মধ্য দিয়েই জাতি বিশেষের উৎপত্তি হয়ে থাকে।

মোটকথা, পবিত্র কুরআনের যে সমস্ত আয়াতের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক তথ্যের অবতারণা করা হয়েছে অথবা প্রাকৃতিক কোন বস্তু সম্বন্ধে চিন্তা করতে নির্দেশ দান করা হয়েছে, সেই সমস্ত স্থানে বিস্তৃতভাবে চিত্রের সাহায্যে আল্লামা তানতাভী ঐ তথ্যগুলো পরিবেশন করেছেন।[৩]

শায়খ তানতাভী জওহারী তাঁর অনবদ্য তাফসীরের শুরুতে বলেন ঃ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা এই তাফসীর পাঠে বিলক্ষণ জানতে পারবেন যে, কুরআন পাকের সাথে প্রকৃতির গোপন রহস্য ও বিজ্ঞানের আজব তথ্যসমূহ কিভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে। তাঁর মতে এটাই হচ্ছে নবীয়ে উম্মীর (সঃ) রিসালত এবং কুরআনের ই'জায বা অলৌকিকতার জ্বলন্ত

১. সূরা নূর ঃ আয়াত ৩৫ ঃ রুকু ৫ ঃ পারা ১৮।

২. সূরা নূহ ঃ আয়াত ১৪ ঃ পারা ২৯ ; রুকু প্রথম।

৩. দৈনিক আজাদ ঃ ঈদ সংখ্যা, ১৩৫৩ সাল, প্রিন্সিপাল আদমুদ্দীন সাহেবের 'ইলমে তাফসীর' শীর্ষক প্রবন্ধ ঃ পৃষ্ঠা ৬৭—৭৭।

স্বাক্ষর। আল্লামা তান্‌তাভী তাঁর তাফসীরে এই ই'জায শাস্ত্র সম্পর্কে আরও ব্যাপক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে আলোচনা করেছেন।

তান্‌তাভী জওহারীর ছেলে জামালুদ্দীন তান্‌তাভী ছিলেন একজন উচ্চপদস্থ মিলিটারী অফিসার। তাই ধর্মীয় শিক্ষা অথবা ভাষা ও সাহিত্যের সাথে তাঁর কোন দূরেরও সম্পর্ক ছিল না। পাকিস্তানের প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও কর্মসাধক এবং উখুয়াতে ইসলামীর সংগঠক ও সেক্রেটারী প্রফেসর হাসান আযমী সাহেব তখন মিসরেই অবস্থান করছিলেন। তাই তিনি শায়খ তান্‌তাভীর অন্তিম শয্যায় হাযির হয়ে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন যে, তাঁর এই বিরাট কুরআনী লাইব্রেরী যেন উখুয়াতে ইসলামীর নামেই দান করা হয়। বলা বাহুল্য, শায়খ তান্‌তাভী ইন্তিকালের পূর্ব মুহূর্তে তাঁর বৃহত্তম গ্রন্থাগারটি উক্ত প্রতিষ্ঠানের নামেই লিখিতভাবে ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন।[১]

পাক-ভারতের প্রখ্যাত আলিম মওলানা আনওয়ার শাহ্‌ কাশমিরী (ওফাত: ১৩৫০ হিঃ) সম্পর্কে লিখিত 'নাফহাতুল আমবার মিন হাদীস শায়খিল আনওয়ার' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থেও শায়খ তান্‌তাভীর তফসীরুল কুরআনের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে।[২]

শায়খ তান্‌তাভী তাঁর এই তাফসীরুল কুরআন ছাড়া আরও বহু কিতাব রচনা করে গেছেন। যেমন:

১. জওয়াহিরুল উলূম।

২. আল-হিকমাত ওয়াল হুকামা (মিসরের তাকাদ্দুম প্রেস)।

৩. আস সিররুল আজীব ফী হিকমাতি তা'দাদি আযওয়াজিন্নাবী (১৩৩৩ হিঃ, জামালীয়া প্রেস)

---

১. প্রফেসর হাসান আযমী কৃত দাঈয়ানে ইত্তেহাদিল ইসলামী আউর কুরআনী যবান: পৃষ্ঠা ১২৬।

২. দেখুন; নাফহাতুল আমবার মিন হাদীস শায়খিল আনওয়ার: পৃষ্ঠা ৯১।

৪. মীযানুল জওয়াহির ফী আজাইবি হাযাল কওনিল বাহির।

৫. নাহ্যাতুল উম্মাতি ওয়া হায়াতিহা।

৬. আল-ফারাইদুল জওহারিয়া ফিত্তিরাফিল্লাহভীয়া (১৩১২ হিঃ মিসর থেকে মুদ্রিত)।

৭. জওয়াহিরুত্ তাকওয়া (১৩২২ হিঃ, মিসর থেকে মুদ্রিত)।

এ ছাড়া তাঁর লিখিত আরও বইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। এতে করে বোঝা যায় যে, আল্লামা তানতাভী শুধু যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন সম্পর্কে বিশেষ পারদর্শিতা ও বুৎপত্তি সম্পন্ন মনীষী ছিলেন তা নয়, বরং তিনি একজন যোগ্যতম সুদক্ষ আলিমও ছিলেন। তাঁর অনবদ্য তাফসীর জওয়াহিরুল কুরআনের এক স্থানে তিনি বলেনঃ জার্মানে অবস্থান করার সময় সেখানকার কতিপয় প্রাচ্যবিদের সাথে একদিন আমার সাক্ষাত ঘটে। কথা প্রসঙ্গে তাঁদের একজন জিজ্ঞেস করলেন, "অন্যান্য মুসলমানদের মত আপনিও কি এ ধারণা পোষণ করেন যে, কুরআন উচ্চতর আরবী সাহিত্যরীতির একটা অলৌকিক ও জ্বলন্ত নিদর্শন?" দৃপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলাম, "হাঁ, তা পোষণ করবো না কেন? এটা তো আমার একান্ত দৃঢ় বিশ্বাস।" আমার কথায় তাঁদের চোখে মুখে বিস্ময়ের ছাপ পরিস্ফুট হয়ে উঠলো। তাই অবাক বিস্ময়ে তাঁরা বলে উঠলেন, "আপনার মত বৈজ্ঞানিক ও আধুনিক জ্ঞানী-গুণীর কাছ থেকে আমরা এ ধরনের জবাব পাবো বলে আশা করিনি।" আমার তখন ধৈর্যের বাঁধ টুটে গেল। তাই চ্যালেঞ্জের সুরে বললামঃ "এতে আশ্চর্য হবার এমন কি আছে? এটা তো একটা মৌলিক প্রশ্ন। আসুন, এখানেই তার মূল্যায়ন হয়ে যাক। একটা ক্ষুদ্রতম জুমলা নিন। ধরুন—নরককুণ্ডের প্রশস্ততা অতি সুগভীর। এই ছোট্ট জুমলার ভাবটিকে এবার আপনারা যথাসাধ্য চিন্তা গবেষণা করে আরবী সাহিত্যের উচ্চতম পর্যায়ে প্রকাশ করুন তো দেখি।" তাঁরা বহুক্ষণ ধরে মাথা খুটে চিন্তা ভাবনা সাধ্য সাধনার পর জবাব দিলেনঃ "ইন্না জাহান্নামা লা আসিয়াতুন" (নিশ্চয় জাহান্নাম অধিকতর প্রশস্ত)।

অনুরূপভাবে আর একজন বললেন : "ইন্না জাহান্নামা লাফাসীহাতুন।" এই ধরনের কিছুটা শব্দগত পার্থক্য সহকারে একই মর্মের আরও বেশ কয়েকটা বাক্য শুনলাম। শুনে আমার দারুণ হাসি পেল। তাই পুনরায় বললাম তাদের, "আরও একটু কালক্ষেপণ করে চিন্তা গবেষণা করে দেখুন, যদি মাথায় খেলে যায়।" তাঁরা শেষ কথা বললেন : না, আমাদের দ্বারা আর হবে টবে না; আমাদের শেষ চিন্তা ও সাধনার দৌড় এ পর্যন্তই। আমি তখন তাদের বললাম : তাহলে এবার একটু ধীরস্থিরচিত্তে উন্মুক্ত মনোবৃত্তি নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখুন, ঠিক এই ভাবটিই কুরআন মজীদে কতো সার্থক ও সুন্দরতম ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে : ইয়াওমা নাকুলু লি জাহান্নামা হালিম তাতালি ওয়া তাকুলু হাল মিম মাযীদ।"।[১]

অর্থাৎ সেদিন আমরা দোযখকে জিজ্ঞেস করবো, কেমন, উদর পরিপূর্ণ হয়েছে কি? অমনি সে বলবে, না এখনও হয়নি, আরও কিছু আছে। বলা বাহুল্য, তাঁরা আরবী ভাষায় ছিলেন সুদক্ষ ও সমান পারদর্শী। তাই কুরআনের এরূপ অলংকারপূর্ণ অলৌকিক বাণী শুনে তারা একেবারে ব্যাকুল চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তাই নত শিরে অবাক বিস্ময়ে তাঁরা একথা স্বীকার করলেন যে, পবিত্র কুরআন আরবী সাহিত্যের সত্যিই একটা অলৌকিক বাস্তব নিদর্শন।

যে কোন ন্যায়বান আরবী ভাষাবিধ এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ বা দোদুল্যমান নীতি গ্রহণ করতে পারে না যে, আঁ হযরতের (সঃ) ন্যায় একজন উম্মী নবীর পক্ষে এহেন রচনা কিছুতেই সম্ভবপর হতে পারে। সে যাই হোক, এখন আমরা অতি সহজেই এ কথা বুঝতে পারছি যে, পবিত্র কুরআন ও অন্যান্য আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও যোগসূত্র স্থাপন করার মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে আল্লামা তানতাভী বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে গেছেন এবং অন্যান্য আরবীয় আধুনিক লেখকরাও এদিকে বিশেষভাবে মনোসংযোগ ও দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন।

১. সূরা কাফ্ : আয়াত ২৮; তৃতীয় রুকু; পারা ২৬।

এ প্রসঙ্গে ওসতাদ মুহাম্মদ সিদকী তাওফীকের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সৃষ্টির নির্দিষ্ট নির্ধারিত চিরন্তন নীতির উপর এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিষয়বস্তুর উপর তিনি কতগুলো বেশ মূল্যবান বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এগুলো পরে পুস্তকাকারে ছাপানো হয়। এর নাম 'দুরুসুস্ সুনানিল কায়িনাত'।[১]

ডক্টর মুহাম্মদ সিদকী তাওফীক শুধু যে একজন উন্নত পর্যায়ের লেখক ছিলেন তা নয়, তিনি উচ্চদরের সমাজ সংস্কারক এবং ক্ষণজন্মা পুরুষও ছিলেন। পবিত্র কুরআনের বৈজ্ঞানিক ভাবধারা ছাড়াও তাঁর অন্যান্য বিষয়বস্তু সম্পর্কিত নিম্নলিখিত পুস্তকের নাম পাওয়া যায়। যেমন:

১. আর-রাদ্দু আলা লর্ড ক্রোমার (Refutation of Lord Chromer)-র মাধ্যমে তিনি লর্ড ক্রোমারের মতবাদের খণ্ডন করেন।

২. দ্বীনুল্লাহি ফী কুতুবী আম্বিয়াইহী। এটি মিসরের আল-মানার প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৩. আদ্-দীন ফী নাযরিল আকলিস সাহীহ।

৪. নযরাতুন ফী কুতুবিল আহ্দিদ জাদীদ-ওয়া আকাইদুন-নাসরানিয়া।

পবিত্র কুরআনকে বৈজ্ঞানিক কর্মধারার সংগে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত করার এই যে একটা অদম্য প্রচেষ্টা—আমার মনে হয় এটা পাশ্চাত্য জগতের সাথে মুসলমানদের সংস্পর্শে আসারই একটা অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি। বলতে কি, পাশ্চাত্য মহলের বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিষ্কার ও প্রগতি দেখে মুসলিম মনীষীদের চোখ ঝলসে গিয়েছিল।

তাঁরা তখন আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা অতিমাত্রায় চমৎকৃত হয়ে এই তথ্যের ব্যাপক সন্ধানে উঠে পড়ে লেগে গেলেন যে, এই বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলো

---

১. দেখুন আমীন আল্-খওলী কৃত আত্-তাফসীর মা'আলিমু হায়াতিহী ওয়া মানাহিজিল ইয়াওম: পৃষ্ঠা ২০।

পবিত্র কুরআন থেকে উদ্‌ঘাটন করা যায় কি না। বলা বাহুল্য, এতে তাঁরা সর্বতোভাবে কামিয়াবও হয়েছিলেন। আর এ কথা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, এই পাশ্চাত্য মনীষীদের নব আবিষ্কৃত সকল তথ্যেরই উল্লেখ রয়েছে আজ থেকে নিয়ে ১৪ শ বছর পূর্বে অবতীর্ণ কুরআন পাকের পত্রান্তরালে। অবশ্য কুরআনের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য খুঁজতে গিয়ে তাঁদেরকে পবিত্র কুরআন থেকে বহু আয়াত মন্থন করতে হয়েছে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইসহাক আস্-শাতিবী (ওফাত ঃ ৭৯০ হিঃ) এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিপরীত মতের সমর্থক। তাঁর 'মুআফিত' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে তিনি বলেন ঃ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তাঁর নিত্য নতুন আবিষ্কার-সমূহের সাথে কুরআনের কোনই সম্পর্ক নেই।

কিন্তু আমার মনে হয় এটাও ঠিক নয়। কারণ আল্লাহ্ পাক (সূরা তীনের ৮নং আয়াতে) নিজেকে 'আহকামুল হাকেমীন' বা সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলে ঘোষণা করেছেন আর (সূরা ইয়াসীনের শুরুতে) কুরআন করীমকে বলেছেন 'হাকীম' অর্থাৎ মহাবিজ্ঞানময়। তিনি 'আল-কুরআন' নামক এই মহাবিজ্ঞানপূর্ণ গ্রন্থকে নাযিল করেছিলেন তাঁর প্রেরিত মহাপুরুষ মানবমুকুট হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ)-এর উপর। এই মহা-গ্রন্থের শতকরা ১১টি আয়াত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যে ভরা।

ما فرطنا في الكتاب من شئ - لا رطب ولا يابس الا في كتاب
مبين —

এই পবিত্র মহাগ্রন্থে কোন কিছু বর্ণনা করতে আমি এতটুকুও ত্রুটি করিনি; শুষ্ক হোক অথবা আদ্র এমন কোন বস্তু নেই যা কুরআন মজীদে বর্ণনা করা হয়নি। (আল-কুরআন ঃ সূরাতুল আন'আম)

সুতরাং কুরআন মজীদে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহের বর্ণনাও বাদ যেতে পারে না। মাতৃগর্ভে মানুষের স্থিতিলাভ থেকে শুরু করে তাঁর সার্বিক জীবন যাপন ব্যবস্থা, ভূগর্ভস্থ খনিজ পদার্থসমূহ, বায়ুমণ্ডল, উল্কা, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদির বিবরণ রয়েছে এই কুরআন করীমে। এজন্যই একে বলা

হয়েছে 'বিজ্ঞানময় কুরআন'। আল্লাহ্ পাক তাই বলেন : "আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজনে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে, মানবমণ্ডলীর হিতার্থে সাগরের বুকে বিচরণশীল পোতসমূহে, আকাশ থেকে যে বারিবর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং তার মধ্যে সর্ববিধ জীবজন্তুর বিস্তারণ সঞ্চারণে বায়ুর গতি পরিবর্তনে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে সত্য সত্যই জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রয়েছে।"[১]

অর্থাৎ আল্লাহ্র বিশাল সৃষ্টি জগত সম্বন্ধে স্থিরচিত্তে চিন্তা গবেষণা করার জন্য বারংবার মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃজন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে আর সাগরকে নিজের করতলগত করতে সক্ষম হয়; অনুরূপভাবে তারা যেন চন্দ্র, সূর্য, উল্কা ও বায়ুমণ্ডলের উপর স্বীয় আয়ত্তাধীন। কারণ গ্রহ-উপগ্রহ, নক্ষত্র, তারকাপুঞ্জ এবং নভোমণ্ডলের সব কিছুই সৃজন করা হয়েছে মানবের উপকার ও খিদমতের জন্য। পবিত্র কুরআনে এ ধরনের ইশারা সর্বত্রই বিরাজমান।

কুরআন বিজ্ঞান বিশারদগণ বহু অনুসন্ধান ও গবেষণার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সমগ্র কুরআনে ৭৫৬টি আয়াত শুধুমাত্র বিজ্ঞান সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন : "তিনি উম্মী বা নিরক্ষরদের মাঝে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে আল্লাহ্র নিদর্শন-সমূহ বর্ণনা করেন, তাদের পূত-পবিত্র করেন এবং কুরআন ও হাদীস বা ধর্ম সংক্রান্ত জীবন বিধান ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেন।[২]

"আল্লাহ পাক যাকে চান বিজ্ঞানের জ্ঞান দেন, আর যাকে বিজ্ঞানের জ্ঞান দেয়া হয় তার অশেষ কল্যাণ সাধন করা হয়।"[৩] আল্লাহ্র এই পূত বাণী পবিত্র কুরআনেরই গূঢ়তম রহস্যাবলীর দ্বারোদ্ঘাটনে সহায়তা করেছে। সুতরাং আজ বিজ্ঞানের দৈনন্দিন অগ্রগতি যেন ইংগিতময় কুরআনেরই ক্রমাগত

---

১. সূরাতুল বাকারা : আয়াত ১৬৪; দ্বিতীয় পারা।

২. সূরা আল-জুমুআ' : আয়াত ২; পারা ২৮।

৩. সূরাতুল বাকারা : আয়াত ২৬৯।

বিশ্লেষণ। অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের গাঢ় তিমিরজালকে অপসারিত করে কুরআনই সর্বপ্রথম জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রদীপ্ত আলোকরশ্মি বিকিরণ করে। আজ সেই আলোকলোকের সন্ধান পেয়ে আর্মস্ট্রং ও এলড্রিন প্রমুখ মার্কিন নভোচারী চন্দ্রালোকে অবতরণ করতে সক্ষম হয়েছেন। নিঃসন্দেহে ইহা মানব সন্তানের পক্ষে এক বিরাট অগ্রগতি আর মানব ইতিহাসের একটা অবিস্মরণীয় মহা বিস্ময়কর অধ্যায়। এই চন্দ্রাভিযানের প্রথম সবক তাঁরা পবিত্র কুরআনের সূরা 'আন-নাজম' এবং সূরা' 'বনী ইসরাঈলে' বর্ণিত 'মিরাজ বা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর ঊর্ধলোকে গমন থেকেই হাসিল করেছেন।

আজ থেকে প্রায় ১৪ শো বছর পূর্বে সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্য প্রেরিত মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) বুরাক বা বিদ্যুৎ সম্পন্ন এক যানবাহনের পিঠে চড়ে ক্ষণিকের মধ্যেই সমগ্র আকাশমণ্ডলের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ শেষ করে বিশ্বনিয়ন্তার সৃষ্টি নৈপুণ্য সশরীরে ও স্বচক্ষে অবলোকন করেন। বায়তুল মুকাদ্দিস বা জেরুজালেমের মসজিদ থেকে ঊর্ধলোকে উত্থিত হয়ে একাদিক্রমে সেই অসীম অন্তহীন সপ্তগগনে পূর্ববর্তী নবীদের সাথে সাক্ষাত করেন, বেহেশ্‌ত ও দোযখের পরিভ্রমণ সমাপ্ত করে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ করেন এবং দিবারাত্রি পাঁচবার নামাযের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে আবার সেই রাতেই ফিরে আসেন অত্যল্প সময়ের মধ্যে। ইহাই রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর 'মিরাজ' নামে সুপরিচিত। এক পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনা সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে। তাই রহস্যাবৃত সৃষ্টি জগতের চন্দ্রগ্রহ আবিষ্কৃত হওয়ার পর আজও কি মিরাজ অস্বীকারকারী বৈজ্ঞানিকদের চক্ষু খুলবে না ?

১৪ শো বছর আগে নবী মুস্তফা (সঃ) মিরাজে গিয়েছিলেন যে 'বোরাক' তথা আল্লাহ্ প্রেরিত এক বৈদ্যুতিক শক্তি সম্পন্ন পরিবহন মাধ্যমে, তা ছিল আমাদের এই বিদ্যুৎ শক্তির চাইতে লক্ষ কোটি গুণ শক্তিশালী ও দ্রুতগামী। অথচ আগের দিনে এত অল্প সময়ের মধ্যে লক্ষ কোটি মাইল অতিক্রম করা ছিল মনুষ্যজ্ঞানের বহির্ভূত। জ্যোতির্বিদরা মনে করতো ঊর্ধজগতের অগ্নিমণ্ডল এবং কুররায়ে যামহারীর বা শীতমণ্ডল অতিক্রম করা মনুষ্য শক্তির

পক্ষে দুঃসাধ্য। তা ছাড়া যুক্তিবাদীদের মতে এত কঠিন পদার্থ দিয়ে তৈরী এই আসমানের 'খারক ও ইলতিয়াম' অর্থাৎ ভাংগা ও জোড়া লাগা সম্ভবপর নয়। কিন্তু আজকাল বৈজ্ঞানিকরা দ্রুতগামী রকেটের সাহায্যে নির্বিঘ্নে চন্দ্রালোকে অবতরণ ও তা থেকে প্রত্যাবর্তন করে কার্যত এই অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক বলেন যে, "তিনি আকাশের বুকে চাঁদকে আলো এবং সূর্যকে জ্বলন্ত প্রদীপ হিসেবে তৈরী করেছেন।'[১]

هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا —

বস্তুত এই বস্তুজগতের জ্ঞানই হচ্ছে বিজ্ঞান আর এই দৃষ্ট বস্তুসমূহকে সামনে নিয়ে পরীক্ষা ও গবেষণা করা বৈজ্ঞানিকের ধর্ম। বিশ্বজাহানের যাবতীয় পদার্থ, উপাদান, উপকরণ ও বস্তুসমূহকে সামনে রেখে সে সর্বনিয়ন্তা ও সর্বস্রষ্টার সত্তাকে খুঁজে পায় এবং সব কিছুর মাঝেই সে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও সৃজন কৌশলকে বিদ্যমান দেখতে পায়। আল্লাহ্‌র সৃষ্ট আনবিক শক্তিবলে যুগ-যুগান্ত ধরে সাধনা, সংগ্রাম ও অভিযান পরিচালনার পর মানুষের পক্ষে আজ শুধুমাত্র চন্দ্রে গমন সম্ভবপর হয়েছে। কিন্তু আজ থেকে প্রায় সোয়া পাঁচ হাজার বছর পূর্বে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে আল্লাহ্‌ পাক আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি নৈপুণ্য ও রহস্যাবলী প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়েছিলেন। অতঃপর মানবকুল শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে সশরীরে সমস্ত আকাশমণ্ডলী বিচরণ করিয়ে বিভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান আহরণ করার সুযোগ দিয়েছিলেন। সুতরাং আজ বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রা, আবিষ্কার ও অবগতির মূলে রয়েছে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) ও শেষ নবী মুহাম্মদ মুস্তফার (সঃ) আকাশপানে অগ্রযাত্রা এবং জ্ঞান আহরণ। তাই বর্তমান বৈজ্ঞানিকদের প্রথম চন্দ্র অভিযানকারী হিসেবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও প্রশংসা করলে মহাসত্যের অপমান ও অপলাপ করা হবে বলেই আমি মনে করি।

সে যুগে মুসলিম জাতি কুরআন শিক্ষায় শিক্ষিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র শাখায় এক অভাবনীয় তরক্কী ও প্রগতি হাসিল করে বিশ্ব জাহানের ইমামতের গৌরবদীপ্ত আসন অধিকার করেছিল।

১. সূরা নূহ ঃ আয়াত ১৬; পারা ২৯।

وہ زمانہ میں معزز تھے مسلمان ہو کر

اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر[১]

এই আহরিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সোনালী পরশ ও ছোঁয়াচ পেয়েই ইউরোপ এক অভূতপূর্ব নবী-জীবনের সন্ধান পায় আর আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণার গোড়াপত্তন করতে সক্ষম হয়। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মধ্যযুগের সেই সূচিভেদ্য অন্ধকার ও স্থবিরতার অবসানকল্পে মহাগ্রন্থ কুরআন নাযিল হয়ে সর্বপ্রথম স্বাধীন চিন্তা উন্মুক্ত-উদার মনোবৃত্তি ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার এবং পর্যবেক্ষণের সাহায্যে নিত্য নতুন আবিষ্কার দ্বারা জগতের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার জন্য মানব জাতিকে উদাত্ত কণ্ঠে আহবান জানায়। এভাবেই পবিত্র কুরআন মানুষের চিন্তাজগতে এক মহা-বিপ্লবের সূচনা করে। কুরআন পাকের এই বিপ্লবী দাওয়াতে অনুপ্রাণিত হয়েই পাশ্চাত্য জগতের বৈজ্ঞানিকরা আজ অনেক নব নব তথ্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রকৃতির গোপন ভাণ্ডারকে উদঘাটন করে নানা ধন-সম্পদ উদ্ধার করেছেন। সমুদ্রগর্ভ থেকে মণি-মুক্তা ও হিরা-জহরত আহরণ করে কতো উন্নত আর কতো সম্পদশালী হয়েছেন! এ সবই একমাত্র মহাগ্রন্থ কুরআনের দান। মুসলিম জাতি যতদিন কুরআন মজীদকে হাতে ও দাঁতে মজবুত করে আঁকড়ে রেখেছিল, যতদিন ঈমান, ঐক্য ও শৃংখলা বজায় রেখে কুরআনে গবেষণা করেছিল, ততদিন তাঁদেরও সর্বতোমুখী চরম উন্নতি সাধন হয়েছিল।

নিল না মু'মিন কুরআনের বাণী
পাতা উলটানো সার।
ইয়াহুদী নাসারা নাস্তিক যত
নিল সেই কারবার।।

---

১. মুসলমানের তরেই তখন সে যুগ করিত গর্ববোধ,
কুরআন ছাড়িয়া এখন হয়েছে যুগ কলংক, হায় সাধক! (গোলাম মোস্তফা)

একথা অস্বীকার করি না যে, কুরআন জ্যোতিষ বিজ্ঞানের (Astrology) গ্রন্থ নয়। কিন্তু তাই বলে এতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সপ্রমাণিত খাঁটি সিদ্ধান্তের বিরোধী কোন বিবরণও নেই, থাকতেও পারে না। কারণ কুরআন পাক সেই মহান আল্লাহ্‌র বাণী, যিনি 'আল্লামুল গয়ূব।' তিনি যাবতীয় গূঢ় গোপন রহস্য সম্পর্কে সম্যক অবহিত।[১] সুতরাং পবিত্র কুরআনকে নিয়ে গবেষণায় প্রবৃত্ত হলে বিজ্ঞানের সব শাখা-প্রশাখা এবং বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কার করা হবে সহজলভ্য।

আজ সর্বত্রই বিজ্ঞানের সার্বিক উন্নতিতে চমকে ওঠা মানুষ কুরআনী জীবন ব্যবস্থাকে যুগপোযোগী বলে স্বীকার করতে চায় না। কিন্তু কুরআনের সর্বাঙ্গীণ ও সার্বজনীন জীবন ব্যবস্থাকে পূর্ণমাত্রায় অনুসরণ ও বাস্তবায়িত করলে মানুষ এই দুনিয়াতেই বেহেশ্‌তী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে আর আখিরাতেও হবে অনাবিল অফুরন্ত বেহেশতী সুখের মালিক, যে জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অতি প্রয়োজনীয় হিদায়ত হচ্ছে কুরআন মজীদ।

মুফতী শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু

মুফতী শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু বিন হাসান খায়রুল্লাহ্‌ আল-মিসরী (ওফাত ১৯০৫ ঈসায়ী) মিসরের এক পল্লীতে ১৮৪৯ ঈসায়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হাসান খায়রুল্লাহ্‌ নিজে কৃষক ছিলেন বলে ছেলেদেরও লাগিয়েছিলেন কৃষিকার্যে। কিন্তু মুহাম্মদ আবদুহুর মাঝে শুরু থেকেই একটা সাধারণ প্রতিভার কথা লক্ষ্য করে তিনি তাঁকে লেখাপড়া শেখাতে চেয়েছিলেন। তাই প্রথমে এক হাফেজ সাহেবের কাছে কুরআন মজীদ কণ্ঠস্থ করান এবং পরে জামে আহমদী নামক মাদ্রাসায় তাঁকে পড়ান। অতঃপর ১৮৬৬ ঈসায়ীর ফেব্রুয়ারী মাসে ১৫ বছর বয়ঃক্রমকালে তাঁকে মিসরের

১. দেখুন সূরা আন্‌'আম : আয়াত ১০৯-১১৬; সূরা তওবা, আয়াত, ৭৮; সূরা সাবা : আয়াত ৪৮।

মাশহুর এবং সর্বোচ্চ শিক্ষার পাদপীঠ 'জামে আযহারে' ভর্তি করা হয়। এখানে তিনি অনন্য মনে 'দ্বীনি উলুম' শিক্ষা করতে লাগলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাসাউফের গভীর ছাপ তাঁর জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে লাগলো। দিবাভাগে তিনি লেখাপড়ার চর্চা করতেন এবং রোযা রাখতেন আর সমস্ত রাত ধরে তিনি বিনিদ্র নয়নে নামায, তিলাওয়াতে কুরআন ও তাসবীহ তাহলীলে মশগুল থাকতেন। এমনকি সুফীদের ন্যায় মোটা খদ্দর পরিধান করে যোগ সাধনের অন্যান্য কঠোর রীতিনীতির তিনি পুরোপুরি অনুশীলন করতে শুরু করেন। স্বীয় উস্তাদ এবং সমপাঠিদের সঙ্গে অধ্যয়ন সম্পর্কীয় অত্যাবশ্যক আলোচনা ছাড়া সাধারণত তিনি কারুর সাথে আদৌ কথা বলতেন না। এমন কি পথচারী অবস্থায়ও সব সময় নীচের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতেন। এভাবে সুফীয়ানা জীবন যাপন করতে গিয়ে তিনি তাঁর সমাজ ও দুনিয়ার সাথে প্রায় সকল সম্বন্ধই একরূপ বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। তাঁর এই অবস্থা দর্শনে শায়খ দরবেশ অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং তাসাউফ ও বৈরাগ্য সাধনের এই করাল কবল থেকে মুক্তি লাভ করে আবার তাকে সেই প্রাকৃতিক স্বভাবসুলভ ও সরল জীবন যাপন করতে উপদেশ দান করেন, যার ফলে তিনি দেশের, সমাজের বৃহত্তর ও মহত্তর কল্যাণ সাধনে আবার নিজেকে উৎসর্গ করতে বদ্ধপরিকর হন।[১]

শায়খ আবদুহুর জীবনে এই আমূল পরিবর্তনের প্রাথমিক অনুপ্রেরণা দান করলেন শায়খ দরবেশ, যিনি নিজেই সর্বপ্রথমে তাঁকে সুফিয়ানা জীবন ধারণে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। অতঃপর মুসলিম সমাজের সংস্কারক ও প্রবর্তক হিসেবে যিনি তাঁকে দ্বিতীয়বার অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করলেন তিনি হচ্ছেন মুসলিম জগতের যুগ বিপ্লবী শ্রেষ্ঠ নায়ক সাইয়েদ জামালুদ্দীন আফগানী (ওফাত: ১৮৯৭ ঈসায়ী)।

---

১. See Charles C. Adam's "Islam and Modernism in Egypt." (Oxford, 1933) এবং আল্লামা রশীদ রিযা কৃত তারীখুল উসতায ইমাম—১ম খণ্ড; পৃষ্ঠা ৭—১০।

এই সাইয়েদ জামাল আফগানী (জন্ম ১৮৩৯ ঈসায়ী) ছিলেন সমগ্র মুসলিম জাহানের জাগরণ ও আমূল সংস্কারের অন্যতম অগ্রদূত। তিনি তদানীন্তন মুসলিম সমাজের মৃতপ্রায় অন্তরে নব জাগরণের সাড়া ও স্পন্দন জাগাতে গিয়ে নিজের জীবনকে করেছিলেন সর্বতোভাবে উৎসর্গ।

তাঁর ইচ্ছা ছিল যে একবার মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলো পাশ্চাত্য দেশের করাল কবল থেকে মুক্ত হতে পারলে এবং ইসলাম ধর্মে আধুনিক যুগের দাবী-দাওয়ার সম্পূরক হিসেবে সংস্কারমূলক রীতিনীতির প্রসার লাভ করলে মুসলমানরাও পাশ্চাত্য জাতির ন্যায় নিজেদের জাতীয় জীবনে আবার এক অভিনব ও সার্থক জীবনধারা সৃষ্টি করতে পারবে। এক অনন্য সাধারণ ও সর্বতোমুখী ব্যক্তিত্বের মালিক সাইয়েদ জামাল যে নব জাগরণের সূচনা করেন, তার পূর্ণ প্রভাব জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়।

১৮৭১ ঈসায়ীতে মিসরের মাটিতে পা দিয়ে তিনি 'আল-আযহার' বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কে কতগুলো প্রাণবন্ত ভাষণ দান করেন, যার আকুল প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মিসরের মাটিতেই তাঁর অগণিত ভক্ত-অনুরক্ত শাগরিদ শিষ্যের উদ্ভব হয়। তন্মধ্যে আহমদ নাদীম ও আদীব ইসহাক প্রমুখ মনীষী শুধুমাত্র তাঁর রাজনৈতিক দিকটাকেই অবলম্বন করেন।[১] কিন্তু যোগ্যতম শ্রেষ্ঠ শাগরিদ শায়খ আবদুহু তাঁর কাছ থেকে জ্বলন্ত শিক্ষা পদ্ধতি, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও অকুণ্ঠ কার্যক্রমের বিশেষভাবে দীক্ষা নিয়ে তাঁর সংস্কারমূলক নৈতিক দিকটাকে খুব রৌশন করেন। এতে করে আবদুহুর জীবনের গতিপথ সম্পূর্ণরূপে বদলে যায়। তাই ১৮৭৯ সালে মিসরের মাটি থেকে বিদায় নেওয়ার প্রাক্কালে জামাল তাঁর প্রিয় ভক্তবৃন্দকে সান্ত্বনার বাণী শোনাতে গিয়ে বলেছিলেন: "আমি চলে যাচ্ছি বটে, কিন্তু তোমাদের কাছে রেখে যাচ্ছি মুহাম্মদ আবদুহুকে। মিসরের জন্য ওই যথেষ্ট।"

---

১. আল্লামা রশীদ রিযা কৃত তারীখুল ইমাম: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২ (মিসর ১৯৩১ সাল)।

স্বয়ং শায়খ আবদুহু তাঁর এই শিক্ষাগুরু সম্বন্ধে বলেন: "আমার পিতার মাধ্যমে ঠিক অন্যান্য ভাই-বোনদের মতই আমি জড় জীবন লাভ করেছি, আর জামাল আফগানীর মাধ্যমে লাভ করেছি এমন এক আধ্যাত্মিক জীবন, যাতে নবী, ওয়ালী ও পয়গম্বরগণও শামিল রয়েছেন।[১]"

প্রখ্যাত Dutch writer Paljon বলেন: পাক-ভারতের সাইয়েদ আহমদ খান এবং মিসরের শায়খ আবদুহু—উভয়ের প্রচেষ্টায় যে সংস্কারমূলক আন্দোলনের অভ্যুদয় ঘটে তার উদ্দেশ্য ছিল এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ শতাব্দী ধরে মুসলমানদের মাঝে যে জড়তা ও অকর্মণ্যতা স্তূপীকৃত হয়েছিল, তার অবসান ঘটিয়ে তাদের জাতীয় জীবনে একটা স্পন্দন আনয়ন করা। কিন্তু উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ভিন্ন রকমের। স্যার সাইয়েদ ইসলামকে পাশ্চাত্য মুকুরে নিরীক্ষণ করে সেই রঙেই রঞ্জিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল যতদিন পর্যন্ত উপমহাদেশে মুসলিম সমাজ আহারে, বিহারে, কর্মপদ্ধতি ও সাধনায় ফিরিঙ্গীদের রঙে রঞ্জিত না হবে ততদিন এই শাসক গোষ্ঠী তাদের সম্মানের চোখে দেখবে না। আর মুসলমানদের মন থেকেও সেই নীচতা ও হীনমন্যতা নিরসন হবে না। পক্ষান্তরে শায়খ আবদুহু মুসলিম জাতির সামাজিক দুরবস্থাকে দূর করে পাশ্চাত্য প্রগতির ছোঁয়াচ ও আলোকে জাতির অবস্থাকে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন বটে, কিন্তু ফিরিঙ্গীদের সেই অন্ধ অনুকরণ বা তাকলীদ দ্বারা নয়।[২] খ্যাতনামা বৃটিশ দার্শনিক Herbert Spencer-এর সাথে আবদুহুর

১. ডক্টর আহমদ আমীন কৃত যু'আমাউল ইসলাহ্ ফিল আসরিল হাদীস: পৃঃ ২৯৩, মিসর, ১৯৪৮ সাল।
Also see Islam & Modernism in Egypt by Charles C. Adam, Translated into Urdu by Moulana Abdul Majid Salik, Pakistan.

২. তারীখুল উসতায ইমাম; আল্লামা রশীদ রিযা: ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১১২—১৩।

সে আলোচনা হয়, এতে তিনি পাশ্চাত্যের সেই ক্রমবর্ধমান জড়বাদের (Materialism) বিরুদ্ধে জোর গলায় শেকায়েত করেন।[১]

মুফতী আবদুহুর জীবনের বিভিন্নমুখী ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা ও আন্দোলনের মৌলিক ধারাটি সম্পূর্ণরূপে ছিল সমাজ সংস্কারমূলক। 'আল আকাইউল মিসরিয়াহ' নামক মিসরের সরকারী সংবাদপত্রের যখন তিনি সম্পাদক নিযুক্ত হলেন, তখন থেকেই তাঁর বহুদিনের একটা আন্তরিক গুপ্ত অভিলাষ বাস্তবে রূপ লাভ করার যেন সুযোগ ঘটে গেলো। তাই তিনি এই সংবাদপত্রের মাধ্যমে তাঁর সমাজ সংস্কারমূলক সংকল্প ও বাসনাকে দেশের আনাচে-কানাচে প্রচার করতে লাগলেন অতি ব্যাপকভাবে। উচ্চপদস্থ অফিসারদের অনাচার ও দুর্নীতিকে সর্বসাধারণের চোখের সামনে তুলে ধরে তার তীব্র কঠোর প্রতিবাদ ও সমালোচনা করতে তিনি শুরু করলেন।[২] মিসরের প্রখ্যাত লেখক উসমান আমীন বলেনঃ নৈতিক চরিত্রের শিক্ষাগুরু শায়খ আবদুহু তাঁর তা'লীম ও তরবীয়তের মাধ্যমে মিসরীয় সমাজের বহু দোষ, জঘন্য রসম-রেওয়াজ এবং শিরক বিদ'আতের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণপূর্বক মুসলিম জাতির সামাজিক মান-মর্যাদাকে ক্রমাগত উন্নীত ও জাগ্রত করতে চাচ্ছিলেন।[৩]

দুঃখের বিষয় যে, আবদুহুর মত একজন বৈপ্লবিক চিন্তানায়ককেও স্বদেশের মায়ায় জলাঞ্জলি দিয়ে একদিন দেশান্তরিত হতে বাধ্য করা হয়। এই দেশ বিতাড়িত অবস্থায় তিনি দেশ হতে দেশান্তরে গমনাগমন কালে বিভিন্ন

Modem Muslim and the Quran's Interpretation by J. M.S. Bajon; P. 4 (Luiden, 1961)

১. W. S. Alunt, My Diaries (London, 1932) P. 481

২. তারীখুল উসতায ইমাম; রশীদ রিযা; ১ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ১৩৭, ১৭৩, ১৮০।

৩ উসমান আমীন কৃত রায়েদুল ফিকরিল মিসরী, পৃষ্ঠা ২৯ (মিসর ১৯৫৫ সাল)।

বাসিন্দাদের রসম ও রেওয়াজ, আচার ও অনুষ্ঠান এবং ইসলামী আকীদা সম্পর্কে সম্যক পরিচয় ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান আহরণ করেন। তাই প্যারিস থেকে সাইয়েদ জামাল আফগানীর সাহচর্যে যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে যখন তিনি 'আল-উরওয়াতুল উস্‌কা' নামক পত্রিকাটি বের করেন, তখনও তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল সমাজের ভিতর থেকে শিরক বিদ'আত ও জঘন্য রসম ও রেওয়াজ দূর করে তার আমূল সংস্কার সাধন করা। প্যারিস থেকে পুনরায় বাইরুতে ফিরে এসে শায়খ আবদুহু সুলতানীয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপনা, সাহিত্য সাধনা এবং লিখন ও পঠনের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েন। এই সময় স্বীয় ওসতাদ জামাল আফগানীর ফরাসী ভাষায় লিখিত 'জড়বাদীর খণ্ডন' নামক অতি সুন্দর বইটির আরবী ভাষায় তরজমা করতে শুরু করেন। এর আরবী নাম 'আর রাদ্দু আলাদ্দাহ্‌রিয়ান' (Refutation on Materialism)। এটিকে শেষ করে তিনি তাঁর 'রিসালা আত-তাওহীদ' নামক মাশহুর কিতাবটির পাণ্ডুলিপিতে হাত দেন। এটি বাইরুত থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই চমৎকার কিতাবটিতে তিনি নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও আধুনিক চিন্তাধারার মাধ্যমে ইসলামের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং গুরু গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করেন যে, মানুষের বিবেক-বুদ্ধি অন্য কারো তাকলীদ বা অন্ধ অনুকরণের নাগপাশে কোনদিনই আবদ্ধ থাকতে পারে না।

সমাজ সংস্কার সম্পর্কে শায়খ আবদুহু যে দিকটার প্রতি সবচাইতে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং জোর দিতে চেয়েছেন, সেটা হচ্ছে তার যুক্তিবাদিতা ও মুক্ত বুদ্ধিবৃত্তি। প্রকৃতপক্ষে এটাই তাঁর আন্দোলনের মূল অধ্যায়। তাকলীদ বা অন্ধ অনুকরণকে তিনি এই বিদগ্ধ মুসলিম সমাজের জড়তা, অসাড়তা ও অবনতির একমাত্র মৌলিক কারণ বলে মনে করতেন। তাঁর মতে এই তাকলীদ এবং অযৌক্তিক জঘন্য রসম ও রেওয়াজ এবং আচার-অনুষ্ঠানের অনুসরণ করা একটা দুরারোগ্য ক্ষত ও ব্যাধির নামান্তর মাত্র। এ ব্যাধি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে না পারলে সুন্দর ও সুষ্ঠু সমাজ কায়েম করা অসম্ভব। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও একথার তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন যে, একটা প্রাচীন কুপ্রথা ও কুসংস্কারের পেছনে গড্ডালিকা প্রবাহের মত ভেসে চললে মানুষের অন্তর

ও মন-মেজাজ এমনভাবে অর্গলাবদ্ধ হয়ে যায় যে, নব নব আবিষ্কার ও খেয়াল তাতে আদৌ অনুপ্রবেশ করতে পারে না।[১]

শায়খ আবদুহু তাকলীদের বিরোধিতা করতে গিয়ে কখনো কখনো অত্যন্ত কঠোর মূর্তি ধারণ করতেন। 'তাই শারহুদ দাওয়ানী' নামক গ্রন্থের হাশিয়ায় তিনি তাকলীদকে কুফরীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, তাকলীদ পন্থীরা যেহেতু ধর্মের মৌলিক নির্দেশগুলো যুক্তি ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যতিরেকে স্বীকার করে নি এইজন্য তাদের ইয়াকীন বা দৃঢ় বিশ্বাস কোনদিন হাসিল হয় না। আর যতক্ষণ পর্যন্ত ধর্মের মৌলিক সূত্রে (Fundamental tenets of Islam) ইয়াকীন না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত শক-সন্দেহের অবকাশ রয়ে যাবে অবশ্যম্ভাবীরূপে। কাজেই এ হেন ব্যক্তি কাফির নামে অভিহিত হওয়ার পুরো হকদার।[২]

'তাফসীরুল মানারে' তিনি বলেন, কাফির সেই ব্যক্তি, যে সত্যের আলো দেখতে পেয়েও চক্ষু বন্ধ করে নেয়। আর যখন সনাতন বাণীর আওয়াজ তার কর্ণকুহরে অনুপ্রবেশ করে তখন সে কানে আঙ্গুল দিয়ে রাখে। সে যুক্তি বা দলীল প্রমাণের কোনই পরোয়া করে না; বরং পার্শ্ববর্তী লোক-দের তাকলীদ পন্থী দেখে সে তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে আরও নিবিড়ভাবে পূর্ব-পুরুষদের অন্ধ তাকলীদে লেগে যায়।[৩]

মুফতী আবদুহুর মতে তাকলীদে যারা অন্ধ বিশ্বাসী তারা পবিত্র কুর-আনের শিক্ষার নিকটবর্তী হতে পারে না। কারণ কুরআন সব সময় আমা-দের যুক্তিবাদী হতে উদ্বুদ্ধ করে আর আমাদের অন্তর্দৃষ্টিকে প্রসারিত করার জন্য প্রেরণা যোগায়। তাই তাকলীদের অনুসারী হলে আমরা

---

১. তারীখুল উসতায ইমাম ঃ আল্লামা রশীদ রিযা; ২য় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ১১৩।

২. সুলায়মান দুনিয়া কৃত "শায়খ আবদুহু বাইনাল ফালাসিফাতি ওয়াল কালামিয়্যীন (মিসর, ১৯৫৮ সাল) পৃষ্ঠা ৫৭।

৩. তাফসীর আল-মানার, ১ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ৩৭।

ইসলামের পাবন্দ থাকতে পারবো কি করে? উপরিউক্ত গ্রন্থ রিসালা আত্‌ তাওহীদের ৯৬ পৃষ্ঠায় শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু ই'জায শাস্ত্রের প্রশ্ন নিয়েও অতি সুন্দরভাবে আলোচনা করেন। তাঁর মতে এই পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই একটা অমর মু'জিযা। কারণ এই নশ্বর ধরাধামে পবিত্র কুরআনের শুভ আগমন সূচিত হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী (সঃ)-এর মাধ্যমে, যিনি ছিলেন উম্মী বা নিরক্ষর। কারণ তিনি তাওরীত-ইঞ্জিলের সুপণ্ডিত হলে ব্যাপারটা অন্য রকম হয়ে দাঁড়াতো। তাছাড়া এই মহাগ্রন্থ এমন ভূত-ভবিষ্যত ও অদৃশ্যের খবরে সমৃদ্ধ যা ঐশী বাণী ছাড়া অন্য কিছুর দ্বারা সম্ভবপর নয়। বিগত ও আগামী দিনে বহু অজ্ঞাত গোপন তত্ত্ব ও তথ্য এমন সুন্দর ও বিশদভাবে কুরআন মজীদে বর্ণিত হয়েছে যে, একে জ্বলন্ত মু'জিযা বলা ছাড়া কোন উপায় নেই। কারণ দূর অতীতের ঘটনাবলীর বিস্তৃত আলোচনা ভবিষ্যদ্বাণী অপেক্ষাও বেশ জটিল ও দুরূহ ব্যাপার। পূর্ববর্তী নবী ও তাহাদের ঘটনা প্রবাহ যা উলামায়ে কিরাম ব্যতীত অন্য কেউ জানতেন না, সে সম্পর্কে কুরআন মজীদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে।

এ প্রসংগে একথা বলাও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক যে, আঁ হযরত (সঃ) হয়তো কোন য়াহূদী আলিমের কাছ থেকে এই ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। কারণ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, কুরআন করীম নাযিল হওয়ার সময়ে মক্কা ভূমিতে কোন য়াহূদীই তার বাসস্থান স্থাপন করেনি। অবশ্য মদীনা তাইয়্যেবায় তারা বহু আগে থেকেই বসবাস করতো। আর নবী আকরাম মদীনার বুকে হিজরত করেছিলেন নবুওতের সুদীর্ঘ তেরোটি বছর অতীতের ইতিহাসে বিলীন হওয়ার পর। তাছাড়া এই কওমে য়াহূদ ইসলামের প্রতি চিরদিনই এমন বৈরীভাব পোষণ করে এসেছে যে, রসূলুল্লাহ্‌কে (সঃ) এ ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসতে কোন দিনই তারা প্রস্তুত ছিল না। অথচ কুরআন মজীদে হযরত নূহ, হযরত ইউসুফ (আঃ) প্রমুখ পয়গম্বর এবং মরিয়াম সিদ্দীকার (আঃ) কাহিনী প্রসংগেও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ ধরনের উক্তি করা হয়েছেঃ

"এ একটা নির্ভেজাল অদৃশ্যের খবর, যা আমি তোমার প্রতি ওহী রূপে নাযিল করছি; আর তুমি তাদের পাশেও ছিলে না, যখন তারা মরিয়মের প্রতিপালন ব্যাপার নিয়ে লেখনী নিক্ষেপ করছিল।[১]

অনুরূপভাবে ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কেও পবিত্র কুরআনের ভূমিকা আরও সুদূরপ্রসারী। কালের ইতিহাস দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সাক্ষ্য প্রদান করে যে, কুরআনের সব ভবিষ্যদ্বাণীই বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছে ঃ

"হে নবীর (সঃ) প্রিয় সহচরবৃন্দ! নিশ্চয়ই তোমরা খানায়ে কাবায় নির্বিঘ্নে ও নির্ভয়ে প্রবেশ করবে। আর তোমরা সেখানে মস্তক মুন্ডন ও চুল কর্তন ক্রিয়াও সম্পন্ন করবে। (অর্থাৎ পবিত্র হজ্জ উদযাপন করবে)।[২] এই ঘোষণাবাণী প্রচারিত হওয়ার কালে আপাতদৃষ্টিতে ইহা ছিল জটিল ও দুর্বোধ্য। কারণ অদূর ভবিষ্যতে কুরায়শ নেতাদের দুর্বল হয়ে যাওয়া আর মুসলমানদের বলীয়ান হওয়ার ফলে গোটা হেরেম শরীফ তথা কাবাগৃহ যে মুসলমানের করতলগত এবং তাঁরা স্বাধীনতার সংগে হজ্জক্রিয়া সমাধা করতে সক্ষম হবেন, ইহা বাহ্য দৃষ্টিতে অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু অতি অল্পদিনের মধ্যেই এই গায়েবী খবরের সত্যতা সর্বতোভাবে প্রতিপন্ন হয়ে গেল।

আর একটি গায়েবী সংবাদ হচ্ছে এই ঃ

"হে রসূলের অনুসারীবৃন্দ। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল, তাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের এই ওয়াদা রয়েছে যে, এই পার্থিব জগতের খিলাফত ও নেতৃত্ব আল্লাহ্ তাদেরই হাতে অর্পণ করবেন এবং তাঁদের পূর্ববর্তিগণের মতই এই সমূগরা ধরণীর বুকে বিপুল আয়তন বিশিষ্ট সুবিশাল সাম্রাজ্য তাঁদের দান করা হবে। শুধু তাই নয়, আল্লাহ্ তাঁদের জীবন ব্যবস্থাকেও অত্যন্ত জয়যুক্ত এবং উন্নীত করবেন, আর তাঁদের যাবতীয় ভয়-ভীতিকে নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করবেন।"

১. সূরা আলে-ইমরান ঃ আয়াত ৪৪।

২. সূরা বানী ইসরাঈল ঃ আয়াত ২৭; পারা ১৫।

গুটিকতক দুর্বল মুসলিম সম্পর্কে কিরূপে ইহা কল্পনা করা যায় যে, অনতিবিলম্বেই এরা সমগ্র বিশ্বজাহানের একচ্ছত্র মালিকরূপে নিজেদের পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে? অথচ একটা অভ্রান্ত এবং ঐতিহাসিক সত্য যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তব রূপ লাভ করার কাল শুরু হয় হযরতের (সঃ) সময় থেকেই অর্থাৎ আরব ভূখণ্ড তাঁর জীবদ্দশায়ই সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের আয়ত্তাধীনে এসে পড়েছিল। অতঃপর তাঁর প্রথম খলীফাদ্বয় হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) আমলে মিসর, রুম, ইরান, সিরিয়া প্রভৃতি ভূখণ্ডও সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের অধীনস্থ হয়ে পড়ে। এরপর আস্তে আস্তে মুসলিম জাতি এই সুবিশাল ধরণীর প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে অস্থির অপ্রতিহত গতিতে। কেউ তাদের বিজয় গতিকে রোধ করতে পারে না। সর্বত্রই তাঁরা অনন্ত কল্যাণ বিজয় ও সাফল্যের পুষ্পমাল্যে ভূষিত ও অভিষিক্ত হতে থাকে।

মুফতী মুহাম্মদ আবদুহু তাঁর তাফসীরুল মানারে গায়েবকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। গায়েবে হাকীকী এবং গায়েবে ইযাদী।[১] এই পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন ও বিশিষ্ট আয়াত দ্বারা কারো কারো অন্তরের অন্তঃস্থিত কথা সম্পর্কে এমনভাবে অবগত করা হয়েছে যে, পরবর্তী যুগে ঐসব ব্যক্তির নিজস্ব স্বীকারোক্তির দ্বারা কুরআনী আয়াতের যথার্থ সত্যতা সর্বতোভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। যেমন কুরআনে বলা হয়েছেঃ "তারা মনে করে যে, আল্লাহ্ আমাদের এই অস্বীকৃতির দরুন শাস্তি দেন না কেন?"

বলা বাহুল্য, তাদের এই অন্তঃস্থিত অব্যক্ত কথাগুলো কুরআনই সর্বপ্রথম জনসমক্ষে প্রকাশ করেছে। তারা নিজে কারো কাছে ব্যক্ত করেনি।

পূর্ববর্তী জাতিসমূহ, সৃষ্টির আদি থেকে মুহাম্মদী যুগ পর্যন্ত তাদের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত ও ধর্মীয় ভাবধারা সম্পর্কে কুরআনের বিবরণ দিবালোকের ন্যায় এতদূর সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ পাক ওহীর মাধ্যমে অবগত না করলে আমাদের নবীয়ে উম্মীর পক্ষে তা জানার কোন উপায় ছিল না।

১. তাফসীরুল মানার; ৭ম খণ্ড; পৃঃ ৪৫২-৪৬৯, খুলাসা দেখুন।
তাফসীরুল মানার; ৯ম খণ্ড : পৃষ্ঠা ৫১৩।

য়াহূদ জাতি সম্পর্কে কুরআন একবার ভবিষ্যদ্বাণী করলো যে, তারা নিজেকে আল্লাহ্‌র প্রিয় বন্ধু বলে মনে করে বটে; কিন্তু প্রিয়তমের পার্শ্বে উপস্থিত হওয়ার জন্য তারা কস্মিনকালেও মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে পারবে না।

বাহ্যত এই মৌখিক আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে আদৌ প্রতিবন্ধক ছিল না বা মৃত্যু কামনার অধীর হওয়ারও কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ ছিল না। বরং মৃত্যু কামনা দ্বারা কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীকে সর্বতোভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ইহাই ছিল সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও অন্ততঃ একটি বারের জন্যও মৃত্যু কামনা করার সৎসাহস তাদের হয়নি।

রোম পারস্যের অনিশ্চিত যুদ্ধ সম্পর্কে কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল এই যে, প্রথমে পারস্যই জয় লাভ করবে; কিন্তু দশ বছর যেতে না যেতেই রোম আবার নব বিজয়ের বরণডালা দ্বারা অভিনন্দিত হবে এবং পারস্য পরাজয়ের গ্লানি বরণ করবে।[১] এতদ্‌শ্রবণে মক্কার কুরায়শ কওম হযরত আবু বকরের (রাঃ) সঙ্গে বাজী ধরে বসলো। কিন্তু পরবর্তীকালে এই ভবিষ্যদ্বাণী যখন অক্ষরে অক্ষরে সত্য হলো তখন কুরায়শরা নিজেদের হার মেনে বাজীর সমস্ত টাকা আবু বকরের (রাঃ) হাতে অর্পণ করলো। অবশ্য রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) নির্দেশমত হযরত আবু বকর এই টাকাগুলো কুরায়শদের ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, কারণ এ ছিল এক প্রকারের জুয়া।

পবিত্র কুরআনে এ ধরনের গায়েবী খবর দুটো একটা নয়, বরং ভূরি ভূরি উদাহরণ ও দৃষ্টান্তের রয়েছে অপূর্ব সমাবেশ। আশ্চর্যের কথা যে, প্রতিটি গায়েবী খবরের সত্যতা সর্বতোভাবে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন হয়েছে। কালের আবর্তনেও এই অমোঘ বাণীর সত্যতায় এতটুকুও রদবদল হয়নি; আর হবেও না। এই তো গেল গায়েবী খবরের কথা। এ ছাড়া আরবের অগণিত দেশবরেণ্য কবি ও সেরা সাহিত্যিকরা কত সাধ্যসাধনা আর কত প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার পরও কুরআনের অনুরূপ একটা সংক্ষিপ্ততম সূরা

---

১. সূরা আর রূম: আয়াত ২-৪; পারা ২১।

এমনকি একটা ক্ষুদ্রতর বাক্য বা পংক্তি রচনা করতেও অপারগ হয়েছে। এই চিরন্তন চ্যালেঞ্জ শুধু যে কুরআনের অন্তর্নিহিত সুষমারাজি তথা দার্শনিক গূঢ় তত্ত্বাদির মধ্যেই সীমিত ও গণ্ডিভূত করে রাখা হয়েছিল তা নয়, বরং শব্দালংকার ও ভাষা নৈপুণ্যের দিক দিয়েও সমগ্র জাতিকে সমষ্টিগতভাবে মুকাবিলা করার অতিরিক্ত সুবিধাটুকু দিয়ে রেখেছিল। তখনকার দিনে আরবদের ব্যাপক সাহিত্যানুশীলন আলংকারিক শিল্পকলা ও শাস্ত্র চর্চায় পারস্পরিক প্রদর্শনী ও প্রবল প্রতিযোগিতা একটা ঐতিহাসিক অমোঘ সত্য। এমনি এক সুন্দর সোনালী মুহূর্তে যখন আরব-উপদ্বীপের অধিবাসীরা সাহিত্য ক্ষেত্রে নিজেদের একচ্ছত্র আভিজাত্যের উপর প্রগলভতা প্রকাশ করতে গিয়ে বিশ্ব জাহানের অন্যান্য মানবমণ্ডলীকে বোবা, মূর্খ ও অজ্ঞ নামে অভিহিত করতো একজন অনাড়ম্বর ও নিরীহ নিরক্ষর ব্যক্তির মুখঃনিসৃত বাণীর চ্যালেঞ্জ তাদের মন-মেজাজের উপর কতো যে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত হেনেছিল, তা অতি সহজেই অনুমেয়।

বিশেষ করে যারা আগে থেকেই এই নব আন্দোলনকে সমূলে নির্মূল ও বানচাল করার জন্য ছিল বদ্ধপরিকর এবং খড়গহস্ত।

অগণিত ভাষাবিদ এবং প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক শত্রুপক্ষের সকল প্রকার শক্তি ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাদের সামনে কুরআন মজীদের এই প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ ও নির্ভীক আহবানে সমগ্র আরববাসী যে একেবারে খড়গহস্ত এবং রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠবে আর প্রতিগৃহ থেকে আল-কুরআনের মত হাজার হাজার গ্রন্থ সংকলিত হয়ে জনসমক্ষে উপস্থিত হবে, এটাই ছিল একান্ত স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক। কিন্তু তা হয়েছিল কি? জগতের ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করছে যে, তারা শুধু এই চিরন্তন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং রসূলুল্লাহ্‌কে (সঃ) কাহিন, পাগল, যাদুকর ও গণক প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে পরাজয়ের এই দারুণ গ্লানিকে কতকটা লাঘব করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু তাদের এই নিষ্ফল আক্রোশ, অশোভন উক্তি ও কুৎসিত আচরণ যে প্রকারান্তরে পরাজয়েরই স্বীকারোক্তি ছিল তা বলাই বাহুল্য।

শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু এই অভিমত পোষণ করেন যে, কুরআনের ই'জায বহুল পরিমাণে নিহিত রয়েছে এর আলংকারিক গুণাবলীর মাঝে। এদিক দিয়ে তিনি কতকটা আল-বাকিল্লানীর অভিমতের সাথে একমত। প্রিয় শাগরিদ আল্লামা রশীদ রিযা কর্তৃক বারংবার বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু জামে আযহারের 'রেওয়াকে আবশাসী' নামক স্থানে মিসরের সম্ভ্রান্ত লোকদের সামনে বক্তৃতার মাধ্যমে তাফসীরের সিলসিলা শুরু করেন। তাফসীর সংক্রান্ত এই বক্তৃতাগুলো পাণ্ডুলিপি আকারে রশীদ রিযা নিজ হস্তে লিপিবদ্ধ করতেন এবং পরে 'মাজাল্লাহ্ আল-মানার' পত্রিকায় সেগুলো ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতেন। পরে অবশ্য এগুলো শায়খ আবদুহু জীবদ্দশায় পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হয়। সর্ব প্রথমে সূরাতুল আসর, তারপর সূরা আল ফাতিহা এবং এভাবে শায়খ শাহেবের ওফাত পর্যন্ত ১২ পারার তাফসীর প্রকাশিত হয়। দ্বাদশ পারা প্রকাশ পেয়েছিল ১৩৪৫ হিজরীর মুহররম মাসে। এই তাফসীরের ভাষা এত স্বচ্ছ আর বিষয়বস্তু এত মূল্যবান যে, বর্তমান যুগে কোন তাফসীরের সাথেই এর তুলনা হয় না। ইসরাঈলী রিওয়ায়েতগুলোকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে শুধুমাত্র সহীহ্ আহাদীসের উপর ভিত্তি করেই এই তাফসীর সংকলিত হয়। Banking system ইত্যাদি অত্যন্ত সাময়িক প্রসঙ্গগুলোও এই তাফসিরে বাদ যায় নি। মনে হয় এর সর্বত্রই যেন ইমাম গাযযালী, ইমাম ইবনু তাইমিয়া এবং তাঁর প্রিয় শাগরিদ ইমাম ইবনু কাইয়েমের দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারার রং ছড়িয়ে রয়েছে। আল্লামা আবদুহুর প্রধান কৃতিত্ব হচ্ছে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার দিকে দৃষ্টি রেখে ইসলামের প্রগতিমূলক ব্যাখ্যা প্রদান করা এবং মুসলিম জীবনে এই আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারাকে প্রবর্তন করা।[১] তাই বর্তমান যুগের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে লিখিত বিভিন্ন সমস্যা ও তার সুন্দরতর সমাধানের ইঙ্গিত রয়েছে এই অনবদ্য তাফসীর গ্রন্থে। এ ছাড়া এর বিভিন্ন পত্রান্তরালে ই'জায শাস্ত্র সম্বন্ধেও সুন্দর আলোচনা এবং সেই সঙ্গে শায়খ আবদুহুর অতি মূল্যবান মতামতও ছড়িয়ে রয়েছে।

---

১. অধ্যাপক রশীদ আহমদ আরশাদ কৃত 'আল ওহীউল মুহাম্মদী'র ভূমিকা, পৃষ্ঠা ১৭ এবং মাজাল্লাহ্ আল-মানার, ৮ম বর্ষ : পৃষ্ঠা ৪৫৬।

মুফতী আবদুহুর মতে সকল যুগে সকল দেশের মুসলমানেরই ইজতিহাদে রয়েছে একটা সহজাত এবং নিরংকুশ অধিকার। এই জন্মগত অধিকারে তাই কারুর হস্তক্ষেপ করা সমীচীন নয়। বাস্তবের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে বাপ-দাদার যুগ থেকে যে সব রসম ও রেওয়াজ এবং আচার-অনুষ্ঠান পুরুষানুক্রমে চলে আসছে সেগুলোকে অন্ধের মত পালন করাকে ইসলাম একটা নিছক বেওকুফী ও নিবুর্দ্ধিতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

মুফতী আবদুহু তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআন মজীদের মুদাফিয়াতের উদ্দেশ্য নিয়ে স্যার সাইয়েদের মত মাঝে মাঝে Apologetic Tendency-ও অবতারণা করেছেন। কিন্তু সবচাইতে বেশী আল্লামা তানতাভীর মত পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে তিনি বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারগুলোকে কুরআন দিয়েই সাধিত করার প্রয়াস পেয়েছেন।[১]

মিসরের মুফতীয়ে আযমের পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত ফতোয়া প্রদান করেন তম্মধ্যেও নৈতিকতা এবং সংস্কারের দিকটা কোন দিনই প্রচ্ছন্ন ছিল না।[২]

রাজনীতি, ধর্ম, অধ্যাপনা, ইফ্তা, পঠন, পাঠন ইত্যাদি বিভিন্নমুখী দায়িত্বপূর্ণ কার্যের সাথে নিজেকে ওতঃপ্রোতভাবে ব্যাপৃত রাখা সত্ত্বেও মুফতী মুহাম্মদ আবদুহু তাঁর জীবদ্দশায় জ্ঞান দর্শনের বিচিত্র শাখাকে মৌলিক অবদানে সমৃদ্ধ করে বহু দুর্লভ গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। তম্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১. আল-ইসলাম ওয়ান-রাদ্দু আ'ল মুতাফিদীহি।

২. আল-ইসলাম ওয়ান নাসারানীয়া মা'আল ইল্মি ওয়াল মাদীনা।

---

১. দেখুন আহম্মদ আমীন কৃত যু'আমাউল ইসলাম ফী আল-আসরিল হাদীস এবং তাফসীর আল-মানারের মুখবন্ধ।

২. Islam and Modernism in Egypt, Charles Adam (Oxford, 1933).

৩. ইসলাহুল মাহাকিমিস্ শারঈয়াহ (আল্লামা রশীদ রিযা এর প্রথমাংশে একটা সুন্দর ভূমিকা লিখেছেন। উক্ত ভূমিকায় তিনি এর সংক্ষিপ্তসার এবং প্রসংগ-কথাও অতি চমৎকার ভাবে বর্ণনা করেন)।

৪. রিসালাহ আত্-তাওহীদ (ই'জায শাস্ত্র প্রসঙ্গে এই পুস্তকটির নাম ও অনবদ্যতা সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে)।

৫. রিসালাতুন ফী আর-রাদ্দি আলা মুসিউহানুতু (ইনি ছিলেন ফরাসীর পররাষ্ট্র মন্ত্রী) ইসলামের বিরুদ্ধে তিনি এমন তীব্র আঘাত হেনেছিলেন যে, মুহাম্মদ আবদুহুকে এর দাঁতভাংগা জবাব দিতে হয়েছিল, যার ফলে এই ফরাসী পণ্ডিতকেও অবশেষে ইসলামের সমর্থক হতে হয়েছিল)।

৬. শারহু মাকামাতি বদিউয যামাদানী (ওফাত—১০০৭ ঈসায়ী)।

৭. 'মুকতাবানুস সিয়াসাত।

৮. শারাহু নাহাজুল বালাগা।

৯. আল্-উরওয়াতুল উসকা' বা অবিচ্ছেদ্য গ্রন্থি (Strongest hand hold)। মূলত এ ছিল একটা আরবী পত্রিকা। ১৮৮৪ সালে মুফ্তী আবদুহু মিসর থেকে বিতাড়িত হলে পর তাঁর প্রিয় শায়খ জামাল আফগানীর (ওফাত—১৮৯৭ ঈসায়ী) সাথে প্যারিসে গিয়ে মিলিত হন। অতঃপর এই উভয় মনীষীর যুগ্ম সম্পাদনায় উক্ত পত্রিকাটি প্রকাশ পায়। ইংরেজের শোষণ নীতির তীব্র সমালোচনা এবং তন্দ্রাচ্ছন্ন মুসলিম জগতকে স্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে আবার ঐক্যবদ্ধ হতে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল এর মূল সুর।

শায়খ মুহাম্মদ আবদুহুর শিক্ষা ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মিসরের কাসেম আমীন (ওফাত—১৯০৮), আলী আবদুর রায্যাক ও তোহা হুসেন প্রমুখ মনীষী তাঁর সংস্কারমূলক আন্দোলনকে আরও অগ্রগতির পথে তুলে ধরেন। বস্তুত আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সনাতন পন্থী শিক্ষা পদ্ধতির বিরুদ্ধে আবদুহুর কঠোর প্রতিবাদ আজ যেন একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করেছে। যার ফলে মিসর ও মুসলিম জাহানের অন্যত্র আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক

দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার সাধিত হয়েছে। চিন্তার ক্লৈব্য ও আচ্ছন্ন মানসিকতার জন্যে তিনি ধর্মবেত্তাদেরও কঠোর সমালোচনা করতে ছাড়েন নি। এমন কি ফিকাহ্ শাস্ত্রের বিরুদ্ধেও তিনি সবাক ছিলেন এবং এক্ষেত্রে নতুন দিক নির্দেশ করেন। তাই জামে আযহারের আলিমরা তাঁকে অত্যন্ত সন্দেহের নযরে দেখতেন। এমন কি তাঁকে সালফে সালেহীনদের দুশমন মনে করতেন আর প্রায়ই বলতেন যে, এ আবার কোন ধরনের আলিম, যে ফারসী ভাষায় কথাও বলে, ফিরিংগী মুলুকে যাতায়াতও করে, আবার তাদের বই-পুস্তকেরও তরজমা করে। এ ছাড়া এমন ফতোয়া দেয়া যা ইতিপূর্বে কেউ দেয় নি; গরীব, মিসকীন ও সমিতির সাহায্যের জন্য চাঁদাও জমা করে।

মোটকথা, জামে আযহারের আলিমদের শত্রুতার দরুন শায়খ আবদুহুর জীবনটা একেবারে দুর্বিষহ ও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। আসলে আবদুহুর উদারতা ও সংস্কারমুক্ত মানব প্রীতিকে (Humanism) সহ্য করতে না পেরে তাঁরা তাঁর জানী দুশমন সেজেছিলেন। তাই এর বিরুদ্ধে আবদুহুকে আজীবন সংগ্রাম চালাতে হয়েছে। এমন কি মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায়ও তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে না পেরে এই কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন ঃ

ولست ابالى ان يقال محمد
ابل او اكتظت عليه المائم
ولكن دينا قد اردت صلاحه
احاذر ان تقضى عليه لعمائم

মুফতী আবদুহুর মানব প্রীতিতে (Humanism) মুগ্ধ চিত্তে ফরাসী লেখক Laconture-এর মন্তব্য অতি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

১. আহমদ হাসান যাইয়াত কৃত তারীখুল আদাবিল আরাবী ঃ পৃঃ ৪৪৬ এবং Islam and Modernism in Egypt, Charles Adams-এর কতকাংশের উর্দু তরজমা করেন মুযাহিরুদ্দীন সিদ্দীকি বি. এ.। এটি ইকবাল একাডেমী লাহোর থেকে প্রকাশ পেয়েছে।

With Md. Abduhu the spirit of enquiry broke Into the closed world of Muslem thought. However shapeless his doctrine may seen, oddly readionary sometimes and full of an optimistic naturalism which now tooks old fashioned and however disconcerting his mixture of conformity with a foldness that threatened to undermine the faith itself yet he offers the elements of the most important spiritual revolution……

For though it is from the lofty humanism.

শায়খ মুহাম্মদ আবদুহুর কর্মবহুল জীবন তারীখ পরিলক্ষিত হয় বিভিন্ন গ্রন্থের সমাবেশে। যেমন—মিসরের প্রখ্যাত লেখক সুলায়মান দুনিয়া কৃত 'শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু বাইনাল ফালসাফাতি ওয়াল কালামিঈন' নামক গ্রন্থটি ১৯৫৮ ঈসায়ীতে মিসর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া 'মাজাল্লাহ-আল-মানারের, ৮ম বর্ষ, ৪৫৬ পৃষ্ঠা এবং ২৮ শে সংখ্যার ৬৫১ পৃষ্ঠায় তাঁর সওয়ানিহ হায়াত বা জীবনচরিত পাওয়া যায়। শায়খ মুহাম্মদ আবদুহুর নির্ভরযোগ্য ও বিস্তৃততম জীবন চরিত লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর প্রিয় শাগরিদ আল্লামা রশীদ রিযা (ওফাত ১৯৩৫ ঈসায়ী) 'তারীখুল ইমাম' নামে।

এটি এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে, তিন খণ্ডে ন্যূনাধিক তিন হাজার পৃষ্ঠায় প্রকাশ হয়েছে। এতে আল্লামা জামাল আফগানী এবং অন্যান্য সমসাময়িক আলিমকুলের বিস্তারিত ঘটনাবলীও সন্নিবেশিত হয়েছে। এসব দুর্লভ ঘটনা ও জ্ঞানরাশি অন্যান্য কিতাবে দুষ্প্রাপ্য। আমীর শাকিব আরসালানও এই সুন্দর জীবনী গ্রন্থটির উল্লেখ করে এর ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন।

সাইয়্যেদ রশীদ রিযা

আল্লামা সাইয়্যেদ রশীদ রিযা (ওফাত—১৯৩৫ ঈসায়ী) ত্রিপোলী-সিরিয়ার কালমুন নামীয় এক ক্ষুদ্র শহরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক জীবনে তিনি

সিরিয়ার শিক্ষায়তনে 'রিসালাতুন হামিদীয়ার' লেখক শায়খ হুসাইন আল জিসর নামক প্রগতিবাদী অথচ মুহাক্কিক আলিমের কাছে অনন্য মনে শিক্ষা লাভ করেন। এখান থেকেই তিনি মুক্তবুদ্ধি ও প্রগতিমূলক চিন্তাধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হন। পরবর্তীকালে তাঁর এই চিন্তাধারা শায়খ আবদুহুর তত্ত্বাবধানে আরও দৃঢ়তর হয়ে উঠে। বস্তুত রশীদ রিযার মেধাশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। তাই অতি অল্প আয়াশেই তিনি যে কোন ভাষা ও বিষয়কে আয়ত্তে আনতে পারতেন।

একদিন তিনি সাইয়েদ জামাল আফগানী ও শায়খ আবদুহুর যুগ্ম সম্পাদিত 'আল্ উরওয়াতুল উস্কা' নামক পত্রিকাটি অধ্যয়ন করে অত্যন্ত মাতোয়ারা হয়ে উঠলেন। তাই স্বীয় ওসতাদ শায়খ হুসাইনের মাধ্যমে এক এক করে প্রায় সমস্ত পত্রিকাগুলো আনিয়ে নিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে আদ্যোপান্ত পাঠ করলেন। এতে করে তাঁর চিন্তারাজ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন ও আলোড়নের সৃষ্টি হয়। তাই সাইয়েদ জামাল আফগানীর সঙ্গে মুলাকাত করার জন্য তিনি পাগলপ্রায় হয়ে উঠেন। কিন্তু ভাগ্য ছিল অপ্রসন্ন। তাই এই মুলাকাতের অন্তরায় হিসেবে নানা প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। যার ফলে এই সাক্ষাৎ লাভ একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে রশীদ রিযা তখন জামাল আফগানীর অন্যতম স্থলাভিষিক্ত মনীষী মুহাম্মদ আবদুহুর (ওফাত—১৩২৩ হিজরী) উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে ১৮৯৭ ঈসায়ীতে মিসরের মাটিতে পা দেন।[১]

শায়খ আবদুহুর পদপ্রান্তে হাযির হওয়ার পর থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ছায়ার ন্যায় ওসতাদের অনুসরণ করেন।

এই মুহতারাম ওসতাদের পরিকল্পনাধীনে ১৮৯৮ সালে তিনি 'মাজাল্লাহ্-আল্-মানার, নামে একটি মযহাবী পত্রিকা বের করেন। বস্তুত এই পত্রিকা অতি অল্প দিনের মধ্যেই গোটা মুসলিম জাহানে এক অপূর্ব চাঞ্চল্যকর পরিবেশের সৃষ্টি করে। এর উদাত্ত বাণী অতি শীঘ্রই মুসলিম জাহানের প্রতিটি

১. See for details: Arabic thought in the libaral age by Albert Hawrani PP. 224-28.

ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে এবং শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটন পূর্বক গোঁড়ামী ও অন্ধ তাকলীদের আবর্জনা আলায়েশকে বিদূরিত করে মুসলিম সমাজকে যুক্তিবাদী ও মুক্তবুদ্ধির অনুসারী হতে অনুপ্রাণিত করে।

১৯১২ সালে তিনি কায়রোতে 'জামঈয়াত ওয়াল দাওয়াৎ ওয়াল ইরশাদ' নামক একটা তাবলিগী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই কলেজ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে বিভিন্ন দেশীয় ছাত্রবৃন্দ পাশ্চাত্য দুনিয়ার আনাচে কানাচে মিশনারীদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট কাজ করেছে।

সাইয়েদ রশীদ রিযা ছিলেন একাধারে দার্শনিক, চিন্তানায়ক, সুবক্তা ও সাংবাদিক। কিন্তু সবের উপর তিনি ছিলেন একজন জবরদস্ত আলিম এবং প্রথম শ্রেণীর হাদীসবেত্তা। তাঁর সম্পাদিত মাজাল্লাতুল মানার'কে ইসলামী 'দায়েরাতুল মা'রিফ' বা বিশ্বকোষ (Encyclopaedia) বললে আদৌ অত্যুক্তি হয় না। এ ছাড়া তিনি তাঁর জীবদ্দশায় বহু অমূল্য ও অতুলনীয় গ্রন্থরাজি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আমরা এখানে কয়েকটার নামোল্লেখ করছি মাত্র।

১. নিদাউল ইলাল জিনসিল লাতীফ।
২. আল খিলাফত আউ উম্মাতুল কুবরা।
৩. মাওলিদুন-নববী বা সত্যিকারের মিলাদ শরীফ।
৪. খুলাসাতু সীরাতিন নবভীয়া।
৫. আল মুসলিহ্ ওয়াল-মুকাল্লিদ (সংস্কারক এবং অন্ধ অনুসারী)।
৬. ওয়াহাবিউন-ওয়াল-হিজায।
৭. ইউসরুল ইসলাম ওয়া উসুলুত তাশরীহিল আ'াম।
৮. আল-মানার আল-আযহার
৯. তরজামাতুল কুরআন-ওয়ামা ফীহা মিনাল মাকানিহ।
১০. আল-ওহীউল মুহাম্মাদী।

এই শেষোক্ত কবিতাটি ই'জায শাস্ত্রের সংগে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত। সুতরাং এটিই যে আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় বা মূল বক্তব্য তা এর

নামকরণ থেকে অতি সহজেই অনুমান করা যায়। 'ওহীউল মুহাম্মদী অর্থাৎ মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপর সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে যে ওহী বা ঐশী বাণী নাযিল হয়েছে তাহাই পবিত্র কুরআন। এই কুরআন পাকের প্রতিটি সূরা, রুকু, আয়াত, এমন কি প্রতিটি বাক্য ও শব্দও হচ্ছে এর অমর মু'জিযা। পবিত্র কুরআনের ই'জায বা অলৌকিকতাকে দেখানো ও প্রতিপন্ন করা হয়েছে গোটা কিতাবখানির মধ্যে।

সাইয়েদ রশীদ রিযা তাঁর অমর গ্রন্থ ওহীউল মুহাম্মদীতে বলেনঃ কুরআন করীমের বুনিয়াদ—ভিত্তি রয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইলমের উপর। ইহা মানবীয় প্রকৃতির জন্য সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক ও মুতাবিক। এর মাধ্যমে মানবের শক-সন্দেহ বিদূরিত হয়ে অন্তর্লোক পূত-পবিত্র হয় আর বিদগ্ধ সমাজের যথার্থ কল্যাণ ও মঙ্গল সাধিত হয়। আজ বিশ্ব জাহানের কোথাও যদি কল্যাণ ও মঙ্গলের এতটুকু অনুকণারও অস্তিত্ব থেকে থাকে, তবে তা নিছক কুরআন শিক্ষার উজ্জ্বল দীপ্তিতেই বিদ্যমান রয়েছে।

আকাশের গায়ে অনন্ত তারকাপুঞ্জের ন্যায় এই বিশ্ব চরাচরে পুস্তক পুস্তিকা ও গ্রন্থমালার কোন ইয়ত্তা নেই, থাকবেও না। যুগে যুগে আল্লাহর প্রেরিত পয়গাম্বরদের উপরও অগণিত আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর উপর বিশ্ব জাহানব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী যে গ্রন্থ নাযিল হয়েছে তা' হচ্ছে 'আল কিতাব' (The book) যা লক্ষ লক্ষ মুসলিম সন্তানের অন্তরে চির সত্যরূপে আসন পেতে রয়েছে। যার কোন একটি শব্দে এমন কি বিন্দুতেও এ পর্যন্ত কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বা পরিমার্জন হয়নি, ভবিষ্যতেও হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

পবিত্র কুরআন তাই একটা প্রত্যক্ষ মু'জিযা। ইহা স্বয়ং ঐশী বাণী হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কারণ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ছিলেন উম্মী নবী। একজন উম্মী বা নিরক্ষর নবীর (সঃ) কাছ থেকে এমন লালিত্যপূর্ণ মনোহর ভাষা, গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ভাব, নীতি ও আদর্শের শিক্ষাপ্রদ উপমা ও আখ্যান,

সর্বসাধারণের বোধগম্য অতি স্বাভাবিক ও সর্বাঙ্গসুন্দর ওয়ায-নসীহত এবং স্বচ্ছ ও প্রদীপ্ত উপদেশাবলী সম্বলিত কুরআনের এহেন বাণী রচনা করা কোনদিন সম্ভবপর হতে পারে কি? না, তা কস্মিনকালেও হতে পারে না। এভাবেই কুরআন মজীদ এমন একটা ইলমী মু'জিযা বা অলৌকিক বস্তু, যা বুদ্ধিবৃত্তি, ইন্দ্রিয় এবং অন্তর দ্বারা মানুষ উপলব্ধি করতে পারে অতি সহজে।

كفاك بالعلم في الأمي معجزة

في الجاهلية والتأديب في اليتم

প্রাক-ইসলামের সেই অজ্ঞানান্ধকার যুগেও এত অগাধ জ্ঞান-গরিমার মালিক হওয়া আর অনাথ, য়াতিম ও অসহায় অবস্থায় এত সুমধুর নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হওয়া রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর জন্য একটা বৃহত্তর মু'জিযার নিদর্শনই বটে।[১]

—আল্লামা রশীদ রিযা বলেন: জ্ঞান-বিজ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার এই পবিত্র কুরআনের অমর মু'জিযা স্বয়ং কুরআন থেকেই প্রতিপন্ন এবং তা রোজ কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে। ইসলামের ইতিহাস যারা অধ্যয়ন করেছে তাদের একথা উপলব্ধি করতে আদৌ অসুবিধা হয় না যে, পবিত্র কুরআনের উপর 'খবরে মুতাওয়াতির' এর সংজ্ঞা আরোপ করা সবদিক দিয়েই ন্যায়সংগত।[২]

পবিত্র কুরআনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর অপূর্ব সাহিত্যরীতির অলৌকিক প্রভাব। সত্যিই এর অলৌকিক শক্তি মানুষের মনে এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে যে, একটি মাত্র আয়াতের মাধ্যমেই মানব জীবনের গতিপথ সম্পূর্ণরূপে এক স্বতন্ত্র খাতে প্রবাহিত হতে দেখা যায়।

১. সাইয়েদ রশীদ রিযা কৃত এবং অধ্যাপক রশীদ আরশাদ কর্তৃক অনূদিত আল-ওহীউল মুহাম্মদী: পৃষ্ঠা ১১০।

২. আল-ওহীউল মুহাম্মদী (রশীদ আহমদ আরশাদের উর্দু অনুবাদ) পৃষ্ঠা ৩০৪।

কুরআন পাকের এই সম্মোহনী বাণী ও আকর্ষণী শক্তির কথা শুধু যে আরবের কবি-সাহিত্যিক ও মুফাস্‌সির মুহাদ্দিসরাই মেনে নিয়েছেন তা নয়, বরং সকল জাতি ও সকল ধর্মের শত্রু-মিত্র, জ্ঞানী-মূর্খ বৈজ্ঞানিক-দার্শনিকরাও একবাক্যে এবং অবনত মস্তকে একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

তাছাড়া কুরআন পাকের এই অলংকারপূর্ণ ভাষণ ও বাগ্মিতা যুগ যুগ ধরে শুধু যে মানুষের মনকেই সম্মোহিত করেছে তা নয়, বরং জিন এবং পশুপক্ষীদেরকেও এই সনাতন বাণী মন্ত্রমুগ্ধবৎ শ্রবণ করতে দেখা গেছে। একবার মদীনার বাইরে এক নিভৃত কোণে নিঝুম রজনীর নিস্তব্ধ প্রহরে নামাযরত অবস্থায় হুযুরে আকরাম (সঃ)-এর মুখনিঃসৃত 'সূরাতুল জিনে'র আয়াতসমূহ শ্রবণ করে জিনদের এক বিরাট দল এতদূর মোহিত হয়েছিল যে সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে তারা এতটুকুও কুণ্ঠাবোধ করেনি। ১

সাইয়েদ রশীদ রিযা বলেন: কুরআন করীম নাযিল হওয়ার পর আরবদের মনে-প্রাণে এত বড় একটা ইনকিলাব আনয়ন করতে সক্ষম হয়েছিল যার তুলনা বিশ্ব জাহানের ইতিহাস খুঁজে সত্যিই কোথাও মেলে না। এই বিরাট ইনকিলাব তাদের সামাজিক জীবনেও একটা বড় রকমের আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। যার ফলে এই আত্মম্ভরী, আত্মশ্লাঘী ও অহমিকাপূর্ণ কুরায়শ নেতৃবর্গকেও কুরআনের মনোমুগ্ধকর সম্মোহনী বাণীর প্রতি মাথা নোয়াতে এবং পরিণামে নিজেদের হার মানতে বাধ্য করেছিল। করবে না-ই বা কেন? এর ভাব, ছন্দ ও সংস্কার প্রতি যুগে যুগেই মানুষকে করেছে আকৃষ্ট।

যারা মুসলিম তাঁরা তো স্বভাবতই এর তিলাওয়াত শুনে বিস্ময় বিমুগ্ধ ও উদ্বেলিত প্রাণ হয়ে পড়েন। আর যারা ইসলামের চিরশত্রু-

---

১. দেখুন: ২৯ পারায় সূরাতুল জিনের প্রাথমিক আয়াতসমূহের তাফসীর।

অমুসলিম তারা যেন তৎপ্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়ে আরও বেশী করে শোনার জন্য সদা ব্যাগ্র ও ব্যাকুল চঞ্চল হয়ে উঠে। শুনতে এত ভালো লাগে যে, একবার শোনার পর আরও বেশী শোনার একটা উদগ্র বাসনা উত্তরোত্তর যেন বৃদ্ধি পেতেই থাকে। কিন্তু বাইরে একথা প্রকাশ পেলেই তো সর্বনাশ। তাই তা হযরতের (সঃ) নামাযরত অবস্থায় তাঁর মুখনিঃসৃত পবিত্র কুরআনের অমিয় বাণী যখন অপূর্ব নিনাদে ঝংকৃত হত, তখন তারা অপরের অজ্ঞাতসারে আড়ালে দাঁড়িয়ে কান পাততো সেই ভেসে আসা দূরাগত অপূর্ব সুরলহরীর পানে। আবার কাউকে সে পথে আসতে দেখলে তার চক্ষু এড়িয়ে ত্রস্ত পদে সেখান থেকে সরে পড়তো।

নবুওতের প্রায় প্রাথমিক যুগের কথা। আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান, আখনাস—নেতৃত্রয় নিজ নিজ ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে অতি সংগোপনে বেরিয়ে পড়লো। সবারই উদ্দেশ্য এই যে, রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে হুযুর আকরাম (সঃ)-এর মুখনিঃসৃত কুরআন তিলাওয়াত শুনবে। আঁ হযরত (সঃ) তখন উচ্চস্বরে অনন্য মনে নামায পড়ছিলেন নিজ গৃহে। তাই তারা আর কালবিলম্ব না করে সেই তিলাওয়াতের প্রতি কান উঁচিয়ে নবীগৃহের পশ্চাদভাগে বসে পড়লো। অথচ অপরের খবর কেউ ঘুণাক্ষরেও জানে না।

এদিকে সেই স্বর্গীয় সুমহান বাণীর অপূর্ব মাধুর্য ও সুর-ধ্বনিতে বিস্ময়াভিভূত হয়ে তারা তন্ময় চিত্তে শুনে চললো। ঘন্টার পর ঘন্টা নীরবে কেটে যায়, তবুও তাদের কোন হুঁশ ফেরে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে তখন তারা একেবারেই অচেতন, উদাসীন এবং সম্বিতহারা।

এভাবে রজনী প্রভাত হয়ে আসার উপক্রম হয়। পাখীদের কলকাকলীতে কুঞ্জবন মুখরিত হয়ে ওঠে। তখন তাদের হারানো সম্বিত ফিরে আসে। তাই ত্রস্তপদে তারা গৃহাভিমুখে ছুটতে শুরু করে। কি আশ্চর্য! পথিমধ্যেই অপ্রত্যাশিতভাবে একে অন্যের সাথে মুলাকাত ঘটে যায়। তখন পরস্পর পরস্পরকে এভাবে ডুবে ডুবে জল খাওয়ার জন্য অসংখ্য ধিক্কার, তিরস্কার ও অজস্র গালিবর্ষণ করতে আদৌ কসুর করে না। কিন্তু

সবাই যে তারা একই অপরাধে অপরাধী। তাই আর অযথা বাড়াবাড়ি না করে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হয়ে তারা আপোস করতে প্রয়াস পায়। কারণ সাধারণের কাছে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে মুখ দেখানোই ভার হবে। দ্বিতীয় রাতে নিজ নিজ স্থানে আবার তিনজন এসে হাযির। সবাই ভেবেছে যে, এত কঠিন হলফ গ্রহণের পর হয়তো কেউ আর আসতে সাহস করবে না। কিন্তু রাত্রি শেষে আগের ন্যায় সেই একই কাণ্ড। তাই আজ সবাই মিলে আবার সুদৃঢ়ভাবে কসম খায় যে, আর কোন দিন এ পথ মাড়াবে না। কিন্তু যে স্বাদ একবার রসনায় লেগে যায় তা ভুলে যাওয়া অতটা সহজ নয়।

কাজেই তৃতীয় দিনেও আবার সেই একই লজ্জাষ্কর ঘটনার পুনরাবৃত্তি। পরিশেষে এর ভয়াবহ পরিণামের আশংকায় সন্ত্রস্ত এবং অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আর চতুর্থবার না আসার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তারা হতচকিত চিত্তে আপন গৃহে ফিরে গেলো।

বেলা উঠলে আখনাস বিন শরীফ প্রাতভ্রমণ ছলে লাঠি হাতে আবু সুফিয়ানের বাড়ী গিয়ে হাযির। কথায় কথায় পবিত্র কুরআনের প্রসঙ্গ উঠলে সে জিজ্ঞেস করলো: ভাই আবু হানযালা! সত্যি করে বলতো, কুরআন সম্পর্কে তোমার কি অভিমত? তদুত্তরে আবু সুফিয়ান বলে: ভাই আবু সা'লাবা! আল্লাহ্‌র কসম! এমন বহু বিষয় শুনেছি, তার অর্থও বুঝেছি এবং জানি যে তা ধ্রুব সত্য। আখনাস সোৎসাহে বলে উঠলো: ঠিক বলেছ ভাই! আমারও তাই মত। তখন উভয়ে মিলে আবু জেহেলের মত নেওয়ার জন্য তার বাড়ী গিয়ে জিজ্ঞেস করলো: মুহাম্মদের মুখে যে বাণী শুনলো, তা কেমন মনে কর? সেই পাপিষ্ঠ নরাধম তখন উত্তরে বললো: 'আমি ওসব কিছু বুঝি টুঝি না। তবে আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, বনী আবদে মনাফের সাথে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে আসছে যুগ-যুগান্তর ধরে। বকশিশ, আতিথেয়তা, উষ্ট্র সওয়ার ইত্যাদিতে আমরা উভয়েই ছিলাম সমান সমকক্ষ ঠিক যেন দু'টো রেস কোর্সের ঘোড়ার মতই। মানে সম্মানে, প্রভাবে, প্রতিপত্তিতে, মর্যাদায় আমরা চিরদিনই সমান তালে পা ফেলে এসেছি। কিন্তু

এখন তারা বলে, তাদের খান্দানে নাকি এক নবীরও উদ্ভব হয়েছে। শুধু তাই নয়, তার কাছে আসমান থেকে নাকি আবার ওহীও আসে। কিন্তু আমাদের পক্ষে এটা সম্ভব হবে কি করে? এদিক দিয়েই তো তারা আমাদের বাজীমাত করে দেবে। এ আমরা কোন্ প্রাণে সহ্য করবো। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তার কথা শুনবো না। আর তার উপর ঈমানও আনবো না। কস্মিনকালেও না।[১]

সাইয়েদ রশীদ রিযা তাঁর উক্ত গ্রন্থে বলেন: হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) প্রমুখাত বর্ণিত যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) কুরায়শদের দৈনন্দিন নির্মম অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে একদিন আঁ হযরতের নিকট হিজরতের অনুমতি নিলেন। অতঃপর ইয়ামানাভিমুখে সুদীর্ঘ পাঁচ দিনের পথ চলার পর 'বারকুল গামাদ' নামক স্থানে উপনীত হলেন। হঠাং করে সেখানে কার্‌রা গোত্রের নেতা ইবনু দাগনার সাথে তাঁর মুলাকাত ঘটে। তিনি ছিলেন একজন সুফী স্বচ্ছন ব্যক্তি। তাই আবু বকরকে (রাঃ) একাকী এই সুদূর দুর্গম প্রবাস পথে চলতে দেখে মনে মনে প্রমাদ গণলেন। তাই বিস্ময়ভরে তাঁর গন্তব্যস্থল সম্পর্কে জানতে চাইলেন তিনি। আবু বকর (রাঃ) সন্তপ্তচিত্তে বললেন: ইসলামের পুণ্যালোকে আশ্রয় নিয়েছি বলেই স্বদেশবাসী আজ খড়গহস্ত। তাই যেখানে গিয়ে শান্তি ও স্বস্তির সংগে আল্লাহ্‌কে ডাকতে পারবো সেখানেই বেরিয়েছি। এতদশ্রবণে ইবনু দাগনার অন্তর্নিহিত সহানুভূতি যেন বাঁধভাংগা স্রোতের ন্যায় উপচে

১. শায়খ রশীদ রিযা কৃত 'আল-ওহীউল মুহাম্মদী' করাচী ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক রশীদ আহমদ কর্তৃক অনূদিত; পৃষ্ঠা ২০৮। ইমাম বায়হাকী 'দালাইলুন নুবুওতে' এই হাদীসটি রিওয়ায়েত করেছেন। আরও দেখুন সীরাতে ইবনু হিশাম; ১ম খণ্ড; পৃষ্ঠা ১৯৬ (মিসরের মাইমুনীয়া প্রেসে মুদ্রিত) এবং ইমাম সুহাইলী (ওফাত—৮৫১ হিঃ) কৃত রাওযুল ওনুফ: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০১ (জামালীয়া প্রেস, মিসর, ১৩৩২ হিঃ) খাসাইসে কুব্‌রা; ইমাম জালালউদ্দীন সুয়ূতী: ১ম খণ্ড; পৃষ্ঠা ১১৫।

পড়লো। তিনি গদ্‌ গদ্‌ কণ্ঠে সহৃদয়তা ব্যঞ্জক স্বরে বললেন: "আপনার মত সুহৃদ ও সমাজ-হিতৈষী সুধীকে ছাড়লে আমরা হবো সংগহারা; আর এই মক্কাভূমির সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য-শোভা হবে অনেক গুণে বিনষ্ট। তাই দয়া করে আমার সাথে ফিরে চলুন। প্রতিজ্ঞা করছি, শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকা পর্যন্ত কেউ আপনার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না।

মহামতি আবু বকর (রাঃ) অগত্যা তাঁর সহগামী হয়ে ফিরে এলেন; আর বাড়ীর সংলগ্ন মসজিদে নিশিদিন আল্লাহ্‌র ইবাদত ও কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল হয়ে গেলেন। এভাবে এই সুপ্ত সাধনার মাধ্যমে তিনি পুনরায় যেন জীবনের পূর্ণতা লাভ করার সুযোগ খুঁজে পেলেন। কিন্তু এর ফল ফললো উল্টো।

পবিত্র কুরআনের অসাধারণ সম্মোহনী শক্তি অতি শীঘ্রই তাঁর আশু প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করলো। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কুরআন পাঠে এক অপূর্ব আকর্ষণী শক্তি নিহিত ছিল। তাঁর অশ্রু গদ্‌ গদ্‌ কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণ ভংগীর মাঝে একটা বিশেষ রকমের মোহ ছিল। তাই তাঁর কণ্ঠ নির্গত কুরআন মজীদের সুধালহরী স্বর্গীয় ভাবধারা, অপূর্ব ছন্দ মাধুর্য ও সরসতাপূর্ণ আয়াতগুলো মহল্লার আবাল-বৃদ্ধ বণিতা সবারই প্রাণে এক অপার্থিব আলোড়নের সৃষ্টি করলো। এমন কি বিধর্মীদের কচি-কাঁচারাও মুগ্ধকুরঙ্গীর ন্যায় উন্মাদ হয়ে তাঁর দিকে ছুটে আসতে লাগলো; ঠিক যেমন পতংগের দল ছুটে আসে প্রদীপ শিখার দিকে।

দিনের পর দিন ধরে শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা অপ্রত্যাশিতভাবে বেড়েই চললো। কুরায়শ সরদারগণ এতে মনে মনে প্রমাদ গণলো এবং হযরত আবু বকরকে (রাঃ) তিলাওয়াতে কুরআন থেকে নিবৃত্ত করার জন্য ইবনু দাগনাকে জানালো। আবু বকর (রাঃ) ধীরস্থির কণ্ঠে ইবনু দাগনাকে জবাব দিলেন, "আল্লাহ্‌কে ছেড়ে আমি নিতান্ত ভুলবশতই তোমার আশ্রয়প্রার্থী হয়েছিলাম। তাই এতে শুধু যে আমার মনের আযাদীর

উপর নিরবচ্ছিন্ন জুলুম চালাতে হয়েছে তা নয়, বরং আল্লাহুর শক্তিকেও অনেকটা খর্ব করা হয়েছে। এক্ষণে তাই কারো আশ্রয়ে না থেকে আত্মকৃত অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।"

এই বলে হযরত আবু বকর (রাঃ) তথা হতে প্রস্থান করলেন। ইবনু দাগ্না কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় নীরবে তাঁর যাত্রাপথের দিকে অধোঃমুখে চেয়ে রইলেন। মুখ দিয়ে তাঁর একটা কথাও সরলো না।[১]

পবিত্র কুরআনের অমর মু'জিযা বর্ণনা করতে গিয়ে রশীদ রিযা স্বীয় গ্রন্থে তদানীন্তন আরবীয়দের মনে-প্রাণে কুরআনের অলৌকিক প্রভাব যে কতদূর বিস্তার লাভ করেছিল, তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

এ প্রসংগে তিনি সহীহ্ মুসলিম শরীফের হাওয়ালা দিয়ে বলেন: একদিন আঁ হযরত (সঃ) কাবাগৃহে উপবিষ্ট রয়েছেন। এমন সময় প্রবীণ নেতা উৎবা বিন রাবীয়াহ কুরায়শ কওমের প্রতিনিধি রূপে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে বললো: মুহাম্মদ, তুমি কি দেশের নেতৃত্ব চাও? রাজমুকুট চাও? ধন-সম্পদ চাও? পরমা সুন্দরী কন্যা চাও? যা চাও, তাই তোমার চরণতলে এনে দিতে রাযী আছি। কিন্তু দোহাই তোমার, দয়া করে এই ধর্মপ্রচার ও কুরআন তিলাওয়াত থেকে নিবৃত্ত হও।

আঁ হযরত (সঃ) এর জবাবে কোন কিছু না বলে সূরা হা-মীম-সিজদার কয়েকটি আয়াত শুধুমাত্র পাঠ করে শোনালেন:

فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود

১. রশীদ রিযা কৃত এবং হাফিজ রশীদ আহমদ কর্তৃক অনূদিত 'আল-ওহীউল মুহাম্মদী'; পৃষ্ঠা ২০৯; মুহাম্মদ হুসাইন হাইকাল কৃত এবং শায়খ মুহাম্মদ পানিপথী কর্তৃক অনূদিত 'সীরাতে আবী বকর, (রাঃ); পৃষ্ঠা ৬০; ইমাম সুহালী কর্তৃক রওযুল ওনূফ; ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৯; মওলানা শিবলী নোমানী কৃত সিরাতুন্নবী; ১ম খণ্ড।

"যদি তারা কিছুতেই মানতে না চায় তাহলে বলো যে, আমি তোমাদের কওমে আ'দ ও সামুদ জাতির বজ্রসম আযাব থেকে ভয় প্রদর্শন করছি"। (সূরা ফুস্‌সিলাত বা হা-মীম সিজদা ঃ আয়াত ১৩) পবিত্র মুখনিঃসৃত সেই জ্বলন্ত বাণী শুনে উৎবা মন্ত্রমুগ্ধবৎ নীরব হয়ে রইলো। মুখ দিয়ে কোন কথা সরলো না তার। মনের গোপনপুর থেকে সে যেন সমস্ত শক্তি ও সাহস হারিয়ে ফেললো। তাই আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে হুযুর (সঃ)-কে তিলাওয়াত থেকে নিবৃত্ত করলো এবং কুরায়শদের কাছে ফিরে এসে বললো ঃ মুহাম্মদের মুখে আজ যে আল্লাহ্‌র বাণী শুনলাম, তা' জীবনে কোনদিন শুনিনি; আল্লাহ্‌র শপথ, এ কোন কবিতা নয়, যাদুও নয় অথবা ইহা কোন দৈবজ্ঞের বাণীও হতে পারে না। মুহাম্মদ যে কালাম শুনিয়েছে তাতে আল্লাহ্‌র আযাবেরও ধমকী ছিল; আমার ভয় হয় তোমাদের পরে সেই আসন্ন আযাব না এসে পড়ে।[১]

এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা থেকে একথাই অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, এই পবিত্র কুরআন কোন মানুষের রচিত নয়। ইহা একমাত্র বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্‌রই কালাম। এতে কারুর মনে বিন্দু বিসর্গও সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে না।

পবিত্র কুরআনের অপূর্ব বাগ্মিতা, আলংকারিক শিল্পকলা ও অলৌকিক প্রভাবে মুগ্ধ হয়ে বিধর্মীদের স্ত্রী-পুরুষরা মুগ্ধ কুরঙ্গীর ন্যায় উন্মাদ হয়ে ছুটে আসতো দূরে থেকে কুরআন পড়া সুর লহরীর পানে। এমনকি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জানী দুশমনেরাও এতে বিস্ময় বিমুগ্ধ হয়ে তাঁকে যাদুকর ও জিনে ধরা লোক ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করতো। স্ত্রী-পরিজন ও ছেলেমেয়েদের তারা সাধারণত আঁ হযরত (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ)-এর কাছে যেতে দিতো না। পাছে তারা কুরআনের বাণী শুনে কুলের বাহির হয়ে ইসলামের শান্ত শীতল

১. দেখুন সাইয়েদ রশীদ রিযার 'আল-ওহীউল মুহাম্মদী'; পৃষ্ঠা ২১১, ইবনু-আব্দিল-বার কৃত আল ইসতিয়াব; ১ম খণ্ড; পৃষ্ঠা ১৬৫; সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড; পৃষ্ঠা ৯০, মওলানা মুসলিম উসমানী সাহেব কৃত 'বুরহানুত তানযীল' পৃষ্ঠা ২৯৬।

ক্রোড়ে আশ্রয় নেয়—এই ভয়েই তারা সব সময় অস্থির চঞ্চল। এই তেজোময় মহাবাণী কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করার ভয়ে তৎকালীন মুশরিকরা কানে তুলা দিয়ে ফিরতো। আর তৎপার্শ্বে, সুরা-নারী ঢাক-ঢোল করতালি, নাচ-গান ও বাদ্য-বাজনার প্রচলন করতো।

পবিত্র কুরআনের মনোহর বাক্যচ্ছটায় বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে, তার হৃদয়গ্রাহী উপদেশমালায় আকৃষ্ট হয়ে তৎকালীন ইসলাম বিদ্বেষী আরবরা পরস্পরে বলাবলি করতো : এর মোহিনী শক্তি মানবকে তার ধর্ম ও আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন করে।

অতএব এর মনোমুগ্ধকর বাণী যখন তোমাদের সামনে পঠিত হয়, তখন তৎপ্রতি আদৌ কর্ণপাত না করে তোমরা পরস্পরে কলরব করতে থাকো। তাহলেই তোমরা জয়যুক্ত হতে পারবে।[১]

আল্লামা রশীদ রিযা পবিত্র কুরআনের ই'জায-এর বিপ্লবী দাওয়াত ও প্রতি-ক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তাঁর এই গ্রন্থে। এই আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি নবুওতে মুহাম্মদী এবং ওহীয়ে মুহাম্মদীর নূরানী মিসাল সম্পর্কেও সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। মু'জিযা ও কারামতের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা টেনে তিনি বলেন যে, ঈসায়ী কওম এই মু'জিযাকে অলৌকিকতা নামে অভিহিত করে থাকে। অথচ মুসলমানরা একে 'খাওয়ারিকে আদাত' নামে আখ্যায়িত করেন। অতঃপর তিনি মু'জিযার প্রকার ভেদ করতে গিয়ে বলেন যে, আল্লাহ্‌র কোন কোন নিশান তাঁর আলমগীর নির্ধারিত কানুন ও চিরন্তন নীতির মুতাবিক। আল্লাহ্ পাকের এই কুদরতের নিশান বা চিহ্নগুলোর সংখ্যা অধিক পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়। কারণ এগুলো তাঁর অনন্ত হিকমত, মহিমা ও রহমতের প্রতীক। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ পাকের যে সমস্ত নিশান বা মু'জিযা সংখ্যায় নির্ধারিত এবং শৃঙ্খলিত, সেগুলো স্বাভাবিক নিয়মের বহির্ভূত। তাই এ ধরনের মু'জিযা সংখ্যায় নিতান্ত কম।

---

১. দেখুন তাফসীর সূরা হা-মীম-আল্ সিজদা : আয়াত ২৬; আল-ওহীউল মুহাম্মদী, ৪র্থ ফসল : পৃষ্ঠা ২১০।

কিন্তু অধিকাংশ লোক এগুলো দেখেই বিশ্বাস করে থাকে। কারণ তারা মনে করে যে, বর্তমান ও ভবিষ্যতে সৃষ্টির পূর্ণ ক্ষমতা ও স্বাধীনতা একমাত্র আল্লাহ্‌রই হাতে। আর তাঁর কুদরত ও ইচ্ছা কোন কানুন বা শৃঙ্খলার বেড়াজালে আবদ্ধ নয়।[১]

আল্লামা রশীদ রিযা তাঁর এই অমর গ্রন্থের মাধ্যমে ঐ সমস্ত লোকদের কার্যকলাপকে অত্যন্ত নিন্দনীয় ও ঘৃণিত বলে প্রতিপন্ন করেছেন, যাঁরা মযহাবী ব্যাপারে প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য ইজতিহাদ, চিন্তা-গবেষণা ও অনুসন্ধান ছাড়া ধর্মীয় ব্যাপারে কোন বিশিষ্ট ইমামের তাকলীদ বা অন্ধ অনুসরণকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, এই অন্ধ তাকলীদ ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতারই একটা অবশ্যম্ভাবী ফল কেননা বিদ'আত ও ইলহাদের এই কুপ্রথা অর্জনের কোন নতুন বস্তু নয়। স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এবং বড় বড় ইমামদের সোনালী যুগেও এর বুনিয়াদ পত্তন ঘটেছিল।[২]

তখনকার দিনে এক বিশিষ্ট ফিতনাই দ্বীন ও মযহাবকে সবচাইতে বেশী বিকৃত করেছিল, যে ফিতনার দ্বারা চক্ষু বন্ধ করে মাসুম ইমামদের অন্ধ অনুকরণের জন্য দাওয়াত পেশ করা হয়েছিল। এই ইমামদের অন্ধ অনুসরণের জন্য যাঁরা দাওয়াত পেশ করেছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে কোন দিনই কোন দলীল-প্রমাণ চাওয়া হয়নি। অথচ আহলে সুন্নাতের সব ইমামই এ কথা স্বীকার করেছেন যে, বারহাক নবীয়ে মাসুমের (সঃ) মযহাব সম্পর্কে অন্য কারোর অন্ধ অনুসরণ করা হারাম। কারণ আঁ হযরতের (সঃ) পর কোন ব্যক্তিই মাসুম বা নিষ্কলুষ হতে পারে না। ওলী দরবেশ কিংবা ইমামও না। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে সমস্ত ইমাম তকলীদকে

---

১. সাইয়েদ রশীদ আহমদ আরশাদ এম. এ. অনূদিত 'আল-ওহীউল মুহাম্মদী'; পৃষ্ঠা ২৭৩।

২. বিস্তারিতের জন্য দেখুন আল-ওহীউল মুহাম্মদী, ৫ম ফসল : পৃষ্ঠা ১৪২।

হারাম জেনেছেন, তাঁদের অনুসারীরা আবার সেই তকলীদকে ইমামদের নাম দিয়ে মিথ্যা লেবেল পরিয়ে বাজারে চালু করেছেন।

নিঃসন্দেহেই এটা অপ্রিয় ধ্রুব সত্য যে, শিরক ও বিদ'আতের কুপ্রথা তকলীদের বাজারেই প্রচলিত হওয়া সম্ভব। ইজতিহাদ তথা মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তাধারার বাজারে এর আদৌ কদর নেই।

আল্লামা রশীদ রিযার গ্রন্থাবলীর ফিরিস্তি আমরা ইতিপূর্বেই পাঠকের সামনে তুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছি। সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর সব গ্রন্থই মনে হয় যেন এক-একটি অনবদ্য অবদান। তন্মধ্যে আমাদের আলোচ্য বস্তু সম্পর্কে 'ওহীউল মুহাম্মদী' নামক গ্রন্থটিরও মনে হয় যেন তুলনা হয় না। গ্রন্থকার এই দুর্লভ কিতাবটির মাধ্যমে কুরআনুল করীমকে অটল দলীল দস্তাবিজ দ্বারা আল্লাহ্‌র কালাম বলে প্রতিপন্ন করার সার্থক প্রয়াস পেয়েছেন। এটি প্রকাশ পাওয়ার অব্যবহিত পর মুসলিম জগতের যে সমস্ত নেতৃবর্গ এর ভূয়সী প্রশংসা করে মুখবন্ধ লিখেছেন, তন্মধ্যে মরহুম সুলতান আবদুল আযীয ইবনু সউদ এবং ফিরকায়ে যায়দীয়ার ইমাম ও ইয়ামেনের প্রাক্তন বাদশাহ ইয়াইয়া হামিদুদ্দীনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশ পায় ১৩৫২ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে। প্রকাশের অল্প দিন পরেই কলকাতার 'হীন্দে জাদীদ' নামক সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা জনাব আবদুর রাযযাক মালীহাবাদী কর্তৃক উর্দুতে ভাষান্তরিত হয়। 'আল-ওহীউল মুহাম্মদী'র দ্বিতীয় সংস্করণ আরাফার দিনে ছাপা হয় ঈষৎ পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পর। ইহা নিঃশেষ হলে পর ১৩৫৪ হিজরীতে আরও বহু পরিবর্ধনে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ পায়। এর পঞ্চম সংস্করণ গ্রন্থকারের উত্তরাধিকারিগণ কর্তৃক প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ ঈসায়ীতে আল-মানার প্রেস থেকে। করাচী ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক সাইয়েদ রশীদ আহমদ আরশাদ এম. এ এই পঞ্চম সংস্করণকে দ্বিতীয়বার উর্দুতে ভাষান্তরিত করেন। এই তরজমা সর্বাঙ্গ সুন্দর এবং সার্থক।[১]

১. আল-ওহীউল মুহাম্মদী : ৫ম ফসল; পৃষ্ঠা ৩৫৩।

'ওহীউল মুহাম্মদী'র শুধু যে উর্দু ভাষাতেই তরজমা হয়েছে তা নয়, চীনা ভাষাতেও দু'বার এর অনুবাদ হয়। 'আল-হিলাল' এবং যিয়া' নামক পত্রিকাদ্বয়ের যোগ্য সম্পাদক সর্বপ্রথম এর চীনা ভাষায় অনুবাদ করে 'কুন্দু-দান' শহর থেকে প্রকাশ করেন। দ্বিতীয়বার তরজমা করেছেন জনাব বদরুদ্দীন সাহেব। তিনি চীনের বাসিন্দা হলেও লক্ষ্ণৌ নদওয়াতুল উলামার শিক্ষক ছিলেন। আরবী পত্র-পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধরাজি অতি প্রসিদ্ধ।

'আল-ওহীউল মুহাম্মদী'র ব্যাপক জনপ্রিয়তার কথা এ থেকে অনুমান করা যায় যে, মিসর, দামেশক এবং বাইরুতের শিক্ষায়তনগুলোতে বহুদিন থেকেই ইহা ধর্মীয় পাঠ্যপুস্তক হিসেবে অনুমোদিত হয়ে আসছে। শায়খ মুস্তফা আল-মারাগী মিসরের জামে আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ পদে বরিত হওয়ার পর অত্র পুস্তক প্রচারার্থে ব্রতী হন। তিনি প্রথমে যেদিন এই বইটি হাতে পেয়ে ছিলেন, সেদিন এক স্থানে বসেই এর প্রথমার্ধ খতম করেছিলেন। এর দ্বিতীয়ার্ধও তিনি অনুরূপভাবে খতম করেছিলেন একই স্থানে বসে এক-টানা গতিতে। খতম করার পর তিনি এর ভূয়সী প্রশংসা করে একটা সুন্দর মুখবন্ধ করেছিলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এই কিতাব প্রতি বছর নতুন সংস্করণ আর নতুন বেশ নিয়ে বের হবে।

'আল-ওহীউল মুহাম্মদী' প্রকাশ পাওয়ার অব্যবহিত পর এর বহুল প্রচার কল্পে মাননীয় ইব্রাহীম পাশা মিসরী নগদ ৩০ পাউন্ড দান করেছিল, যদ্দ্বারা গ্রন্থকার এর অনেকগুলো কপি পাশ্চাত্যের বিভিন্ন স্থানে বিনামূল্যে বণ্টন করেন। অনুরূপভাবে মিসরে অবস্থিত আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূত জনাব মুহাম্মদ সাদিক মুজাদ্দিদী একশো কপি খরিদ করে মু'তামারে ইসলামের বিভিন্ন শাখায় বিনামূল্যে বিতরণ করেন। মওলানা আবদুস সামাদ সাহেব 'আল্-ওহীউল মুহাম্মদী'র বেশ সুন্দর ইংরেজী তরজমা করেছেন।

লণ্ডন থেকে প্রকাশিত মাসিক 'ইসলামিক রিভিউ' এর সম্পাদক ইংরেজীতে এর ভাষান্তরকরণের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। গ্রন্থকার এই মর্মে

তাঁকে অনুমতি দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে ফরাসী ও তুর্কী ভাষায় তরজমার জন্য উভয় রাষ্ট্রের শিক্ষামন্ত্রীর দফতরে ইহার নামাও পাঠানো হয়েছিল।

সাইয়েদ রশীদ রিযার এই অমর গ্রন্থের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, আধুনিক যুগের পটভূমিতে বৈজ্ঞানিক দলীল-প্রমাণ দ্বারা এত সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যেন পাঠকবর্গ তা অনায়াসে অনুধাবন করতে সক্ষম হন। কুরআন মজীদের মানব সংস্কারের রূপরেখা এবং অধ্যায়কেও বিস্তারিতভাবে দশটি পর্যায়ে বর্ণনা করে তাকে সত্য ঘটনার দ্বারা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের দ্বারা পৃথিবীতে যে একটা অভূতপূর্ব ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা হয়েছে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার বিকৃত ধ্বংসাত্মক রুচির মাধ্যমে কত অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে, তিনি সে সবেরও অকপটে বর্ণনা দিয়েছেন।

আল্লামা রশীদ রিযা তাঁর 'ওহীউল মুহাম্মদী' গ্রন্থে বলেন: পবিত্র কুরআনের বিপক্ষে অপপ্রচারণা চালাতে গিয়ে পাশ্চাত্য জগতের ঈসায়ী কওমের (Orientalists) অভিমত এই যে, আঁ হযরত (সঃ) নাকি সিরিয়ার বসরা নগরীতে সফর করতে গিয়ে নস্তুরী সম্প্রদায়ের বুহাইরা রাহেবের কাছ থেকে তাওহীদের প্রাথমিক সবক গ্রহণ করেছিলেন। বুহাইরা রাহেব হযরত ঈসার (সঃ) খুদায়ী ও তাসলীসকে (Trinity) অস্বীকার করতেন। শুধু তাই নয়, এই মনীষীদের মতে বুহাইরা যেহেতু একজন উঁচুদরের যাদুকর, জ্যোতিষবিদ্যায় পারদর্শী এবং আরও বহু সদ্গুণে ছিলেন বিভূষিত। অতএব তিনি ছিলেন নবুওত পূর্ব যুগে রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) ওস্তাদ এবং নবুওতের পরবর্তী যুগে ছিলেন আঁ হযরতের (সঃ) বন্ধু। ঈসায়ী কওমের বর্ণনা অনুসারে হুযুরে আকরাম (সঃ) শরাবকে একমাত্র এ উদ্দেশ্যে নিয়ে হারাম করেছিলেন যে, তিনি স্বীয় উস্তাদ বুহাইরাকে নাকি নেশার অবস্থায় হত্যা করেছিলেন (নাউযুবিল্লাহ)।

মোটকথা, আঁ হযরতের (সঃ) প্রতি এ ধরনের অজস্র মিথ্যা দোষারোপ করতে এই ঈসায়ী কওমরা একটুও দ্বিধাবোধ করেন না। আর কেনই বা কুণ্ঠাবোধ করবেন তাঁরা? মিথ্যা অপবাদের এই বদ-অভ্যাসটা যে তাদের

একেবারে জন্মগত মজ্জাগত। অথচ সীরাতে নববীর বর্ণনাকারিগণের মাধ্যমে প্রায় সবাই আমরা একথা স্বতঃসিদ্ধরূপে জানতে পেরেছি যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) নয় বছর আর অন্য রিওয়ায়েত মুতাবিক চৌদ্দ বছর বয়ঃক্রমকালে স্বীয় পিতৃব্য আবু তালিবের সাথে বাণিজ্য ব্যাপোদেশে সিরিয়া গিয়েছিলেন এবং বুহাইরা রাহেব হুযুর আকরাম (সঃ)-এর মস্তকোপরি ঘন মেঘখণ্ডের ছায়া দেখে তাঁর সম্বন্ধে এত ভালো মন্তব্য পেশ করেছিলেন। কোন রিওয়ায়েতেই একথা নেই যে, যৌবনের প্রারম্ভে বাণিজ্যিক সফরে গিয়ে কোন খৃষ্টান পাদ্রী বা য়াহুদী রাহেবের সাথে তাঁর কোন আলাপ আলোচনা হয়েছিল। অথবা মযহাব ও আকীদা সম্পর্কে সেই রাহেবের কাছ থেকে তিনি কোন তথ্য বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছিলেন।[১]

এমন কি নবী করীম (সঃ)-এর সমসাময়িক দুশমনদের মধ্য থেকেও কেউ এমন কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেন নি। কারণ বাণিজ্য উপলক্ষে গিয়ে সাধারণত কেউ এ ধরনের আলোচনা বা এমন কথা মুখে উচ্চারণ করে না। আর করবেই বা কি করে? তিনি তো আর একাকী বিদেশ বিভূঁয়ে যাত্রা শুরু করেন নি। সফররত অবস্থায় তাঁর সঙ্গে থাকতো রীতিমতো এক কাফেলা। সুতরাং সেখানে গিয়ে তিনি কিছু শিখে এসেছেন বলে অভিযোগ তুললে স্বয়ং মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে তাঁর সফরের সঙ্গীরা সঙ্গে সঙ্গে তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করতো। এ ভয় তাদের আগে থেকেই ছিল। তাছাড়া মক্কার প্রতিটি মানুষ জিজ্ঞেস করবে, বারো বছর বয়সেই কি মুহাম্মদ (সঃ) এহেন জ্ঞানগর্ভ অমূল্য বাণী বুহাইরা রাহেবের কাছ থেকে শিখতে পেরেছিলেন? একি সম্ভব হতে পারে? ...এ লোকটি তো আমাদের চক্ষুর অন্তরালে কোনদিনই কোথাও অবস্থান করেন নি। তার সুদীর্ঘ ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর এসব তথ্য ও তত্ত্ব জ্ঞান কোথায় কোন অজ্ঞাত গোপনপুরে লুকিয়েছিল? কেমন করেই বা এ সম্ভব হতে পারে? এ জন্যই মক্কার কাফির ও স্পষ্টবাদী কুরায়শ

১. আল্লামা রশীদ রিযা কৃত এবং হাফিয রশীদ আরশাদ কর্তৃক অনূদিত আল ওহীউল মুহাম্মদী: পৃষ্ঠা ১৩৬।

কওমরা এতোবড় ডাহা মিথ্যার আশ্রয় নিতে কোনদিনই দুঃসাহস করেনি। তাই মনে হয়, তারা এই নিরেট খাঁটি ও নির্জলা মিথ্যা কথাটিকে আধুনিক যুগের এই পশ্চিমী প্রাচ্য ভাষাবিদদের জন্যই রেখে দিয়েছিল।

আল্লামা রশীদ রিযা বলেনঃ পাশ্চাত্যের প্রাচ্য বিদ্যাবিশারদগণ বলে থাকেন যে, আরব ঈসায়ী ওয়ারাকা বিন নওফেল ছিলেন একজন মহাজ্ঞানী খৃষ্টান। তিনি হযরত খাদীজাতুল কুবরার (রাঃ) আত্মীয়ও ছিলেন। তাই আজকের প্রাচ্যবিদদের মতে আঁ হযরত (সঃ)-ও নাকি খৃষ্টানদের সব তত্ত্বজ্ঞান ওয়ারাকা বিন নওফেলের কাছ থেকেই আহরণ করেছিলেন। অথচ সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে রিওয়ায়েত পাওয়া যায় যে, হযরত জিব্রীল আমীনের মাধ্যমে হেরার গিরিগুহায় প্রকৃত মহাসত্য প্রাপ্ত হওয়ার পর তিনি সেই পবিত্র রাতের শেষ প্রহরে হযরত খাদীজার (রাঃ) সান্নিধ্যে ফিরে এসেছিলেন। আর হযরত খাদীজা (রাঃ) তাঁকে ওয়ারাকা বিন নওফেলের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। ওয়ারাকা তখন বার্ধক্যের কোঠায় পদার্পণ করে দৃষ্টিশক্তিকেও হারাতে বসেছিলেন।

এমতাবস্থায় ওয়ারাকা বিন নওফেলের কাছে শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা লাভের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। একথা স্পষ্টতই প্রতীয়মান এবং অতি সহজেই অনুমেয়।

পবিত্র কুরআনের ই'জায ও অলৌকিকতা তাই সকল যুগে সকল সময়েই অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত।

IFP—84-85—P/1486—5250—1.10.-1984